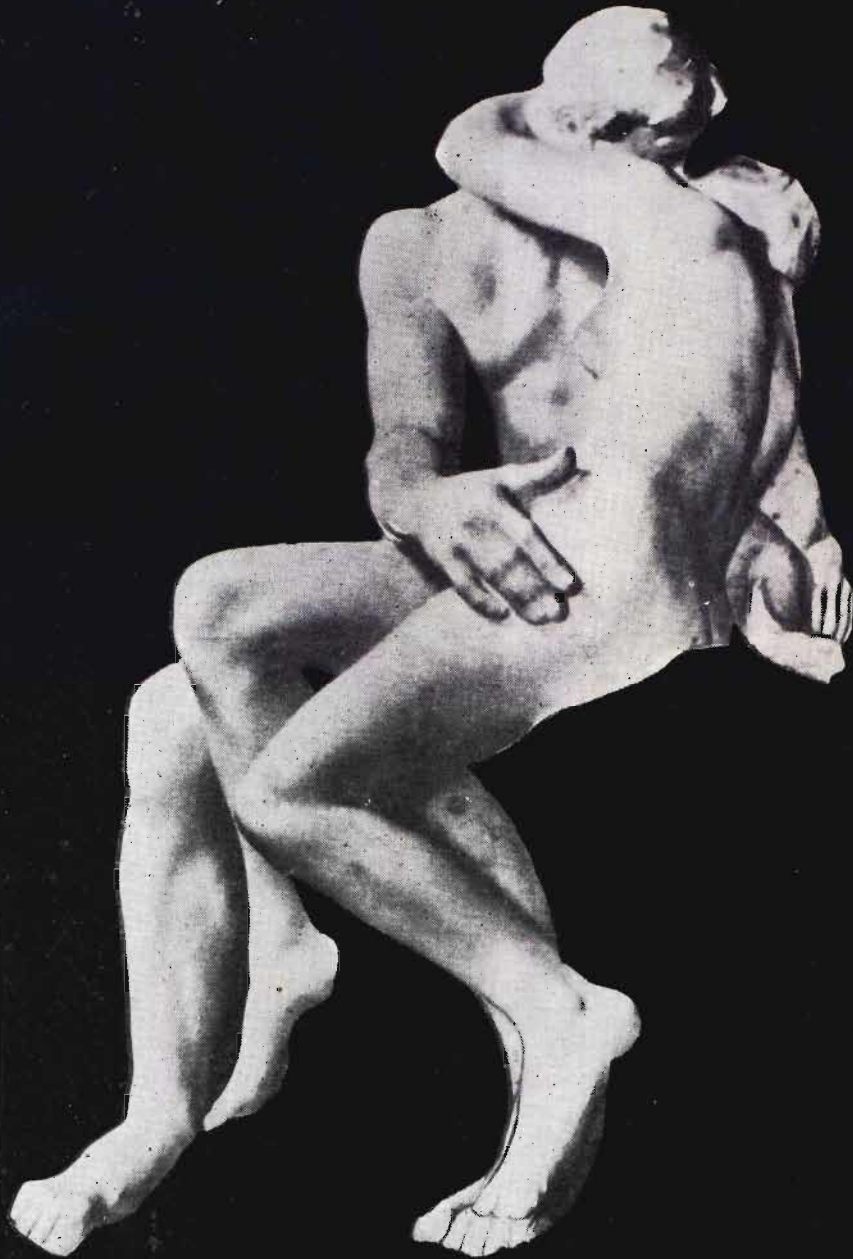


নারায়ণ সাত্তাল

বোম্বাই





Wells & Wells

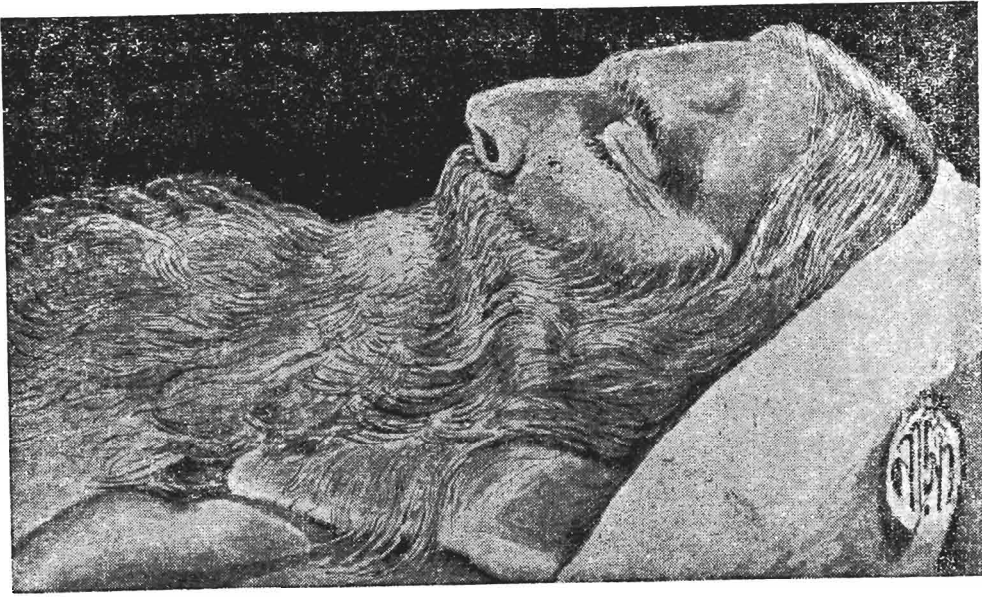


A.. Portrait of Rose Beuret (1865)—রোজ ব্যুরে (পোড়ামাটি)



ସାବୁଧର ଶାସ୍ତ୍ରୀ

ଦେ' ଜ ପା ବ ଲି ଶିଂ ॥ କ ଲି କା ତା-୧୦୦୦୧୩



মমুষ্যে অশুভং বেদে বোধ্যং

অধিমা-শয়নে শাস্তি কামার আলমখ্যটিতেই রইল আমার প্রদীপ্ত ।

মারা পৃথিবী পারিক্রমা শেষ করে এই যে ভূমি এতদিন আমাদের আতি-
থি 'পদ্মা শহর' লক্ষ ওলোখ এটা ভালই করেছে । আর্ট-স্টোরে ছাপা নষ্টে তোমাকে
কোনদিনই পাঠনি । ভূমিই বলাহিনে - 'প্রদক্ষিন না করবে ...'

মেটা কিছু নতুন কথা নয় । হ'আজই হাজার বছর ধরেই সে নির্দেশটা আমরা
জানতুম এবং মানতুম । আমরা সূপ প্রদক্ষিন করছি, মন্দির প্রদক্ষিন করে এসেছি,
আমাদের সহধর্মিণীরাও ধূপে ধূপে সাতপাকে আমাদের... এতদিন তোমাকে
প্রদক্ষিন করার একটা সুযোগ পোলে আমরা বঁচু ।

উপকার ভর্তু আমাদেরই নয়, তোমারও । আমাকে আনন্দ না দিয়ে যাওয়া-জু
তোমারও যে মুক্তি নেই । আমার তেনার হেঁতুখাট্টে ছাড়া তোমার পাতা হয়না মরুজ
চুবি হয় না বঁড়ো । ওরহ এ আমার হুমাহম ? আশ্চর্যিতা ? না, বোধ্য-সাংসেব, না!
আমরা যে অন্যভাবে ওরহে শিখোছি । বিবেচনা করে দেখ, - সূজন-প্রতিজ্ঞা মেই
সিঁড়ি-বনশ্রবের মতো অবন-ঠাকুরের কাকামশাই-এর ধতখানি প্রভেদ, 'শিখী-হিমাল
তোমার-আমার ঋণাকটা কি ওর চেয়েও বেশি ?

"জাই তোমার আনন্দ আমার পর/ভূমি আই এসেছে নীচে -
আমরা নইলে সিঁড়ি-বনশ্রব/তোমার প্রেম হও যে মিছে ।"

এবার গম্ভীরে প্রমত্তের পুজার্ট মাঙ্গ করি ।

কিন্তু একক-আরাধনার মন্ত্র তো ভূমি পেখাওনি ?

তোমার ক্যার্যাকাল'এ পেয়েছি রহস্য-সংহিতার মেই মন্ত্রাট :

প্রমথ-মানির 'মিথুনৈঃ' সুসোডিত করার নির্দেশ । জানি - ওজানী-শুনী -
পাতিভোরা ধীকার করবে না - যে-হেতু কোনও সাংসেব-অমাতোচক গত একশ
বছরের ভিতর যে-কথা বসেননি । আমি জাখপ করি না । ওর আমি আমার
ডানহাতখানা বাড়িয়ে প্রতীক্ষণ করে থাকব । শিশুরসমিতা কোন এক অপরিচিতা
পারিতো নিশ্চয় আমার মনেই একমত রহে প্রসারিত করে দেবেন তাঁর দাফিলের
দক্ষিণ হস্ত । ওখন - শুধু ওখনই সুযোগ হবে তোমাকে একটি গিথ-প্রণামের ।

উপায় কি ? একা হতে ওটা যে হবার নয় !

স্বাক্ষর মানসনা

রোদ্যার অগ্রজ

বকুলতলা পি এল ক্যাম্প	1955	বিহঙ্গবাসনা (হে হংস বলাকা)	1973
বল্মীক	1958	* বিশ্বাসঘাতক	1974
ব্রাত্য	1959	সোনার কাঁটা	1975
বাস্তুবিজ্ঞান	1959	অশ্লীলতার দায়ে	1975
মনামী	1960	মাছের কাঁটা	1975
* নৈমিষারণ্য (অরণ্যদণ্ডক)	1961	* লাল ত্রিকোণ	1975
দণ্ডকশবরী	1962	পথের কাঁটা	1976
* অন্তর্লীনা	1962	নক্ষত্রলোকের দেবতাস্বা	1976
অলকনন্দা	1963	* পঞ্চাশোধেৰ্	1976
মহাকালের মন্দির	1964	অবাক পৃথিবী	1976
নীলিমায় নীল	1964	আজি হতে শতবর্ষ পরে	1976
পথের মহাপ্রস্থান	1965	হংসেশ্বরী	1977
সত্যকাম	1965	চীন-ভারত লঙ-মার্চ	1977
অপরূপা অজন্তা (অজন্তা অপরূপা)	1968	প্যারাবোলা-স্যার	1977
* নাগচম্পা	1968	ঘড়ির কাঁটা	1978
* তাজের স্বপ্ন	1969	লিওবার্গ	1978
* আমি নেতাজীকে দেখেছি	1970	আনন্দ-স্বর্গপণী	1978
নেতাজী রহস্য সন্ধান	1970	* কুলের কাঁটা	1978
* পাষাণ পণ্ডিত	1970	তিমি-তিমিঙ্গল	1979
জাপান থেকে ফিরে	1971	ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন	1980
কালো কালো	1971	গ্রামোন্নয়ন কর্মসহায়িকা	1980
শালক হেবো	1971	কিশোর অমনিবাস	1980
আবার যদি ইচ্ছা কর	1972	উলের কাঁটা	1980
কলিঙ্গের দেবদেউল	1972	অরিগামি	1982
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি	1973	লা-জবাব দেহলি—অপরূপা আগ্রা	1982
* গজমুক্তা	1973		

রোদ্যার সহ-জ :

Immortal Ajanta	সূতনুকা একটি দেবদাসীর নাম
* না-মানুষের পাঁচালী	Erotica in Indian Temples

রোদ্যার সন্তান্য অনুজ :

লেঅনার্দো এবং... [মগজস্থ] রাঙ্কেল ... [মগজস্থ]

* আমাদের প্রকাশনা ।

কৈফিয়ৎ

এই গ্রন্থটি রচনা-প্রসঙ্গে আমি অনেকের কাছেই খণী। সর্বাগ্রে স্বীকার করব একজন নিকট আত্মীয়ের নাম। রবাহুত অর্থাৎ হিসাবে বিড়লা-আকাদেমীর নিমন্ত্রণ-বাড়িতে পৌঁছে আমার হৃদকম্প হয়েছিল; ভীড় দেখে ভীষণ ভড়কে গেছিলাম। অরোর বোরিংওলিস্ দের্থানি, দের্থানি নায়গ্রা প্রপাত, গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন্স কিম্বা প্রশান্ত মহাসাগর—কিউ-সরীসৃপের ল্যাজটি ছুঁয়ে তাই মনে মনে ভাবছিলাম—সেই তালিকায় থাক না আরও একটা নাম: রোদ্যাঁ। অকস্মাৎ সন্ধান পাওয়া গেল মুশ্কিল-আসানের। টুপি়র ভিতর থেকে যে ভাঁসিতে খরগোশ বেরিয়ে আসে, ঠিক সেভাবে হুড়মুড়িয়ে ভীড় ভেঙে হঠাৎ বেরিয়ে এল ভাগীনেয় শ্রীমান সুবাস মৈত্র। তার পকেটে ছিল একটি আশ্চর্য যাদুদণ্ড। মুহূর্তমধ্যে প্রেস-কার্ডের ভেঙ্কি দেখিয়ে সে আমাকে পৌঁছে দিল সরাসরি পণ্ডিত ভোজের টেবিলে। ঐ একদিনই মাত্র রোদ্যাঁকে দেখেছি। সলজ্জে স্বীকার করব, বছর দশেক আগে একবার পারী গেছিলাম। সরকারী পয়সায় বা ডেলিগেট হিসাবে নয়; নিজ ব্যয়ে। সেবার প্রাক্তন ‘ওতেল ব্যুরঁ’ দেখা হয়নি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আর একবার পারী যাবার তাল ভাঁজিছ। প্রতিভেও ফাওের বাকি টাকাটা পাওয়া মাত্র। মাত্র দু-বছর হল তো রিটারার করেছি, ফাইনাল-রিফাওের ড্রাক্সফল পাকার সময় এখনও হয়নি।

দ্বিতীয়ত, যে ভদ্রমহিলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ তিন আমার অপরিচিত। বাঙালী, যাটের উপর বয়স। হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, “এই মাসুল্-সর্বস্ব জোয়ান মানুষটার এমন নামকরণ কেন করা হল বলতে পারেন? ও কী ভাবছে?” আমি তখন The Thinker এর সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথাই থিংক করছিলাম। জবাবে জানিয়েছিলাম, ‘জানি না। জানবার চেষ্টা করব।’

তারপরেই রোদ্যাঁর উপর পড়াশুনাটা শুরু করি।

তখনও লিখব স্থির করিনি। সে উৎসাহ পেলাম প্রখ্যাত শিম্পসমালোচক শ্রীঅশোক মিত্রের একটি রচনা পাঠ করে। উনি দুঃখ করেছিলেন, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রোদ্যাঁকে বুঝবার চেষ্টা করা হল না। দেবদুতেরা অগ্রসর হয়ে আসছেন না দেখে বাধ্য হয়ে নিজেই হুড়মুড় করে ঐ দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঢুকে পড়েছি। শ্রী মিত্রের রচনার শিরোনামার সঙ্গে যদিচ আমি একমত নই। ‘পরিবর্তন’ (17.8.83) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম আপত্তিকর: “দেশের শিম্পকলা না বুঝে রোদ্যাঁর প্রদর্শনীতে উপচে-পড়া ভীড় সাহেব ভক্তিরই নামান্তর।” আমরা ‘পেলে’কে দেখতে ভীড় করেছি—যদিও তাঁর রঙ কালো, এ্যাটেনবারোকে দেখতে ভীড় করিনি, যদিও তিনি নির্ভেজাল সাহেব।

এই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা ছাড়া গোটা কলকাতাবাসীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব ‘বিড়লা আকাদেমী অব আর্ট এ্যাণ্ড কালচার’, ফরাসী সরকার, বিশেষ করে বিড়লা আকাদেমীর শ্রীযুক্তা জয়শ্রী মোহতার কাছে। আকাশ-চেনার ব্যাপারে বিজ্ঞান, গ্যালেলিও-র সেই ‘দূরকে-করিলে-নিকট-বন্ধু’-যন্ত্রটির কাছে যতটা খণী, আমরাও রোদ্যাঁ-চেনার ব্যাপারে ওঁদের কাছে ততটাই কৃতজ্ঞ।

রোদ্যাঁ-ভাস্কর্যের প্রস্থানের পর, আমার গ্রন্থ-রচনার শেষাংশে শ্রীনীলমণি রায়ের একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে দ্বিতীয়বার মুগ্ধ হতে হল। এত ভালো ফটো আমি বিদেশে-ছাপা বইতেও সচরাচর পাইনি। বিড়লা আকাদেমীর অনুমতি নিয়ে নীলমণিবাবু তাঁর ছয়খানি আলোকচিত্র (প্লেট সংখ্যা: K, L, N, O, P, Q) শেষ মুহূর্তে আমাকে ব্যবহার করতে দিয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নীলমণিবাবু আরও একটি পরোক্ষ উপকার করেছেন—আমার আঁকা স্কেচ যে কী-পরিমাণ নিরেশ তা পাঠকের সহজেই মালুম হবে। আমি বিশেষ করে আপনাদের বলব—তাঁর তোলা সূজোঁ (প্লেট সংখ্যা—‘O’)-র সঙ্গে আমার আঁকা চিত্র-16 (পৃষ্ঠা: ৬৭; মুদ্রাকর-প্রমাদ নয়, আমারই অনবধানতায় নামটা ‘ডোজিয়া’ ছাপা হয়েছে) তুলনা করতে। অত খারাপ কিন্তু আমি আঁকি না—বিশ্বাস করুন—কিন্তু মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে

আঁকার অনুমতি ছিল না। ‘ও কুমার! তোর জলুকে নেমেছি’-পদ্ধতিতে কী-ভাবে এঁকেছি তা যথাস্থানে জানিয়েছি (পৃঃ ৯৪)। তাই বলব—আমার স্কেচ দেখে রোদাংগার বিচার করলে শুধু তাঁর নয়, আমার প্রতিও বিচার করা হবে। আমি পিটুলি-গোলার পাত্রটি হাতে শুধু বলতে চেয়েছি: সমঝে নিন! দুধ বস্তুটা হচ্ছে তরল ও সাদা। তবে ইঁয়া, পিটুলি-গোলার পাত্রটি হাতে আমি কিন্তু ঘুরে-ফিরে নেচে-নেচে আপনাদের পরিবেশন করেছি!

আর্ভিন স্টোন যে-শৈলীতে ভ্যান গগ্ বা মিকেলাঞ্জেলোর উপন্যাসপ্রতিম জীবনী লিখেছেন আমি ‘ব্যঞ্জনবর্ণ’ পর্যায়ে সেভাবেই অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তিনি ঐ মহান শিল্পীদ্বয়ের শিল্প-মূল্যায়ন করেননি। ছবিও দেননি। সে যাইহোক, সম্ভ্রানে তথ্যবিচ্যুত হইনি, যদিও কথোপকথন ও ঘটনা-সংস্থাপন আমাকে কল্পনা করতে হয়েছে। রামের জন্মস্থান যে আসলে অযোধ্যা, এটা যারা জানতে চান তাঁরা পরিশিষ্ট—১-এ সে সন্ধান পাবেন।

পরিশিষ্ট—২টি প্রণয়ন করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। কোনও ইংরাজী গবেষণা-গ্রন্থে এরূপ তালিকা আমি খুঁজে পাইনি। অনেকগুলি বই ঘেঁটে যতদূর সম্ভব সাজিয়েছি। নির্মাণকাল নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। আমার গ্রন্থেও তাই অনেক বিভ্রান্তি রয়ে গেল। প্রভিডেও-ফাওর টাকাটা পেলে পরবর্তী সংস্করণে হয়তো শোধরাতে পারব। পারীর রোদাংগা-মিউজিয়ামে কোন মূর্তির নির্মাণকাল কত তা টুকে আনব। সবচেয়ে বখেড়া হয়েছে ফরাসী ভাষাটা না জানায়। ফেণ্ড বইতে হয়তো এ তথ্য পেতুম।

ঐ প্রসঙ্গেই আসছে পরিশিষ্ট—৩-এর ব্যাপারটা। ফরাসী নাম বাঙলা-হরফে কী-ভাবে হবে তা আমার ঠিকমতো জানা নেই। ‘দেশ’ পত্রিকায় বহু বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতের আলোচনা সত্ত্বেও আমার আজও মালুম হয়নি Louvre শব্দটার কী হবে বাঙলা-হরফে বিশুদ্ধ রূপান্তর অথবা বাঙালী-জিহবায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ!

খেদ একটাই। রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, যুগান্তর, পূজাসংখ্যা প্রসাদ ও দক্ষিণবার্তায় যদিচ এ রচনার ছিটে-ফোঁটা স্পর্শ স্থানলাভ করেছে, তবু ফটো অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা হয় এমন কোন খানদানি মাসিক-সাপ্তাহিকে এই সচিত্র রচনাটি যদি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা যেত তাহলে মধ্যবিত্ত রসপিপাসু—ঐ যারা কাঠফাটা বৈশাখী রৌদ্রকে অগ্রাহ্য করে সাদার্ন এ্যাভিনিউতে লাইন দিয়েছিলেন—সেই তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারতুম। পত্রিকার পাতা কেটে কেটে কলিহুন্দীন দপ্তরি অথবা আবদুল ওস্তাগরের সাহায্যে বাঁধিয়ে আমাকে ‘বুক-কেস’-এ স্থান দিতেন—হয়তো নিদাঘ হিপ্রহর কখনও বা চিৎ হয়ে শুয়ে, বুকে। কিন্তু এ আমার নৌকা চড়ার অন্যায় আদার! সোনারতরী প্রত্যাশিতভাবে লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠ এবং জনপ্রিয় লেখকদের রাশি-রাশি ভারা-ভারা রচনাতেই উপচায়মান। অভিবাসী আমাকে তাই সেই সাবেকী সড়কেই পদব্রজে আপনাদের দ্বারস্থ হতে হয়েছে: লেখক—প্রকাশক—পাঠাগার—পাঠক!

অবশ্য আপনার যদি প্রভিডেও-ফাওর আঙুর পেকে থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা।

প্রকাশক অবশ্য চেষ্টার দুটি করেননি—সান্ত্বনা এটুকুই।

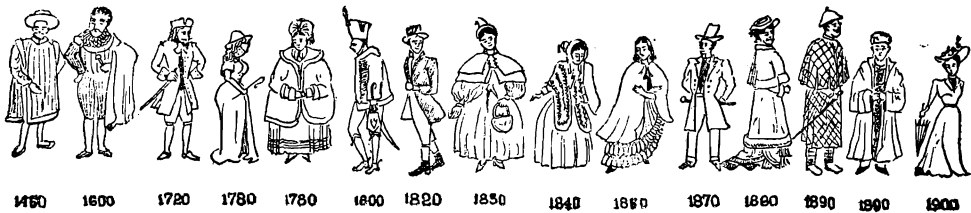
নারায়ণ সান্যাল

৩০৩৮৪

চিত্রসূচী

আর্ট-প্লেট :

- A Portrait of Rose Beuret (Terracotta), 1865—রোজ-বুরে (পোড়ামাটি)
- B Auguste Rodin (Photograph)—অগুস্ত্ রোদ্যা (ফটো)
- C Michalangelo (Contemporary sculpture)—মিকেলাঞ্জেলো (সমকালীন ভাস্কর্য)
- D The Man with the Broken Nose (Bronze-mask), 1863—নাকভাঙ্গা সেই লোকটি (ব্রোজ-মুখোশ)
- E Caryatid (Bronze), 1880—ক্যারিয়াটিড (ব্রোজ)
- F Eternal Idol (Bronze), 1889—শাস্বত হ্লাদিনী (ব্রোজ)
- G Danaide (Marble), 1884—দানেদ (মর্মর)
- H Metamorphoses According to Ovid (Bronze), 1886—অভিদের রূপান্তর (ব্রোজ)
- I Balzac (Bronze), 1897—বালজাক (ব্রোজ)
- J Victor Hugo (Bronze), 1897—ভিক্তর য়ুগো (ব্রোজ)
- K The Falling Man, Front-view (Bronze), 1882—পতনোন্মুখ মানব (ব্রোজ)
- L The Falling Man, Back-view (Bronze), 1882—পতনোন্মুখ মানব (পশ্চাৎদৃশ্য)
- M Invocation (Bronze), 1886—প্রার্থনা (ব্রোজ)
- N I am Beautiful (Bronze), 1882—আমি চণ্ডল হে (ব্রোজ)
- O Suzon (Bronze), 1872—সুজ (ব্রোজ)
- P Bernard Shaw (Bronze), 1909—বার্নার্ড শ (ব্রোজ)
- Q Balzac (Bronze), 1897—বালজাক (ব্রোজ)
- R Old Courtesan (Bronze), 1885—শিরস্ত্রাণ-নির্মাতার সেই সুন্দরী স্ত্রী (ব্রোজ)



স্কেচ :

চিত্র—1 : Danaide, দানেন্দ	১১
চিত্র—2 : Pugilis, মুষ্টিযোদ্ধা, হেলেনিস্টিক শৈলী	২৩
চিত্র—3 : Moses, মোজেস, মিকেলাঞ্জেলো-কৃত	২৫
চিত্র—4 : রোদ্যার হাত ও পুতুল	৩২
চিত্র—5 : মোজেস ও ডেভিডের হাত, মিকেলাঞ্জেলো	৩৩
চিত্র—6 : আগ্রাসী হস্ত ও বন্দি, দক্ষিণদৃশ্য	৩৩
চিত্র—7 : আগ্রাসী হস্ত ও বন্দি, বামপার্শ্বের দৃশ্য	৩৩
চিত্র—8 : জাঁ বার্পিস্ত (পাপা) রোদ্য	৩৬
চিত্র—9 : ফাদার এইমার্ড	৪০
চিত্র—10 : মেরী-রোজ ব্যুরে	৪৫
চিত্র—11 : গ্রীক শৈলীতে নির্মিত ক্যারিয়াটিড্	৪৯
চিত্র—12 : রোদ্য নির্মিত ক্যারিয়াটিড্	৫০
চিত্র—13 : গ্রীক শৈলীতে নির্মিত অরফিউস্	৫১
চিত্র—14 : রোদ্য নির্মিত অরফিউস্	৫১
চিত্র—15 : Idyll of Ixelles, শিশুদ্বয়	৬৬
চিত্র—16 : স্ফজ (ডোজিয়া নয়)	৬৭
চিত্র—17 : Bronze Age, পরাজিত/রোজযুগ	৬৮
চিত্র—18 : ঈভ, মাসাচ্চিও-কৃত	৭৩
চিত্র—19 : ঈভ, মিকেলাঞ্জেলো-কৃত	৭৩
চিত্র—20 : ঈভ, রোদ্য-কৃত	৭৪
চিত্র—21 : স্টেণ্ট জন দ্য ব্যাপটিস্ট প্রীচিং	৭৯
চিত্র—22 : The Kiss, চুষন	৮৪
চিত্র—23 : চুষনোদ্যতা, কোণার্ক	৮৫
চিত্র—24 : চুষনোদ্যতা, খাজুরাহো	৮৫
চিত্র—25 : Eternal Spring, চিরবসন্ত	৮৬
চিত্র—26 : Fugit Amor, পলাতকা প্রেম	৮৭
চিত্র—27 : উত্তেজিত মিথুন, আঁহওল-মন্দির	৮৮
চিত্র—28 : এ্যাপোলো ও ডাফ্‌নে, বার্গিনী-কৃত	৮৯
চিত্র—29 : যোঁথ-যোঁনাচার, খাজুরাহো	৯০
চিত্র—30 : The Eternal Idol, শাস্ত্রত হ্লামদীনী	৯১

স্কেচ :

চিত্র—31 : The old Courtesan, বৃদ্ধা বারাদনা	৯২
চিত্র—32 : The Cathedral, গীর্জা	৯৩
চিত্র—33 : কৃতাজলি, সঙ্খপাল জাতক, অজন্তা	৯৫
চিত্র—34 : বৃদ্ধাজলি, লেঅনার্দো	৯৫
চিত্র—35 : বৃদ্ধাজলি, মিকেলাঞ্জেলো	৯৫
চিত্র—36 : বৃদ্ধাজলি ড্যারার/স্টেঙ্ক	৯৫
চিত্র—37 : গীর্জা প্রদক্ষিণ	৯৬
চিত্র—38 : গীর্জার প্রতীক-ব্যঞ্জনা, সাদৃশ্য	৯৫
চিত্র—39 : ভিক্টর য়াগো	১১৩
চিত্র—40 : এ্যাপোলামেডা	১২১
চিত্র—41 : Dawn, প্রভাত	১২১
চিত্র—42 : Aurora, উষা, মিকেলাঞ্জেলো-কৃত	১২১
চিত্র—43 : Aurora, উষা, রোদ্য-কৃত	১২১
চিত্র—44 : Thought, চিন্তা	১২১
চিত্র—45 : অশ্বারোহী জঙ-বাহাদুর, কাঠমণ্ডু	১৩১
চিত্র—46 : সুরেন্দ্রনাথ, দেবীপ্রসাদ-কৃত	১৩১
চিত্র—47 : সূর্য সেন, রমেশচন্দ্র পাল-কৃত	১৩১
চিত্র—48 : শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে অশ্বারোহী	১৩২
চিত্র—49 : আউটরাম, ফোলে-কৃত	১৩১
চিত্র—50 : নিদ্রিতা ভেনাস, জর্জনে-কৃত	১৩৩
চিত্র—51 : সুপ্তোখিতা ভেনাস, টিশিয়ান-কৃত	১৩৩
চিত্র—52 : ক্যালের নাগরিকবৃন্দ	১৩৬
চিত্র—53 : Pierre de Wissant	১৩৬
চিত্র—54 : Jean d'Aire	১৩৭
চিত্র—55 : দণ্ডায়মান বালজাক	১৩৭
চিত্র—56 : The Prodigal Son, প্রডিগাল সন	১৪৪
চিত্র—57 : অভিদ-অনুসরণে একাধিক রূপান্তর	১৪৫
চিত্র—58 : ডাচেস্ অব শোয়াজোল	১৫৮
চিত্র—59 : নৃত্যরত নিজনিষ্কি	১৬১



C.. Michelangelo—মিকেলান্জেলো
[মিকেলান্জেলোর সমসাময়িক ভাস্কর্য]



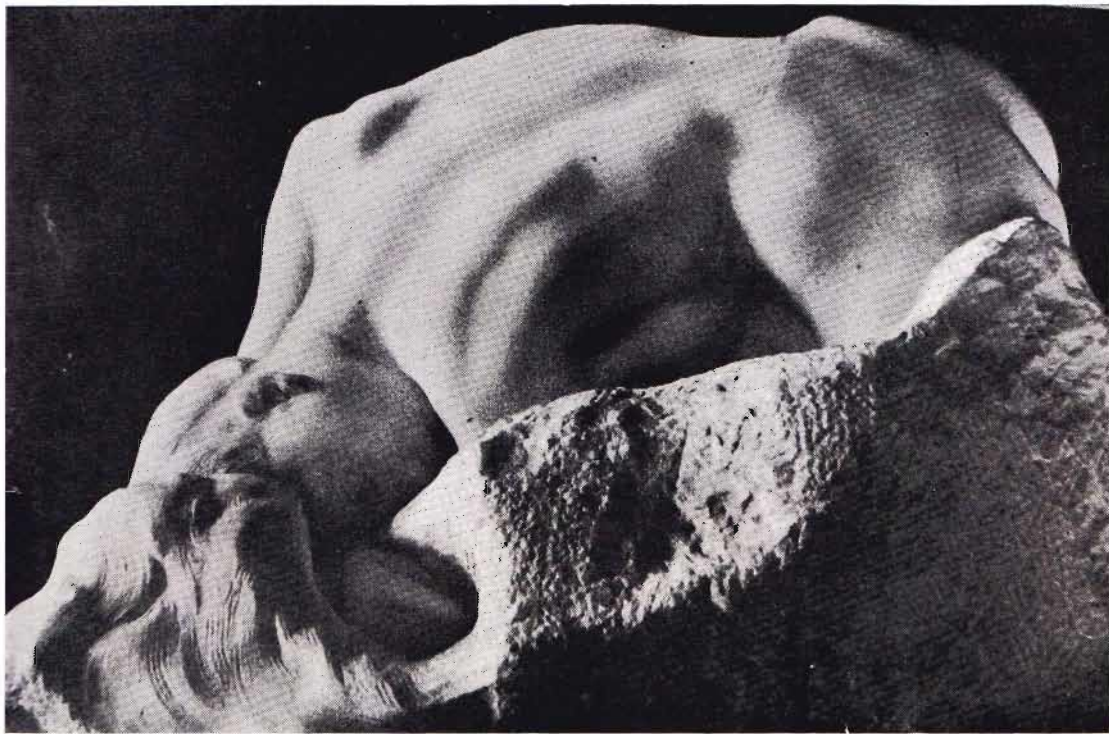
D.. The Man with the Broken Nose (1864)
নাকভাঙা সেই মানুষটি (রোজ-গুথোস)



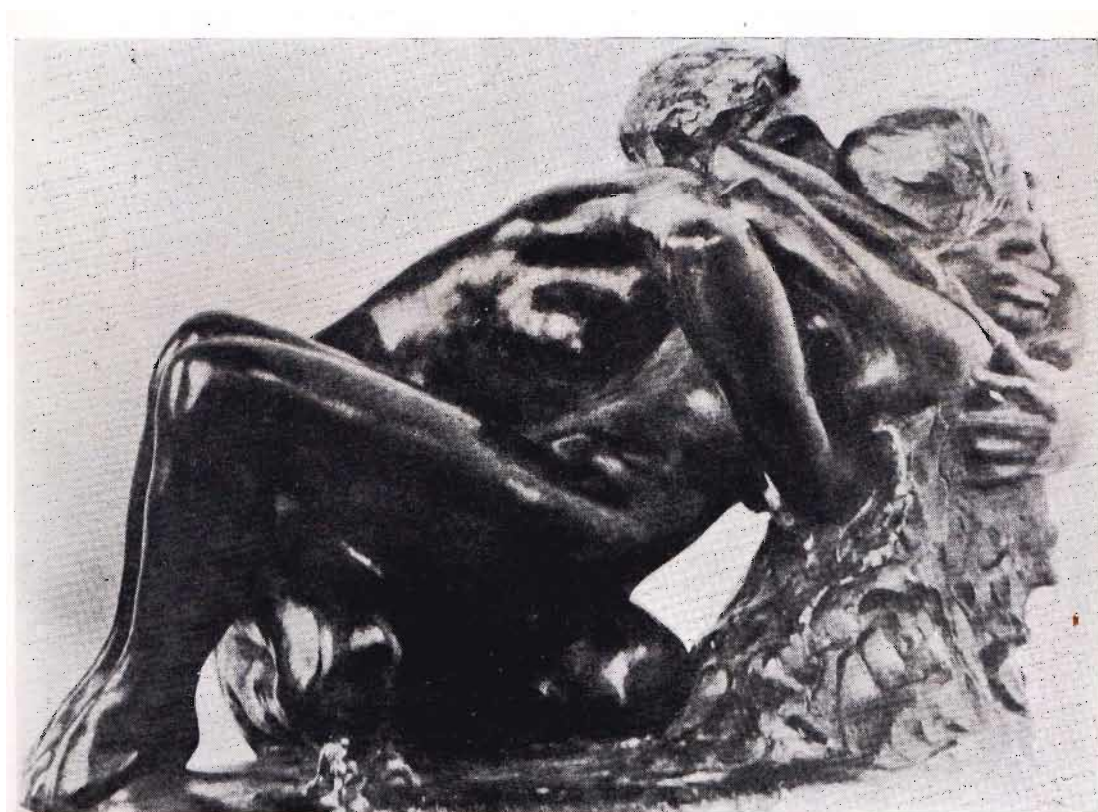
E.. Caryatid (1880)—ভারনহা (রোজ)



F.. Eternal Idol (1889)—শাস্ত হ্লাদিনী (রোজ)



G.. Danaid (1885);—দানেদ (ব্রোঞ্জ, মার্বেল)



H.. Metamorphoses according to Ovid (1886)—অভিদ-এর বৃপান্তর (ব্রোঞ্জ)



1.. Balzac (1890-97)—বালজাক (রোঞ্জ)



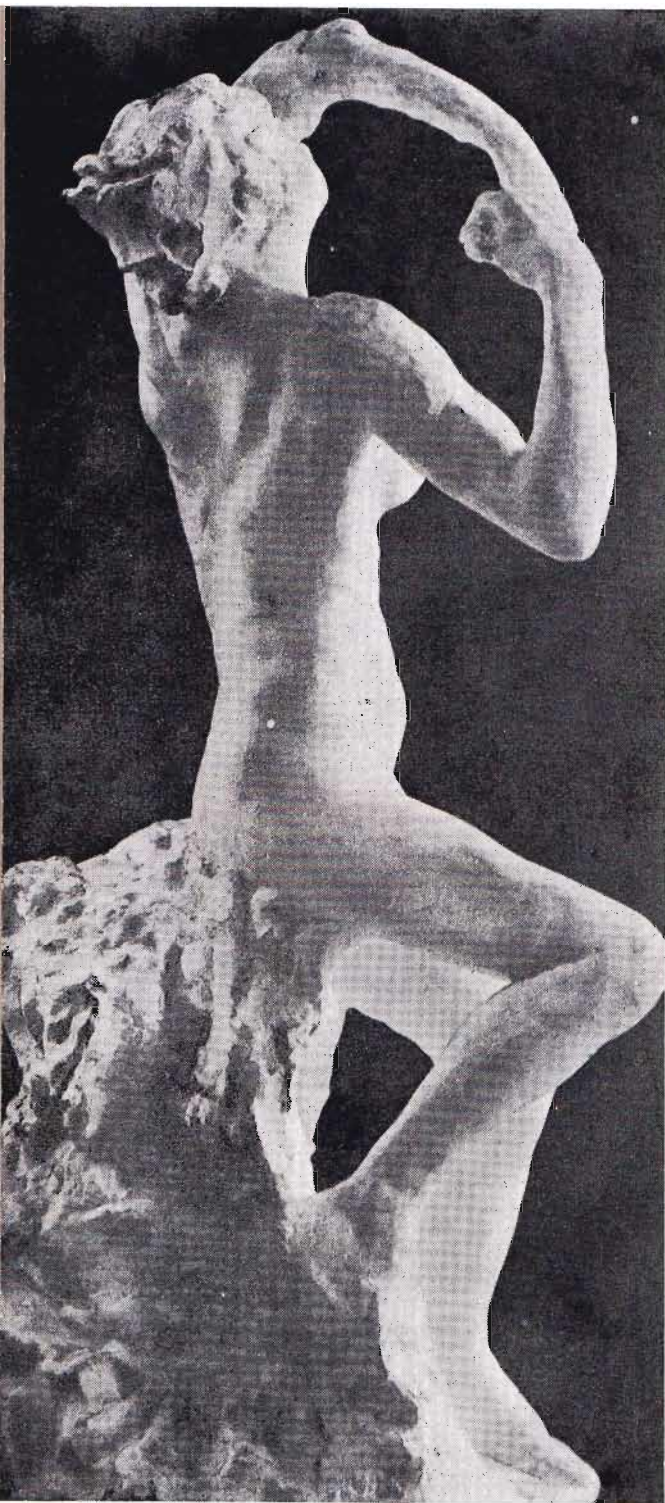
J.. Victor Hugo (1896)—যুগোর ন্যুড (প্লাস্টার)



K.. The Falling Man (1889, front)
পতনোন্মুখ মানব (সম্মুখ দৃশ্য) রোজ



L. The Falling Man (1889, back)
পতনোন্মুখ মানব (পিছন থেকে) রোজ



M.. Invocation (1886)—প্রার্থনা (প্রাস্টোর)



N.. I am Beautiful (1882— আমি সুন্দর হে (রোজ)



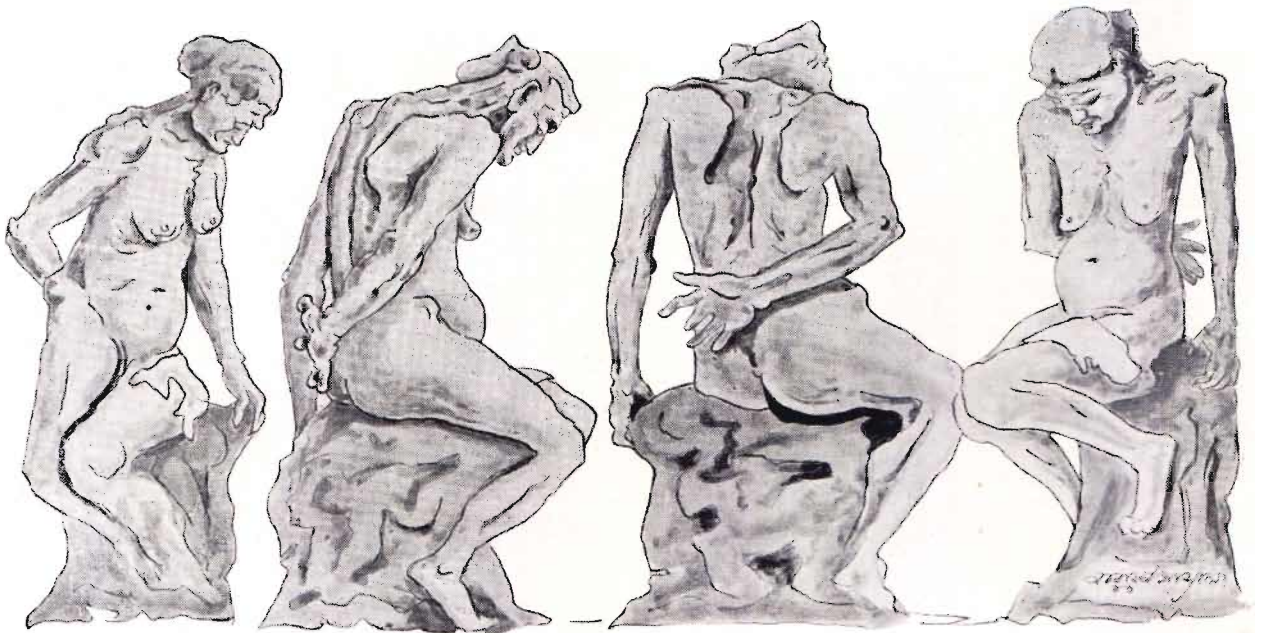
O.. Suzon (1872)—সুজ (রোজ)



P.. George Bernard Shaw (1906)—শ (ব্রোঞ্জ)



Q.. Balzac, bust—বালজাক, আবক্ষ (ব্রোঞ্জ)



R.. She, Who Once was the Helmet-maker's Beautiful Wife (1885)

—সেই মেয়েটি যে, একদিন ছিল শিরস্ত্রাণ-নির্মাতার সুপবতী ঘরগা (ব্রোঞ্জ)

অ

উনিশ শ' তিরাশির জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে অগুস্ত-অগস্ত-যাত্রায় ফিরে গেলেন স্বদেশে। থাকতে উনি আসেননি; মাসখানেকের জন্য কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন মাত্র। ইতিপূর্বেই প্রায় সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন, ভারতেও বোম্বাই-দিল্লি সেরে এসেছিলেন এ-শহরে। স্কেভের কথা উনি বড় দেরি করে এলেন কলকাতায়। সেই লাতিন-কবি, যাকে রোমবাসী পাথর ছুঁড়ে রক্তাক্ত করে তুলেছিল তার সুরে সুর মিলিয়ে অগুস্ত রোদ্যা এক দিন বলেছিলেন, 'Equitibus cano—I only sing for the knights'. কিন্তু এই আশির দশকে কলকাতা শহরে knight কোথায়? যদিও তাকাও 'k'-হীন নাইট! নীরক্স অমাবস্যার! রবীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ, হ্যাভেল, ক্রমরিশ, নন্দলাল, কেউই নেই আজকের কলকাতায়! বিড়লা আকাদেমি অফ্‌ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার দমদম থেকে রোদ্যা-সাহেবকে দক্ষিণ কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন বাবা মুস্তাফার ঢঙে! চোখে ঠুলি পরিয়ে, ক্রেটে বাস্তবান্ধ করে। ফিরিয়েও নিয়ে গেলেন একই কায়দায়—'ফোম'-এর ঠুলি সঁটে। ফলে রোদ্যা-সাহেব দেখে যেতে পারেননি কলকাতার পথেঘাটে ছড়ানো ইদানিংকালের ভাস্কর্য। কোনও মতামতও তাই প্রকাশ করেননি। আমরা—সাধারণ মানুষ—বুঝে উঠতে পারি না সেগুলি কত ভালো অথবা কত খারাপ। শিল্প বিষয়ে যারা পাণ্ডিত্যের মতামত শুনি আর ভাবি কোনটা সত্য? কেউ বলেছেন, "এই মহানগরই বাঙালীর সাংস্কৃতিক পীঠস্থান ছিল। অথচ এখানেই ভাস্কর্যের নামে, চারিদিকে পুতুল নামক জঞ্জাল ছড়িয়ে...এই মহানগরীর আকাশ-

বাতাসকে নির্ভয়ে, নির্লজ্জভাবে কলুষিত করা হচ্ছে। এবং এসব কলেস্কারী ঘটছে জনৈক মন্ত্রীমহাশয়ের সাংস্কৃতিক নিরক্ষরতা এবং খেয়ালখুশির দরুন" (পরিতোষ সেন, 'প্রতিক্ষণ', 2. 7. '83, পৃঃ 79)। কেউ বললেন, "গত কয়েক বছরে যেসব মূর্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতায় বসিয়েছেন—কংগ্রেস বা বামমার্গী যে-সরকারই হোন, তা মোটেই ভাল হয়নি। কোলকালিশের মতো দেখতে রবীন্দ্রনাথ, বিরাট খাড়া ভুট্টোর মতো শ্রীঅরবিন্দ, চুনের বস্তার মতো দেখতে রাণী রাসমাণি; সদ্য স্থাপিত রামমোহন যেন এদেরই একজন" (সম্পীপ সরকার, আনন্দবাজার, 4. 7. '83)।

আবার কেউ বলেছেন, "ধরা যাক আমাদের চারজন ভাস্কর... আমাদের দেশের পটভূমিতে গুরু হিসাবে, শিল্পী হিসাবে, শিল্পগত সমস্যাবলী নিরাকরণে এবং সব ছাপিয়ে দার্শনিক আবেগে ও বক্তব্যে এবং মননশীলতায় এঁদের অবদানের, ইউরোপীয় পরিবেশে রোদ্যার স্থানের সঙ্গে অনেকাংশে তুলনা করা চলে।... 'সাহেবরা' যেটা পারে, সেটা কি আমরা পারি? গুরু-খাওয়া হাড় ওদের! অথচ এই চারজন ভাস্করের কাজ যদি ভাল করে দেখতে পেতুম, কেউ যদি ভাল করে আলোচনা করতেন, বুঝিয়ে দিতেন—এ-ক্ষেত্রে ভাল গুরুর প্রয়োজন, গুরুর কৃপা ছাড়া বোধশক্তিও বাড়ে না—তাহলে বুঝতে পারতুম, পুঁটিমাছ আর কলাইয়ের ডাল খাওয়া হাড়ে কী সম্ভব..." (অশোক মিত্র, "দেশের শিল্পকলা না বুঝে রোদ্যার প্রদর্শনীতে উপহাস-পড়া ভীড় সাহেব-ভক্তিরই নামান্তর," পরিবর্তন, 17. 8. '83)।

তাই রাগ হয় বিড়লা আকাদেমি কর্তৃপক্ষের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়।

রোদ্দ্যা-সাহেবকে কেন ঠুঁল পরিণয়ে রাস্তায় বার করা হল !
 এই হবু-কল্লোলিনী কলকাতায় ভাস্কর্য দেখলে তিনি হয়তো
 কিছু বলতেন—মতামত প্রকাশ করতেন—বুঝিয়ে দিতেন,
 পুঁটিমাছ আর কলাইয়ের ডাল খেয়েও আমরা কতবড় শিম্পী !
 এমন গুরু পেয়েও (যে-সে গুরু নয়, যাঁড়ের ডালনা-খাওয়া
 গুরু !) সে সুযোগ পেলাম না আমরা !
 তা হোক, এ শহরের আর এক রূপ তিনি নয়নভরে দেখে
 গেছেন !

প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে হাজার হাজার মানুষ—
 ছাত্র-শিক্ষক, ডাক্তার-মোক্তার, কারখানার মজদুর, মসীজীবী,
 কেরানী, অফিসার, পিওন, — যারা জানত এ ‘শোলে’ও নয়,
 ‘পেলে’ও নয় ; এবং এ নয় ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের শীল্ড-
 ফাইনাল ! কলকাতার বাইরে থেকেও হাওড়া-শেয়ালদ’ হয়ে
 এসেছে দলে দলে, বাসে চেপে। বাস কণাকটার হেঁকেছে :
 ‘রোদ্দ্যা স্টপ্ ; এখানেই নেমে পড়ুন।’ ওঁরা বাস থেকে
 নেমে কিউ-সরীসূপে সামিল হয়েছেন কাঠফাটা রোদ্দুর অথবা
 কালবৈশাখীকে উপেক্ষা করে। এ দৃশ্য ইতিপূর্বে আমরা
 দেখিনি, দেখব বলে প্রত্যাশাও করিনি। শত-সহস্র সমস্যা-
 জর্জরিত কলকাতাবাসীর শিম্প-আকৃতি ! প্রদর্শনী কক্ষে
 তারা ফিস্-ফিস্ করে কথা বলেছে ; সিগ্রেট দূর অন্তঃ,
 পটটো চিপ্-স্ বা আইসক্রীম পর্বন্ত বিক্রি হয়নি দ্বিসীমানায়।
 এক মাসে এক লাখ তিন হাজার বাহান্নজন মানুষ !
 কিন্তু কী দেখতে এসেছিলেন ওঁরা ? কী দেখলেন ?
 কতটা মন ভরল ?

বাইবেলে যীশু একবার বলেছিলেন না : তোদের চোখ
 আছে কিন্তু তোরা দেখতে পাসনে, তোদের কান আছে কিন্তু
 শুনতে পাস না ! আমাদেরও সেই বৃত্তান্ত। মাত্র বাহান্ন জনই
 বিদগ্ধ দর্শক, তিন-হাজার ঝাপ্-সা দেখেন, আর বাদবাকি
 এক লাখ আমাদের-তথা-ছুঁচোর মতো কানা ! অকুণ্ঠভাবে
 স্বীকার করছি, রোদ্দ্যা-প্রদর্শনীতে অনেক-অনেক কিছু অদেখা
 রয়ে গেল। দেখেছি, প্রত্যক্ষ করিনি। ধরতে পারিনি।
 বুঝতে পারিনি। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ যেমন প্রাকৃতিক
 বিস্ময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অশক্ত হয়ে সর্বকিছুতেই দেবত্ব
 আরোপ করত, সেভাবে মুকশ্রদ্বায় অভিভূত হয়েছি বারে
 বারে। কিছুই যে বুঝিনি এটুকুই শূন্য বুঝেছি। তবু অতল

খাদের সামনে দাঁড়ালে যেমন বুদ্ধি দিয়ে নয়, বোধ দিয়ে
 বুঝি—সামনে কী-যেন-একটা রয়েছে, তেমনি অনুভূতি হয়েছে
 মাঝে মাঝে। একটা উদাহরণ দিই :

DANAIDE (1885) দানেনদ :

আমি যেদিন প্রদর্শনী প্রথম দেখি সেদিন আমার সঙ্গী
 ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীহিন্দ্র দুগার। মূর্তিটির উপর
 চোখ পড়া মাত্র আমার পাশ থেকে উনি আবেগভরা স্বগতোক্তি
 করে ওঠেন ; আহা রে !

ঐ প্রথম উচ্ছ্বাসটাই এ শিল্পের শেষ কথা। একটা আর্ত
 হাহাকার ! শত বর্ষ পূর্বে ঐ হাহাকারটা ধ্বনিত হয়েছিল
 শিম্পীর অন্তরে, শত বর্ষ পরে তার অনুরণন বাজছে তোমার
 আমার বুকে। কিন্তু কেন ? কী কারণে ঐ ভুলুণ্ঠিতা অনন্যার
 এই আর্তি।

আকাদেমি-প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় এই শিম্পিটির যে
 ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার আক্ষরিক অনুবাদ “দানেনদরা
 ছিল গ্রীসের এক পৌরাণিক রাজার একাধিক রাজপুত্রী।
 বিবাহরাত্রেই তারা তাদের স্বামীদের হত্যা করেছিল। সেই
 অপরাধে তারা নির্বাসিত হল নরকে। সেখানে একটি সিঁহদ্র
 পাশে জল ভরার শাস্তি দেওয়া হল তাদের।... রোদ্দ্যা
 কাহিনীটিকে রূপায়িত করলেন একটি অপূর্ব নগ্ননারীর
 মাধ্যমে। সিঁহদ্র কুন্তে জল ভরতে অক্ষম মেয়েটি ক্লান্তিতে ঐ
 পাত্রের উপরেই লুটিয়ে পড়েছে। তার আলুলায়িত কুন্তল ঐ
 কলস-নির্গত বারিরাশির সঙ্গে সঙ্গীত রক্ষা করে যেন বেদনার
 একটি উৎসমুখ খুলে দিয়েছে।”

মন ভরল ? আমার বাপু ভরেনি। ফুটো পাত্রের তলা
 দিয়ে সবটুকু কারুগ্যরসই চুঁইয়ে বেরিয়ে গেল। পরিবর্তে
 মনে জাগল হাজারো প্রশ্ন : কেন ? কেন ? কেন ? কী
 কারণে দানেন্দ পিশাচীরা ফুলশয্যার রাত্রেই যোথভাবে স্বামী
 হত্যা করেছিল ? একটা করুণ রসের পরিবেশন কেন করা হল
 বীভৎস রসের পাত্রে : এ যে পোঁয়াজ-রসুনের গন্ধে ম-ম
 ডেক্চিতে পরমাম পরিবেশন ! সমাজ সচেতন দর্শকের তো
 বলার কথা : বেশ হয়েছে ! উচিত শিক্ষা হয়েছে !
 ভাতারখাকির নাকটা আরও ভালো করে ঘষে দাও পাথরে।

কিন্তু কই ? তা তো বলতে পারছি না ! কেন ঐ স্বামী-

হস্তকে ঘৃণা করতে পারছি না ? কেন ইন্দ্র দুগারের বাউল গানে দোহার দিয়ে উঠতে ইচ্ছে জাগছে : আহা রে !

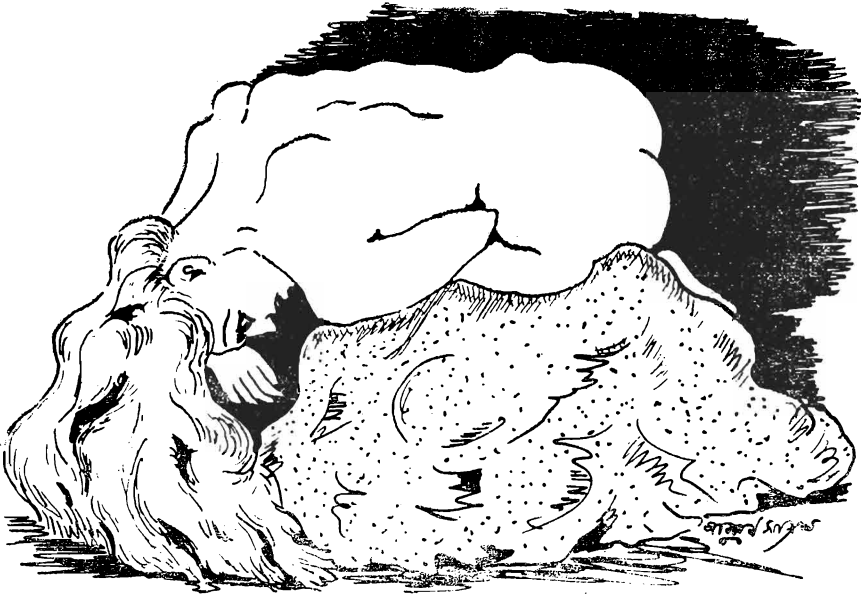
পুস্তিকাটি ইন্দ্র দুগারের নাসাগ্রে মেলে ধরে প্রশ্নটা করতে গেলুম। ফলে ধমক খেতে হল উষ্টে : নারায়ণবাবু ! রাজার-রাজার মন্দিরেই যখন এসেছেন তখন পাণ্ডার বুজরুকিতে কান দেন কেন ? রোদ্দ্যাকেই দেখুন না ভালো করে।

ওঁর একথা বলার হুকু আছে। উনি ঐ বাহানের দলে, আর্মি একলাখের। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হল শ্রদ্ধায় শ্রীচিন্তামণি কর মশায়ের ব্যাখ্যা—“গ্রীক রূপক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই মূর্তিকে রোদ্দ্য নরকের দ্বার-এ সংলগ্ন করেছিলেন। পুরাকাহিনীর এক গ্রীক রাজনের কন্যারা (দানাদবৃন্দ) বিবাহরাত্রি তাদের পতিদের হত্যা করত এবং এই পাপের কৃতফলস্বরূপ নরকে পতিত হয়ে একটি তলহীন আধারে অবিরাম জল ভরার প্রায়শ্চিত্তের শাস্তি পেতে থাকে। তলহীন আধারের উপর লম্বাবান এই অপূর্ব নারীমূর্তির জলধারা-সিঞ্চিত কেশ অভিব্যক্ত করছে চিরকালব্যাপী অভিশপ্ত নরক-যন্ত্রণাকে। মার্বেরে খোদিত এই মূর্তির বড় সংস্করণটি রোদ্দ্যার একটি সার্বিক সৃষ্টির অর্ধগর্ভিত।”

সমাধান দূর-অন্ত, সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে গেল।

“পতিদের হত্যা করত”—মানে কী ? Use! to kill ? স্বামীরা তাতে আপত্তি করত না ? হত হ’ত ? দ্বিতীয়ত : এ শিল্পের মৌল আবেদন যদি “চিরকালব্যাপী অভিশপ্ত নরক-যন্ত্রণা” তাহলে বলতে হবে—রোদ্দ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন সে ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে ! পরিদৃশ্যমান নগ্নিকা ‘পাপী’ নয় আদৌ ! তার প্রতিটি প্রত্যঙ্গে অপাপবিদ্ধার দ্যোতনা ! তৃতীয়ত : মূর্তির নিচে ওটা যদি জলপাত্রই হবে, তবে অমন আকার কেন ? ওটাকে আদৌ কোন ‘জলপাত্র’ বলে তো মনে হচ্ছে না ? একটা ‘কলসী’ কি করে খোদাই করতে হয় রোদ্দ্য সেটুকুও জানতেন না ?

বাধ্য হয়ে দৌড়তে হল অগতির গতি জাতীয় গ্রন্থাগারে। অনেক হাণ্ডে যে উপকথাটি উদ্ধার করা গেল তা এই— সে অনেক অনেকদিন আগেকার কথা। সেই যখন গাছ, মাছ, পশুপাখিরা মানুষের ভাষায় কথা বলত। তখন আরগস রাজ্যের রাজা ছিলেন দানায়ুস আর সাগরপারে নীল নদের দেশে রাজা ঈজিপ্টাস। মজা এই : দানায়ুস-এর ছিল পঞ্চাশটি কুঁচবরণ রাজকন্যা, আর ঈজিপ্টাসের পঞ্চাশটি হীরের টুকরো রাজপুত্র। যা ভাবছেন তাই হল—‘কে-কোথা ধরা পড়ে কে জানে !’ প্রেম বিশ্বজয়ী, ফলে ভূমধ্যসাগরটাকে মনে



চিত্র-1 : Danaide (1885)—দানাদ

হল গোম্পদ ! মিশরীয় রাজপুত্রেরা ময়ূরপঙ্খী চেপে চলে এল এ পারে, পক্ষিরাজের পিঠে আরগস্-এ। পঞ্চশর-প্রপীড়িত পঞ্চাশটি পাত্রের পঞ্চাশজন প্রণয়িনী।

দানায়ুস্ লোকটা দানব। সে দেখল—এই মোক্ষম সুযোগ ; ক্ষমতাশালী প্রতিবেশী নৃপতিকেকে কজা করার এ-এক মোক্ষৎসে মেলা মওকা। একটা নারকীয় ষড়যন্ত্র ফেঁদে ফেলল সে। মিশররাজের কাছে প্রস্তাব পাঠালো—সে ঐ পঞ্চাশজন মিশর-কুমারকে জামাতা করতে ইচ্ছুক। মিশরাধিপতি তো সানন্দে সম্মত। প্রতিবেশী দুই রাজ্যের দীর্ঘদিনের লড়াই-কাজিয়া তাহলে এবার মিটেবে ! দু-রাজ্যেই বাজতে থাকে পঞ্চাশজোড়া বিয়ের সানাই ! শুরু হয় বিপুল আয়োজন।

কিন্তু আগেই বলেছি, দানায়ুস্ একটা পিশাচ ! আত্মজাদের ডেকে সে বলল—“ফুলশয্যার শেষরাতে রতিক্রান্ত রাজপুত্ররা যখন ঢলে পড়বে অঘোর ঘুমে তখন তোরা ঠাণ্ডা মাথায় ষে-যার স্বামীকে হত্যা করিস্। ব্যস্ ! তাহলেই রাতারাতি মিশররাজ হয়ে যাবে নির্বংশ !”

আশ্চর্য লোকগাথা ! রাজকন্যারা সবাই একবাক্যে সম্মত। না, ভুল বললাম। সবাই নয় ! একজন বাদে। সেই পঞ্চাশতমা দানেন্দ—উপকথায় তার নামটা খুঁজে পাইনি, কাহিনীর খাতিরে না-হয় ধরে নিন তার নাম ‘অনন্যা’—সে পারল না। হতভাগী ফুলশেষের ঐ একরাতের মধ্যেই ভালবেসে ফেলেছিল তার বরকে—রাজপুত্র লিন্সিসয়ুস্কে। শেষরাতে রাজপুত্র যখন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে আর প্রহরীর প্রহর-সঙ্কেতে যখন ভেসে এল হত্যা-মুহুর্তের গোপন ইঙ্গিত তখন একটা আর্ত হাহাকারে শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ল অনন্যা। লিন্সিসয়ুস্ সচকিত হয়ে উঠে বসে ; বলে, কী হয়েছে অনন্যা ? কঁাদছ কেন ?

অনন্যা তখন ফুলশেষের উপাধানে মুখ ঘষতে ঘষতে শুধু বলছে, না, পারব না, আমি পারব না—কিছুতেই পারব না !

—কী ? কী পারবে না ?

কাহিনী দীর্ঘতর করা নিরর্থক। রাজকন্যার বার্থতায় প্রাণে বেঁচে গেল লিন্সিসয়ুস্। বিবাহবাসর থেকে রাজকন্যার সহায়তায় একা পালিয়ে বাঁচল। সপ্তাহান্তে—যেন অষ্টমঙ্গলার বর—লিন্সিসয়ুস্ ফিরে এল আরগস্-এ, মিশর-সেনাপতিরূপে। তার সে দুর্ধর্ষ বাহিনীকে রাখা গেল না। আরগস্-রাজপ্রাসাদে সোঁদন শুধু হত্যার উৎসব। ঊনপঞ্চাশ ভাইয়ের হত্যার

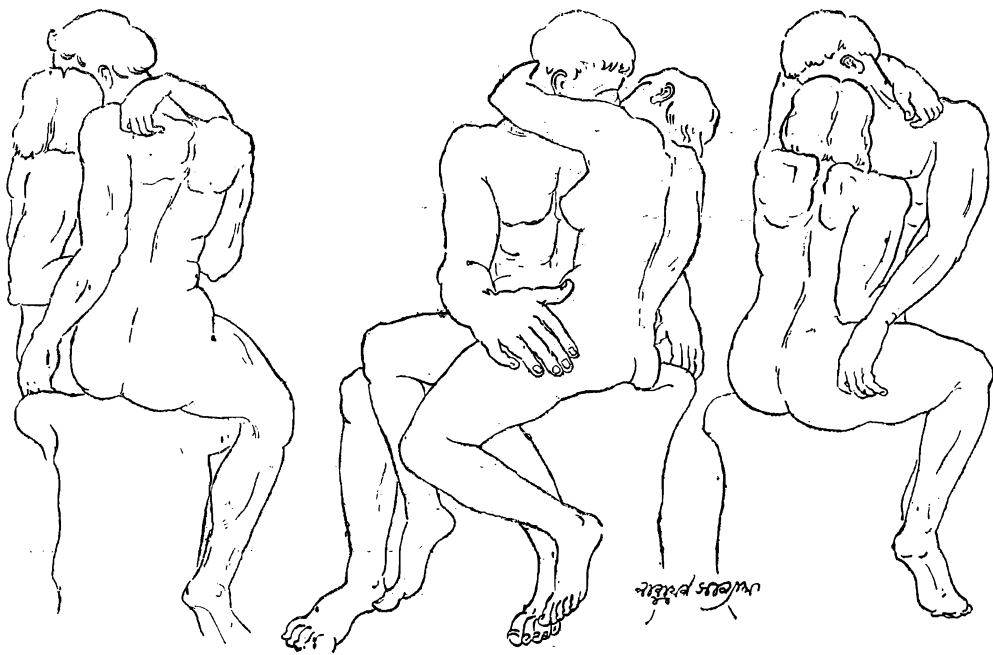
প্রতিশোধ নিল মিশরকুমার। দানায়ুস্-এর ছিন্নাশির শূলবিদ্ধ করে সর্গোরবে ফিরে গেল মিশররাজ্যে। বিধ্বস্ত নগরীর একান্তে উপেক্ষিতা রাজকন্যা তখন ভাবছে, কোথায় তার মুখখানা লুকোবে। বলাবাহুল্য লিন্সিসয়ুস্ ঐ দানবকন্যা দানেন্দকে গ্রহণ করেনি। স্বদেশেও সে বিশ্বাসহস্তা, সব সর্বনাশের মূল ! তার ঊনপঞ্চাশ-ভগ্নীর তো নরকবাসের শাস্তি হল ; কিন্তু তার ? সেই পরিতাপ্তা মেয়েটি তার একরাত্রের দাম্পত্যজীবনের সুখস্মৃতিটুকু আঁচলের খুঁটে বেঁধে কেমন করে বাকি জীবনটা কাটালো ? কাহিনীকার সেকথা বলতে ভুলেছেন।

পাঁচ-সাতখানা বই ষেঁটোঁছ ; কিন্তু না, কোনও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য কলাসমালোচক এ-কথা বলেননি। কিন্তু কী-জানি কেন আমার মনে হয়েছে সেই কাব্য-উপেক্ষিতার মর্ষাদাটুকু মিটিয়ে দিতেই রোদাঁয়া ছেঁন হাতুড়ি তুলে নিয়েছিলেন। এই সত্যটুকু আবিষ্কৃত হবার জন্য রোদাঁয়ার কলকাতায় আসার প্রয়োজন ছিল। কারণ আমাদের কাছে এটা নতুন নয়। এই কলকাতা শহরেই আর এক শিল্পীকে যে আমরা দেখেছি একইভাবে কলম তুলে নিতে—‘কাব্য উপেক্ষিতা’ উর্মিলা আর পল্ললেখার প্রাপ্য মর্ষাদাটুকু মিটিয়ে দিতে। অনন্যার অপরাধটা কী ? একটাই অপরাধ : হতভাগিনী ভালবেসেছিল। একথা সত্য যে, এই ভাস্কর্যটি ‘নরকের দ্বারের’ জন্যই নির্মিত হয়েছিল ; কিন্তু সে-নরক কম্পলোকের নরক নয়—ঊনবিংশ-শতকের দরদী শিল্পীর স্বচক্ষে দেখা নরক—যে নরকে প্রেমের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান ; যে নরকে অপাপবিদ্ধারাই শুধু নরকযন্ত্রণা ভোগ করে !

তাই বলব : ফুটো পাত্রে জলভরার দৈহিক যন্ত্রণার ব্যঞ্জনা এখানে আদৌ নেই। দৈহিক ক্রান্তিতে কোন সীমন্তিনী ওভাবে ‘বসুধালিঙ্গনধূসরন্তনী’ হয় না ! এ যন্ত্রণা আন্তর ; এ হাহাকার আত্মিক ! ওর আলুলায়িত কুন্তলও নয় কলসানিগত বারিরাশির উপমান ; তা ওর হৃদয়-নিঙড়ানো অশ্রুবন্যার সঙ্গেই ঐক্যতান রচনা করছে। তাই ও ‘বিললাপবির্কীর্ণমুখের জা’ ! মূর্তির নীচে ব্যাখ্যাকার যেটাকে কলস বলেছেন সেটা একটি আর্গশিক-উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড। সেটা কোনও পরিচিত বস্তুর আকার আদৌ নেয়নি। এটা রোদাঁয়া-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য। আমরা বারে বারে সেটা লক্ষ্য করব। শিল্পের অংশবিশেষ তিনি অসমাপ্ত রেখে যান—ভাবখানা, সেটুকু মনে

মনে উৎকীর্ণ করার দায়িত্ব দর্শকের। রোদাঁ এদিক থেকে
কট্টর দ্বৈতবাদী। শিল্পী ও দর্শক উভয়ে মিলে শিল্পরস
সৃজন করবে। দুয়ে মিলে এক। ঐ অর্ধ-উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ডে
যদি কলসের আদল আদৌ খুঁজে পান তাহলে আমি বলব,
ওটা ওর ব্যর্থ জীবন-যৌবনের দ্যোতক। সুপাত্রও এসেছিল
ওর যৌবননিকুঞ্জে, অমৃতও সঞ্চিত হয়েছিল ওর কুমারী-হৃদয়ে ;
—কিন্তু পাত্রে সেটা ধরে রাখতে পারেনি !
ওটা ঐ অনন্যার যৌবনসরসীনীরের শূন্য কুন্ড !

এতক্ষণে কি মন ভরেছে ?
আমার কিন্তু এখনও ভরেনি। তবুও একটা প্রশ্ন রয়ে গেলে—
যে মনে—
অনন্যার চোখে কেন অমন উন্মাদিনীর দৃষ্টি ? অপারিসীম
বেদনায় চোখ দুটি তো বুজে যাবার কথা ? যেমন দেখেছি—
অজস্তা-ষোড়শগুহার মরণাহতা রাজকন্যায়, মিকেলাঞ্জেলোর
পীতায়, বার্গিনীর শোকাহতা সান্তা থেরেসা-য় !
অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোনও কারণ খুঁজে পাইনি !



ক

ছোট বোন থেরেস্কে নিয়ে পাপা রোদ্যা যখন বার্থ-রেজিস্ট্রেশন অফিসে ঢুকল তখন দপ্তর সবে খুলেছে।

থেরেস ওর চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, নিজের বোন নয়, বৈপত্যক। তা হোক, রোদ্যা পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিবিড়।

রেজিস্ট্রেশন-ক্লার্ক ওদের চিনত। বলে, সাতসকালেই যখন হাজিরা দিয়েছ তখন সুখবর নিশ্চয়ই আছে। ছেলে না মেয়ে? একগাল হাসল পাপা রোদ্যা, আরে না বাপু, আর মেয়ে নয়—এবার ছেলে! বংশের নাম রেখেছে এমন ছেলে।

করণিক ততক্ষণে থেরেসকে সুপ্রভাত জানিয়েছে। তাকেই বলে, মাদমোয়াজেল, তোমার দাদার কি মাথা খারাপ? কাল রাতে বাচ্চাটা পয়দা হল আর আজ সকালের মধ্যে সে বংশের নাম রাখল?

পাপা রোদ্যা বলে, বলছি কি সাধে? পঞ্চকেটার মাথা ভর্তি টুকটেকে লাল চুল!

—তাতেই বংশের নাম রাখা হয়ে গেল?

—গেল না? ‘রোদ্যা’ কথাটার মানে জানো? নর্ম্যাণ্ডিতে ‘রোদ্যা’ মানে রেড-হেড! লাল-মাথা!

করণিক হাসতে হাসতে বলে, তাহলে অবশ্য ওকথা বলতে পার। তা ছেলের নাম কি রেখেছ? রেজিস্ট্রারে কি লেখা হবে?

পাপা রোদ্যা মোম-দিয়ে-পাকানো তার পুরুষ গৌফজোড়ার প্রান্তদেশকে একটু উধ্বগামী করে বলল, ফ্রাশোয়া অগুস্ত্ রেনে রোদ্যা। পিতা: পারীসীন, জাঁ বার্পিস্ত্ রোদ্যা, বয়স আটত্রিশ; আদি নিবাস নর্ম্যাণ্ডি; হাল-সাকিন: তিন

নম্বর রু দ্য ল’-আর্বেলেং, পারী। মাতা: মারিয়া রোদ্যা, আদি নিবাস—লোরেইন, বয়স চৌত্রিশ। পুত্রের জন্ম তারিখ: বারোই নভেম্বর, ইয়ার অব্ দ্য লর্ড আঠারশ চল্লিশ।

করণিক হাসতে হাসতে বলে, বাপ রে! তুমি কি সারা রাস্তা বাঁধা লজ্জটা মুখস্থ আওড়াতে আওড়াতে আসছিলে? নাও ধর—এসব বৃত্তান্ত খাতায় লিখে দস্তখৎ করে দাও।

রেজিস্ট্রার খাতাখানা সে কাউন্টারের এ-প্রান্তে ঠেলে দেয়। পাথপালকের কলমটা কালিতে ডুবিয়ে ধরিয়ে দেয় পাপা রোদ্যার ডানহাতে।

আর ঠিক তখনই পাপার মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হল। তার প্রফুল্লতা, পুত্রগর্বের দাঢ়ের উপর একটা ছায়াপাত ঘটল যেন। ডানহাতে কলমটা ধরা, তাই বাঁ হাতে সে কোটের পকেট আঁতিপাতি হাঙড়ে বোনের দিকে ফিরে বলে, কেলেঙ্কারি কাণ্ড! চশমাজোড়া তাড়াহুড়ায় বাড়িতে ফেলে এসেছি। তুইই বরং লিখে দে এক-কলম।

হাসল থেরেস। দাদার হাত থেকে কলমটা নিল। একবার আড়চোখে দেখে নিল করণিকের দিকে তারপর গুঁছিয়ে নিয়ে দাদাকে বলে, তা না হয় লিখে দিচ্ছি; কিন্তু আমার মজুরি কী দেবে?

পাপা রোদ্যা চটে খয়ের! করণিককেই সালিশ মানে, দেখ তো ভাই এর আদার! চশমাটা ভুলে ফেলে এসেছি—এক কলম লিখে দেবে—তার আবার মজুরি!

থেরেস লিখতে লিখতে বলে, বেশি কিছু নয়; কথা দাও—আমার ভাইপো যদিও আমার নাতির নাম লেখাতে আসবে সেদিন চশমাটা বাড়িতে ফেলে আসবে না!

করণিক তো থ! এরা সবাই পাগল নাকি?

কিন্তু পাপা রোদ্যা ঠিক সমঝে নিয়েছে। বলে, ঠিক আছে, কথা দিলুম। লেখ তুই।

পাপা রোদ্যা নিজেই কি অনুভব করে না জ্বালাটা? তার বাপ তাকে কোনদিন ইঙ্কলে ভর্তি করেনি। আর সেই গণ্ডগ্রাম 'ভিতং'-এ ইঙ্কলেই ছিল নাকি ছাই? বাপ ছিল সম্পন্ন চাষী। ছেলেকেও শিখিয়েছিল ঐ একটিই বিদ্যা: চাষাবাস। কিন্তু পাপা রোদ্যা সে বিদ্যাটাও কাজে লাগাতে পারেনি। জোতদারের বেড়াজাল আর মহাজনের খ্যাপ্লা-জালে মালিক চাষী হল ভাগচাষী, ক্রমে মজুর চাষী, শেষে সব কিছু খুইয়ে নিঃস্ব হয়েছিল। প্রথমা স্ত্রী একমাত্র কন্যা ক্লোতল্দকে রেখে তার আগেই স্বর্গে গেছে। সেই মাতৃহীনার দেখভাল করার জন্য দ্বিতীয়া স্ত্রী মারিয়াকে ঘরে এনেছে। সব কিছু বেচেবুচে দিয়ে পাপা রোদ্যা স্ত্রীকন্যার হাত ধরে চলে এসেছিল অগতির গতি—পারীতে। সে আজ আট-দশ বছর আগেকার কথা। তারপর ওর সংসারে এসেছে দ্বিতীয়া কন্যা—মেরী; মায়ের নামে তার নাম। ভারী বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী মেয়ে। আর এতদিন পরে ছেলের মুখ দেখল পাপা রোদ্যা। আশ্রয় জুটোঁছিল একটা বস্তিতে। দেড়-কামরার টালির ঘর। বলতে গেলে লালবাতিজ্বলা চাকলাটার গা-ঘেঁষে। যত মাতাল আর বদমাইশের আড্ডা। যোবনবতী স্ত্রী মারিয়াকে সে সাঁঝের পর ঘরের বার হতে দিত না—যা সুনাম পল্লীটার—কী জানি ঐ বেজন্মার দলের কোনও মস্তান যদি বুঝতে না পারে যে, সে গৃহস্থ ঘরের বধু! যদি হাত ধরে টানে! ধরা-পাকড়া করে একটা চাকরি অবশ্য জুটল—পুলিশ বিভাগে। সংবাদবহর কাজ। চিঠি বিলি করে আসতে হয় সহরের বিভিন্ন প্রান্তে। বোঝা বখেড়াটা! নিরক্ষর মানুষ ঠিকানা মিলিয়ে চিঠি বিলি করছে! বেচারি না পড়তে পারে খামের লেখা, না রাস্তার নাম! তবু লড়ে যাচ্ছে! বাৎসরিক ছয় শ ফ্রাঁতে ঢুকোঁছিল চাকরিতে; এখন বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছে আট শয়। কিন্তু ঐ আক্কাগণ্ডার বাজারে বছরে আট শ ফ্রাঁতে কী হয় বল? বছরে আট শ মানে হপ্তায় কত হল? দাঁড়াও! সে বড় জটিল হিসাব! বছরে তো বাহান্নটা হপ্তা? তাহলে আট শকে বাহান্ন দিয়ে ভাগ করা দরকার। সে কি মুখে মুখে হয়? ও কাগজ পেন্সিল পেলেও হয় না। মানে পাপা রোদ্যার হয় না। না হোক, ক্ষতি নেই। তোমরা কাগজে

আঁকিবুঁকি টেনে যে ভাগফলটা পাবে সেটা পাপা রোদ্যা বিনা-আঁকেই সমঝে নিতে পারে। দারিদ্র্য এমনই এক আজীব চিড়িয়া যে, তাকে তোল করতে আঁকের দাঁড়-পাল্লা লাগে না। শূন্য উদরেই তার ওজনটা মালুম হয়।

নাঃ! যে ভুল তার বাপ করেছিল, পাপা রোদ্যা সে ভুল করবে না। অগুস্ত্ যোঁদিন তার সন্তানের নাম লেখাতে এই দপ্তরে আসবে—আজ থেকে বিশ-পঁচিশ বছর পরে—সোঁদিন তাকে পকেট হাৎড়ে চশমা খোঁজার অভিনয় যাতে না করতে হয় সে ব্যবস্থা পাপা রোদ্যা করবেই!



অগুস্ত্ তার শিপ্পাশিক্ষার প্রথম পাঠ—এবং বলতে গেলে শেষশিক্ষাও পেয়েছিল মাত্র চার বছর বয়সে। ঘটনাটা সে সারা জীবনে ভোলেনি। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনা যদিচ সামান্যই।

একদিন থেরেস্-পিস এসে বললে, এই দ্যাখ্ খোকন, তোর জন্য কী এনেছি।

হাত-বটুয়া হাৎড়ে বার করল একটুকরো ক্রেয়ন পেন্সিল। অগুস্ত্ এর আগে ফায়ার-প্লেস্-এর কাঠকয়লা দিয়ে মেজেতে আঁকিবুঁকি এঁকেছে, পিট্টানিও খেয়েছে সেজন্য বাপের কাছে; কিন্তু ক্রেয়ন পেন্সিল সে কখনও চোখে দেখেনি।

কথা হচ্ছিল চায়ের টেবিলে। পাপা রোদ্যা পেন্সিলটা তুলে নিয়ে বলে, এটা কোথায় পেলি রে থেরেস্? কিনোঁছিস্? কত দাম?

থেরেস্ বলে, কিনিনি। ড্রিলিং-এর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।—হুঁ! 'না-বলিয়া চাহিয়া আনা' তো?

থেরেস্-এর মুখটা লাল হয়ে ওঠে। পাপা রোদ্যা ধরেছে ঠিক। থেরেস্ বে-খা করেনি। যদিও সে তিন-তিনটি সন্তানের জননী। এখন সে ড্রিলিং-এর স্টুডিওতে গভর্নেস্। শিপ্পী ড্রিলিং-ও আঁববাহিত। তার সংসার, স্টুডিও, রান্নাঘরের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এখন থেরেস্-এর।

মারিয়া বলে, ভারি তো একটুকরো পেন্সিল নিয়ে এসেছে, তাতে এত কথা কিসের? নে রে খোকন, এবার থেকে ঐ পেন্সিলেই ছবি আঁকিস্।

থেরেস্-এর প্রফুল্লতা ফিরে আসে। বুটি-জড়ানো কাগজটা নিভাঁজ করে উষ্টোঁ দিকটা টেঁবিলে মেলে ধরে। সোঁদিকটা

সাদা। থেরেস্ বলে, এই কাগজে একটা গোল আঁক দিকিন ? একত্রে নিটোল গোল হওয়া চাই কিন্তু।

অগুস্ত্ ডান হাতে মুঠো করে পেন্সিলটা বাঁগিয়ে ধরল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাগজটার ওপর। লাল জিবের ডগাটুকু বার হয়ে আছে টুকটুকে ঠোঁটের ফাঁকে। পেন্সিলটা কাগজ থেকে একবারও উঠল না। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল চক্রাবর্তনের পর ফিরে এল সেখানেই। কিন্তু কোথায় গোল ? আঁকা-বাঁকা চ্যাপ্টা একটা ঘোড়ার ডিম ! নিজেই নিজের প্রথম শিল্পপ্রচেষ্টার কঠোর সমালোচনা করে : দূর ! হল না ! থেরেস্-পিসি ওর হাত থেকে ক্রেনটা কেড়ে নিল। বললে, এবার তুই চোখ বন্ধ কর। দ্যাখ্, আমি কেমন নিটোল গোল আঁকি। খবদার দেখাবি না কিন্তু !

খোকন তার ছোট দু-হাতে চোখ দুটি ঢাকে। আর্মিনট না-হতেই পিসি বলে, হয়ে গেছে। এবার চোখ খোল। দ্যাখ্, আমি কেমন আঁকছি।

অগুস্ত্ অবাক হয়ে দেখে তার তেড়াবাঁকা রেখাকে ঘিরে একটি নিটোল বৃত্ত। বলে, তোমার আঁকার হাত তো দারুণ, পিসি !

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেরী। ওর চেয়ে তিন বছরের বড় ছোড়দি। বলে, না ! পিসির চেয়ে তোর ছবিটা অনেক ভালো।

অগুস্ত্ তাজ্জব। ছোড়দিটা কী তালকানা রে বাবা ! মেরী খালি চায়ের কাপটা পিসির ছবির ওপর উবুড় করে বলে, এই দ্যাখ্ ! পিসি জোচ্ছুরি করেছে। কাপটাকে বসিয়ে তার চারপাশে লাইন টেনেছে। তুইই জিতবে ! সেই চার-বছর বয়সে শিল্পসম্বন্ধে এই ওর প্রথম শিক্ষা। দীক্ষাগুরু ওর ছোড়দি।

যান্ত্রিক অনুকরণের চেয়ে অনেক বড়—তেড়াবাঁকা হলেও, স্বকীয়তা। অরিজিনালিটি !

শৈশবকালের আর একটি ঘটনা ওর অন্তরে দাগ কেটেছিল। সেই যেদিন ওর বড়দি বাড়ি ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যায়। তখন ওর বয়স পাঁচ। রাত তখন কত হবে ? আটটা-নয়টা। নৈশাহারে বসেছে সবাই। টেবিলের মাথায় পাপা রোদ্যাঁ, তার উপোঁ দিকে মায়ের চেয়ার। এপাশে খোকন, ওপাশে ছোড়দি, মেরী। আর একটা চেয়ার শূন্য। সেটা ক্রোতিল্দ্-এর। বড়দি তখনও বাড়ি ফেরেনি। তখন

বুঝত না, পরে বড় হয়ে বুঝতে শিখেছে, বড়দি এ সংসারে নিজেকে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারেনি। মা তাকে খুবই ভালবাসতো—যেন নিজেরই মেয়ে। ছোড়দিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসত তার দিদিকে। অবশ্য ছোড়দিটা সবাইকেই দারুণ ভালোবাসে। চেনা অচেনা, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাইকেই ; যেন ভালবাসার একটা অফুরন্ত প্রস্রবণ আছে ওর অন্তরে। শুধুমাত্র পাপা রোদ্যাঁ কি জানি কেন বড়দিকে সহ্য করতে পারত না। ক্রোতিল্দ্ পাপা রোদ্যাঁর এই বিরূপতা উপলব্ধি করত নিশ্চয়ই ; কিন্তু প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করত না। তখন তার বয়স আঠারো-উনিশ, ডেটিং করার বয়স হয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করবে না—কবে কার সঙ্গে ডেটিং-এ যাচ্ছে। স্বীকার করার কথাও নয় ; বিশেষ বাপের কাছে। কিন্তু পাপা রোদ্যাঁর খবরদারী করা স্বভাব। সব কিছুই তার জানা চাই। সে না সংসারের কর্তামশাই ?

বড়দির খাবারটা ঢেকে রেখে মা এসে বসল তার চেয়ারে। বলল, আর রাত করা ঠিক নয়। এরপর খোকন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।

পাপা রোদ্যাঁ জানতে চায়, বিদ্যেধরী কি রাতে ফিরবেন ?

মা জবাব দিল না। কথা বললেই কথা বেড়ে যাবে। নিঃশব্দে খাবার বেড়ে দিতে থাকে।

আহারপর্ব যখন মধ্যপথে তখন ফিরে এল ক্রোতিল্দ্। বললে, পারদাঁ। বলে যেতে ভুলে গেছি, আমার রাতে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে। তোমরা খেয়ে নাও সবাই।

পাপা রোদ্যাঁ ছুরি-কাঁটা প্লেটে শুলিয়ে রাখে। বলে, মাদ্‌মোয়াজেল, আপনার কথাটা ঠিক মালুম হল না। এই মধ্যরাত্রেও কি আপনার নৈশাহার সারা হয়নি ?

ক্রোতিল্দ্ লজ্জা পেল। বললে, না, রাত এমন কিছু বেশী হয়নি। এবার খেতে যাব। টেবল বুক করা আছে। ও বাইরে অপেক্ষা করছে।

টেবল বুক করে পাপা রোদ্যাঁ জীবনে কখনও ডিনার করেনি। বললে, ও ! কী নাম মসুয়ের ? পরিচয় ? তা বাইরে কেন ? এ গরীবখানায় কি পাঁচ মিনিটের জন্য তিনি আসতে পারেন না ?

ক্রোতিল্দ্ প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বলল, তোমরা শুলে পড় বরং। আমি ডুপলিকেট চাবিটা দিয়ে—

সোজা হয়ে বসল পাপা রোদ্যাঁ। বলল, ডুপ্লিকেট চাবিটা

রেখে যাও ক্লোতিল্ড্‌।

—মানে ?

—তুমি কি ফরাসী ভাষাটা ভুলে গেছ ? চাবিটা দাও !
গর্জে ওঠে পাপা।

ক্লোতিল্ড্‌ নিঃশব্দে হাত-বটুয়া খুলে চাবিটা বার করে
পাপা রোদ্যাকের প্রসারিত হাতে ফেলে দিল। গম্ভীরভাবে বলে,
এর মানে ?

—এর মানে, ঐ ছোকরাকে জানিয়ে দাও—রোদ্যাক পরিবারের
একটা ইজ্ঞা আছে। নৈশ-আহারের বিনিময়ে একটি নারীদেহ
লাভ করবার বাসনা থাকলে ছোকরা যেন একটু এগিয়ে
দেখে। ঐ লালবারিতজলা চাকলাটায়।

মারিয়া চাপা গলায় ধমক দেয়, আহ ! কী অসভ্যতা
হচ্ছে। ভদ্রলোক শুনতে পাবেন।

—আমি তাই চাই। ঠিক আছে। আমিই বলে আসছি।
গাত্রোখান করবার উপক্রম করতেই ক্লোতিল্ড্‌ বাধা দেয়।
বলে, ওকে যা বলবার আমিই বলব। কিন্তু এভাবে ওকে
অপমান করার মানে কী ?

পাপা প্রতিপ্রশ্ন করে, নিমন্ত্রণটা যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে
সে-কথা ওকে কে বলবে ? তুমি না আমি ?

—কেউই বলবে না। কারণ সেটা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে না।
আমি যাচ্ছি।

—মনে রেখ ক্লোতিল্ড্‌ ! তাহলে ফিরে আসার সময় দরজাটা
তুমি খোলা পাবে না। এ বাড়ির দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ
হয়ে যাবে তোমার কাছে।

মান হাসল ক্লোতিল্ড্‌। বলল, এটা যে একদিন হবেই
সেটা জানা ছিল। তবে আরও সুন্দরভাবে বিদায় নিতে
পারব, এই আশা ছিল।

মারিয়া উঠে দাঁড়ায় উত্তেজনায়। পাপাকে ধমকে ওঠে,
এসব কী হচ্ছে ?

পাপাও উঠে দাঁড়ায়। বলে, কী হচ্ছে বুঝতে পারনি ?
তোমার বড় মেয়ে ঐ চাকলাটায় নাম লেখাতে যাচ্ছেন।

মেরী ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। অগুস্ত্‌ কিছুই বুঝতে পারে
না ; কিন্তু ছোড়ীদিকে কাঁদতে দেখে সে-ও কাঁদতে থাকে।

ছোড়ীদিকে ও ভীষণ ভালোবাসে।

ক্লোতিল্ড্‌ এগিয়ে আসে। মেরীর চুলগুলো এলোমেলো করে
দেয়। অগুস্ত্‌-এর গালে একটি চুষন-চিহ্ন এঁকে দিয়ে ঘুরে

দাঁড়ায়। পাপা রোদ্যাকে সম্বোধন করে বলে, জীবনের
উনিশটা বছর খেতে পরতে দিয়েছিলে এ জন্য ধন্যবাদ।

অগুস্ত্‌ চোখ মুছে যখন তাকিয়ে দেখল ফের, তখন ঘরে
সবাই আছে। বর্ডাদি ছাড়া।

অগুস্ত্‌ তাকে জীবনে আর দেখেনি। না, ভুল হল। অগুস্ত্‌
তাকে দেখেছিল, জীবনে দুবার। ক্লোতিল্ড্‌ একবার।

ওর যখন আট বছর বয়স তখন ফরাসীদেশে একটা বড়
জাতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন হল। সেসব কথা বোঝবার
মত বয়স তখন ওর নয়। পরে জেনেছে। আবছা মনে
পড়ে—শহরে একটা চাপা উত্তেজনা। মাঝে মাঝে গোলাগুলির
শব্দ। সব সময় কী হয়, কী হয় অবস্থা।

বিশ্বদ্রাস নেপলিয়ন্‌ বোনাপার্টের পতনের পর ষোড়শ লুই-এর
ছোট ভাই ‘অষ্টাদশ লুই’ খেতাব নিয়ে চড়ে বসেছিলেন
ফ্রান্সের সিংহাসনে। তারপর তাঁর ভাই দশম চার্লস্‌
হয়েছিলেন ফ্রান্সের ভাগ্যবিধাতা এবং তারও পরে বোদৌ
পরিবারের অর্লিন্স-শাখার লুই ফিলিপস্‌ ক্ষমতা দখল
করেছিলেন 1830-এ। আঠার বছর পর তাঁর পতন হল
একটি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে। এবার সিংহাসন অধিকার করলেন
নেপলিয়ন্‌ বোনাপার্টের ভাই-পো লুই নেপলিয়ন্‌। ভিক্টর
গ্যুগো এবং বালজাক এই গৃহযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। লুই
নেপলিয়ন্‌ কিন্তু সম্রাট হলেন না তা বলে। তিনি হলেন নয়া-
রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট। সেটা আঠারশ উনপঞ্চাশ সাল।
প্রথম দিকে প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্যভার বুঝে
নিলেও বছর তিনেকের মধ্যেই তিনি পুরোপুরি ফিরে গেলেন
খুল্লতাতে জীবনদর্শনে—একচ্ছন্ন সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখলেন
লুই নেপলিয়ন্‌ দ্য থার্ড।

ঐ বছরই পাপা রোদ্যাক তাঁর ছেলেকে ভর্তি করে দিল ওর
খুড়তুত ভাই আলেকজান্ডারের ইস্কুলে। ব্যুডে স্কুলে। বছর
তিনেক সে স্কুলে যাতায়াত করেছিল। তারপর আর নয়।
খুড়ো একদিন হাত ধরে ভাইপোকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে
গেল। পাপা রোদ্যাকে বললে, দাদা, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া
বানানোই আমার কাজ। কিন্তু গাধা আর ঘোড়ার কিছুটা
আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। রামছাগল পিটিয়ে ঘোড়া বানানো
আমার কন্মো নয়।

পাপা রোদ্যাক বললে, আমি জানতুম। চাষার ছেলে তো !

খুড়ো বলে, কোন কাজকর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, দুটো ফাঁ ঘরে আসুক। মাথায় যার ষাঁড়ের গোবর তাকে দিয়ে আর কী হবে বল ?

অগত্যা তাই। বারো বছরের নিরক্ষর ছোকরার পক্ষে সবসেরা কাজ স্ন্যাক্বারের বয়ের চাকরি। এঁটো প্লেট ধুয়ে দাও, খন্দেরকে দুটো মিঠে মিঠে বুলি শোনাও, ফাই ফরমাস্ খাটো—আপসে দুটো ফাঁ পকেটে ঘুসবে। টিপ্‌স্! উপরি! পাপা রোদ্যাঁ তত্ত্বালাশ নিতে থাকে—কোথায় কোন দোকানী ছোকরা চাকর খুঁজছে।

কাহিনীর এই অংশে আমাদের মাথার টুপিটা একবার খুলতে হবে—এক অখ্যাত তরুণীর উদ্দেশ্যে। সে মেরী। অগুস্ত্-এর ছোড়দি। দৃঢ়স্বরে সে প্রতিবাদ করল, না! কাকামশাই ওকে আঁক কষাতে পারেননি বলেই ধরে নেওয়া যায় না—খোকন মাথামোটা। ওর চমৎকার আঁকার হাত। আমি লক্ষ্য করেছি। ওকে ভর্তি করে দাও পেতি-একোল-এ।

পাপা রোদ্যাঁ বিস্মিত, পেতি-একোল! সেটা কী? কোথায়?

—রু দ্যে মেদিসিন-এ। এখান থেকে আধ লীগও হবে না। সেখানে ছবি-আঁকা, মডেলিং, কাঠের কাজ, নানান শিল্প শেখানো হয়।

—কে বললে?

—বানু'ভ্যা। সে বলে, পেতি-একোলের যিনি মাস্টার-মশাই, মসুয়ে ওরাস্ লেকক—তিনি ব্যো-আর্ৎ-এর অনেক অধ্যাপকের নাক কেটে নিতে পারেন।

পাপা রোদ্যাঁর বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বানু'ভ্যা কে? ব্যো-আর্ৎ ব্যাপারটি কী? আর নাক কাটাকাটির প্রসঙ্গ উঠছে কেন?

প্রথম প্রশ্নটার জবাব দিল মা মারিয়া, বানু'ভ্যাকে মনে নেই? সেই যে দীর্ঘকায় ছেলেটি—

পাপা রোদ্যাঁর মনে পড়ল। সেই যে তালচ্যাঙা ছোকরা যার সঙ্গে মেরী ইদানিং ডেটিং করছে। বেশ, সেটা বোঝা গেল। কিন্তু ব্যো-আর্ৎ?

মেরী বুঝিয়ে দিল। ব্যো-আর্ৎ হচ্ছে পারীর সব চেয়ে বড় সরকারী শিল্প শিক্ষায়তন। পারীর নাম করা সব আর্টিস্ট—খোঁজ নিয়ে দেখ—একদিন না একদিন ওখানে নাড়া বেঁধে শিক্ষানবিশী করেছেন। ঐ ষাঁদের ছবি বছর বছর সাঁলোঁতে

প্রদর্শিত হয়: জাকুই দাভিদ, পীয়ের প্রুভৌ, আওরে, কামিল কোরো, দোমিয়ে, দেলাক্রেয়ে! কে নয়?

পাপা রোদ্যাঁ একটা ঢোঁক গিলল। আন্দাজে সম্ভে নিল অশ্রুতপূর্ব নামের ঐ সব মানুষ জ্বর তস্‌বির-ওয়াল। আরও আন্দাজ করল—মেরী ঐ নামগুলো মুখস্থ রাখতে বাধ্য হয়েছে প্রাণের দায়ে; যেহেতু বর্তমানে সে সেই তালচ্যাঙা ছোকরার—কী যেন নাম, হ্যাঁ বানু'ভ্যার সঙ্গে ডেটিং করছে। বানু'ভ্যা—পাপার মনে পড়েছে—শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখে। সে যেমন গোটা পারীর যাবতীয় গলিঘুঁজির নাম মুখস্থ রেখেছে চিঠি বিলি করার প্রয়োজনে। তা সে যাক্‌গে, মরুক্‌গে—আসল কথাটা কি এরা ভেবে দেখেছে? তাই বলে, ওখানে ইস্কুলে পড়াতে হলে ফী লাগবে না? সেটা জোগাবে কোন সুস্থকির পো?

মেরী মাথা নিচু করে বলে, আমি খোঁজ নিয়েছি, ওখানে স্কুল-ফি হপ্তায় বারো ফ্রাঁ। সেটা আমিই দেব।

—তুই! তুই কোথায় পাঁচ হপ্তায় বারো ফ্রাঁ?

এবার জবাব দিল ওদের মা, মারিয়া, কেন তুমি জান না?

মেরী তো বেবি-সিটিং করে হপ্তায় বিশ ফ্রাঁ রোজগার করে।

পাপা রোদ্যাঁর এতক্ষণে সে-কথা স্মরণ হল! মনটা তার এমনিতেই খারাপ। কিছুদিন আগে তার বড় মেয়ে গৃহত্যাগ করে গেছে। সে বেদনাটা এখনও মিলিয়ে যায় নি। পানপাত্রটা তুলে নিয়ে বললে, এবার তোমরা জাঁ বাপতিস্ট পাপা রোদ্যাঁর স্বাস্থ্যপান করতে পার! কী সৌভাগ্যবান তিনি! তাঁর এক মেয়ে ম্যাগ্দালেন, এক মেয়ে মেরী! একটি পতিতা, একটি পতিতপাবনী! আর একটি মাত্র পুত্র—সেটি রামছাগল!



নয়া রিপাবলিকের প্রেসিডেন্ট লুই নেপলিয়ঁ যেমন সে-আমলে স্বপ্ন দেখত একচ্ছত্র নেপলিয়ঁ দ্য থার্ড হবার, তেমনি বানু'ভ্যা স্বপ্ন দেখত দেলাক্রেয়ে দ্য সেকেও খেতাবের। মেরীর বয়স্ফেও, বিশ বছরের তরুণ বানু'ভ্যা একদিন অগুস্ত্কে নিয়ে হাজির হল পেতি একোলে। গুরুমশাই ওরাস্ লেকক্ দ্য বোয়াবোদ্রান্-এর সামনে হাজির করে বললে, এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম মেৎ‌র, অগুস্ত্ রোদ্যাঁ।

দ্বয়োদশবর্ষীয় নাবালকটিকে আপাদমস্তক একবার

দেখে নিলেন লেকক্। যেন শিশু ওকগাছ! বললেন,
যাহোক কিছু আঁক দেখি ?

অগুস্ত্ ওঁর হাত থেকে কাগজ-পেন্সিলটা নিল। 'যা-
হোক' কেমন করে আঁকবে ভেবে পার না। বলে, 'যা-
হোক' আবার কী ?

—সুভব্ দেখেছিস্ ?

—কতবার !

—বল দেখি সেখানে সবচেয়ে বিখ্যাত কী ?

—ভেনাস্ ডি মিলো !

—লে হালুয়া ! মোনালিজা নয় ?

অগুস্ত্ গৌজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জবাব দেয় না। এখন
ওকে ওক-চারার মতো দেখাচ্ছে না, যেন বুনো ঘোড়া।

—বেশ বাপ্, তাই সহি। সেই 'ভেনাস্ ডি-মিলো'-কে
মন থেকে আঁকতে পারিস্ ?

অগুস্ত্ জবাব দেয় না। হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাগজটার
ওপর। লেকক্ অন্যান্য ছাত্রদের কাজ তদারকিতে রৌদ দিতে
গেল। বেশ কয়েক চক্রর পাক মেরে ফিরে এসে বলে, কই
কী-এঁকেছিস্ দেখি ?

—আমার ছবি এখনও শেষ হয় নি মেণ্ৰ !

—বটেই তো ! 'ভেনাস্' কোনদিন শেষ হয় না। কই
দেখি, কন্দ্রের খোঁড়িয়েছিস্ ?

কাগজখানা কেড়ে নিয়ে অনেকক্ষণ কী-যেন দেখে ফেরত
দিল। অগুস্ত্ নিজে থেকেই বলে, বিশেষ জুং করতে
পারিনি। আসল ভেনাস্ অনেক বেশি সুন্দরী।

—বটে ? কিন্তু আসল ভেনাস্ কোন্টা মেণ্ৰ ?

'মেণ্ৰ' সম্বন্ধে অগুস্ত্ ঘাবড়ে যায়। শব্দটার অর্থ—'স্যার',
তার চেয়েও বড়, আচার্য। শিপ্পাচার্যের সম্বন্ধে—'মাস্টার
আট্ট্রিয়াম্'-এর সংক্ষিপ্তসার। ভয়ে ভয়ে বলে, যেটা লুভারে
আছে।

—আজ্ঞে না মেণ্ৰ ! সেটাও ঠুঁটো জগন্নাথনী ! আসল
ভেনাস থাকে এইখানে—

কোথাও কিছু নেই বেমক্কা ওর পাঁজরে একটা খোঁচা মেরে
বলেন, কিছু বুঝিলি ?

অগুস্ত্ ঘাড়ের পেণ্ডুলাম। ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড়টা দোলায়।

—তাহলে সোজা কথাটা সরল ফ্রেণ্ড বলি—শোন।

তোকে আমার খোঁয়াড়ে ভীত করে নিলুম। আজ থেকে

অগুস্ত্ রোদ্যা হয়ে গেল ওরাস্ লেকক্ দ্য বোয়াবোদ্রান-এর
ছাত্র ! পোতি-একালে আজ তুই নাড়া বাঁধিলি ! এবার কিছু
বুঝিলি ?

শিপ্পী হিসাবে লেকক্ যে খুব একটা নাম করেছেন তা
নয় ; কিন্তু শিপ্পশিক্ষক হিসাবে তিনি প্রতিভাশালী।
তদানীন্তন পারীর অনেক নামকরা শিপ্পী তাঁকে গুরু বলে
মানতেন। অথচ সে আমলে পারী-শিপ্পের যে মৌল ধারা,
ব্যো-আর্ৎ-এ যে ধারায় শিক্ষা দেওয়া হত, সালোঁ যে ধারাকে
মেনে চলত, তার সঙ্গে লেকক্-পদ্ধতির ফারাক আসমান-
জমীন। রোদ্যার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বীজটি লেকক্ই প্রথম উপ্ত
করেছিলেন—একথা বললেও অত্যাঙ্ক হবে না। ব্যো-আর্ৎ-এ
জোর দেওয়া হত দেখে দেখে কপি করার দিকে। বিখ্যাত
ক্লাসিকাল চিত্রের কপি বানানো হচ্ছে শিপ্পশিক্ষার প্রথম
পাঠ। অথচ লেকক্ হচ্ছেন ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। কপি
করা বারণ। নেহাৎ যদি কপি করতে চাও, তবে তা করতে
পার—ভিন্ন মাধ্যমে, ভিন্ন মাত্রায়। অর্থাৎ দাভিদ-এর ছবি
দেখে ছবি আঁকতে পারবে না, ইচ্ছা করলে দাভিদ-এর কোন
ফিগরকে দেখে মূর্তি বানাতে পার ; দ্বিমাত্রিক থেকে দ্বিমাত্রিকে
উত্তরণ। অথবা ডিস্কোবোলস্ কিম্বা লাকুন-গ্রুপ দেখে
দেখে ছবি আঁকতে পার, মূর্তি গড়তে নয় ; সেটা তেতলা থেকে
দো-তলায় অবরোহণ। উনি জোর দিতেন স্মৃতি-নির্ভর শিপ্পে।
মনের পটে আঁকতে হবে ছবিটা, হাতকে কার্যকরী করার
আগে। প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়ন ভরে দেখে নাও, খাতায় নোটও
রাখতে পার—কোথায় সিপিয়া, কোথায় কোবার্ট ব্লু, কোন
বিন্দুতে ভার্মিলিয়ান-এর ছোঁওয়া। তারপর ছবি আঁকবে
স্টুডিও-তে ফিরে এসে, স্মৃতিনির্ভর। অর্থাৎ : তখনও
ইম্প্রেশানিস্ট স্কুল স্বীকৃতি পায়নি। তাঁর কয়েকটি উপদেশ
রোদ্যা সারাজীবন মনে রেখেছিলেন, নিজের শিষ্যদলকে
বলতেন সেসব কথা, পরিণত বয়সে। যেমন, একদিন
লেকক্ বললেন, অগুস্ত্ তোরা এই সে'ন নদীর দৃশ্যটা এমন
বেজুতের হল কেন, রে ? কাগজের এদিকে এতটা ভীড়, ও
দিকটা ফাঁকা ?

কিশোর শিপ্পী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, আমি কী করব ?
ওরা কি আমাকে জিগোস করে ভীড় জমিয়েছে ? যা দেখছি
তাই তো আঁকব ?

—না! যা দেখাবি তা নয়। নয়ন মেলে দেখবার সময় অস্তরে যে অনুভূতিটা হবে সেটাকেই আঁকবি। চোখ দিয়ে দেখে হাত দিয়ে আঁকে ড্রাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান, নকশাবিশ! শিল্পী দেখে হৃদয় দিয়ে, আঁকে মস্তিষ্ক দিয়ে!

অগুস্ত্ তর্ক করছিল, তার মানে ল্যাণ্ড-স্কেপ পেইন্টিং-এ, যা দেখব তা আঁকব না?

—নিশ্চয় না; যা আঁকলে ছবিটা রসোত্তীর্ণ হবে শুধু সেটুকুই আঁকবি।

—এটা খোদার ওপর খোদাগিরি হবে না কি, মেৎস?

—না, হবে না। বাগানে যখন ফুল ফোটে তখন তারা নিয়ম মেনে ফোটে না। চরম অসামঞ্জস্যের ভিতরেই ঈশ্বর পরম সামঞ্জস্যের বিধান করেন। কিন্তু আমার ক্যানভাসের ফুলদানিটা যে ছোট! তাই ফুল তুলে এনে যখন সাজাই তখন পদ্মটিকে দিই মাঝখানে, দুপাশে জেরিনিয়াম আর এ্যাস্টর! এভাবে বিন্দুতে সিন্দুক ধরবার প্রয়াসই হচ্ছে শিল্প!

ওঁর আর একটা বাঁধা বুলি ছিল, “এই যে ক্লাসে চার্লসটা ছাত্র আছে না, পরে হিসাব মিলিয়ে দেখিস্ এর তিন কি চারটি টিকে থাকবে, বাদবাকি সবাই একে একে খসে পড়বে। তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে—হবে কেরানী, অফিসার, সেনেটর! হবে রোজগারে। আর ঐ তিন-কি-চারটির মধ্যে একজনই হবে শিল্পী—মাথায় পরবে কাঁটার মুকুট!”

—কিন্তু কথটা তিনি এমন কায়দায় বলতেন যাতে প্রতিটি শিষ্য ভাবতো কাঁটার মুকুটটা শিরোধার্য করার সৌভাগ্য বুঝি একা তারই।

মাস ছয়েক পরে স্কুল ছুটির সময় লেকক্ ওদের ক্লাসে এসে বললেন, অগুস্ত্ কাল সকাল নটার ক্লাসে তুমি আসবে।

মাস্টারমশাই বরাবর ‘তুই-তোকারি’ করেন, হঠাৎ এই ‘তুমি’ সম্বোধনে একটু ঘাবড়ে যায় অগুস্ত্। বলে, কাল তো শুব্বার মেৎস। আমাদের ছুটি।

লেকক্ বানু’ভ্যাকে বললেন, তুমি ওকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিও।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করতই সহপাঠীরা ওকে ছঁাকাবান করে ঘিরে ধরে।

—শালার কী বরাং মাইরি! ছ’মাসের মধ্যেই প্রমোশন।

—প্রমোশন? প্রমোশন কিসের?

—কেন, তুই জানিস না শুব্বারবার সকালে এখানে কী জাতের চণ্ডীপাঠ হয়?

—না। কী?

—ন্যুড স্টাডি রে রামছাগল! মার্বেল নয়, ক্যানভাস নয়, জ্যাস্ত ন্যুড।

‘রামছাগল’ উপাধিটাও কি-জানি-কী-করে ঘর থেকে স্কুলে পৌঁছে গেছে।

কে একজন বলে, তুই এমন নার্ভাস হয়ে গেলি কেন রে রামছাগল? কী ভাবছিছ?

দুবোয়া ওদের ক্লাসে মুখফোঁড়। বড়লোকের ছেলে। সখ করে ছবি আঁকা শিখতে এসেছে। একটা চোখ বন্ধ করে বলে, পোয়াতি মাগীরা যা ভাবে, ছেলে না মেয়ে?

হো হো করে হেসে ওঠে ক্লাসসুদ্ধ সবাই।

বানু’ভ্যা বয়সে সবচেয়ে বড়—সর্দার পোড়ো। গম্ভীরভাবে বলে, তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেইরে অগুস্ত্। হুন্দো কোনও জোয়ান মিন্‌সের ন্যাংটো-স্কেচ আঁকতে হবে না তোকে। কাল মডেল হচ্ছে মাদুমোয়াজেল লিজা!

দুবোয়া বলে, ঈস্! আমরা চান্স পেলুম না! কিন্তু তুই কী করে জানলি?

—শর্মাকে সব খবর রাখতে হয়, বুঝালি?



পরদিন যথাসময়েই হাজির হয়েছিল অগুস্ত্ স্কেচখাতা বগলে। কিন্তু বেচারি জানত না এ-ক্লাসে এমন ভীড় হয়। সাড়ে আটটার আগেই উৎসাহী শিক্ষার্থীর দল ভাল ভাল জায়গা বেছে নিয়ে বসে আছে, খাতা পেন্সিল বা রং-তুলি বাগিয়ে। অগুস্ত্ যখন উপস্থিত হল তখন ঠাঁই

পাওয়াই মুশকিল। তবু জায়গা জুটল, তবে মডেল থেকে অনেকটা দূরে এবং একেবারে ব্যাক-ভ্যু। মেয়েটি—না মেয়েটি বলা ঠিক নয়, মহিলাটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ। পিছন থেকে বয়স আন্দাজ করা শক্ত। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। স্বাস্থ্যবতী, মাথার চুলগুলো এলো-থোপা করে বাঁধা, ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। আর চুলের রঙ কুচকুচে কালো! এক নজর চোখ তুলেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল অগুস্ত্। ঐ চুলের জন্যেই। হঠাৎ বড়দিকে মনে পড়ে গেছে তার। বড়দি ছিল ব্রুনেট।

অনেকক্ষণ মডেলের দিকে তাকাতে পারল না। তারপর

সাহস সগুণ করে তাকিয়ে দেখল আবার। সম্পূর্ণ নিরাবরণ।
একটি নারী মূর্তি—তা হোক না কেন পশ্চাৎ দৃশ্য—সে জীবনে
এই প্রথম দেখছে। পনের বছর বয়সে। সহশিক্ষার্থীদের
ওপর চোখ বুলিয়ে দেখল একবার; সকলেই যে যার কাজে
ব্যস্ত। তারা ওকে লক্ষ্য করছে না আদৌ। কিন্তু কিছুতেই
কাজ শুরু করতে পারছিল না অগুস্ত্। হঠাৎ লেকক্ এসে ওর
পাশটিতে বসলেন। ওর হাত থেকে ক্রেয়নটা তুলে নিয়ে
একটা হাল্কা খাড়া রেখা টানলেন কাগজে। বললেন, এটা
ধর মেরুদণ্ড রেখা। এইটা মাথার শির্ষাবিন্দু আর নিচে এটা
পেডেস্টাল-এর ভূ-রেখা। এবার নিতম্ব থেকে শুরু কর।
প্রায় মাঝামাঝি।

মিনিট পাঁচেকের ভিতরেই অস্বস্তিটা দূর হল। এবার ঐ
নিষ্পন্দ মডেলকে ওর মনে হচ্ছে একটা মর্মর মূর্তি। ও যেন
ভার্সাই প্রাসাদের বাগানে বসে একটি ন্যুড মার্বেলমূর্তিকে
পিছন থেকে কপি করছে।

ফেরার পথে ও বল্ল, বানু'ভ্যা, আমার এই ছবিখানা
তোমার কাছেই থাক। বাবা দেখতে পেলে আমার পিঠে
আন্ত চ্যালাকাঠ ভাঙবে।

বানু'ভ্যা বলে, রামছাগল নয় তুই একটা ভীতুর ডিম!

কিন্তু এত করেও ব্যাপারটা গোপন করা গেল না। বাড়ি
ফিরতেই মেরী ওকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, কই ছবিটা
দেখি?

—ছবি? কিসের ছবি?

—ন্যাকামি করাবি না অগুস্ত্! আমি সব জানি। তোদের
তো ন্যুড-ক্লাস ছিল আজকে। কই দে!

—এই ছোড়দি! বাবাকে বলবি না কিন্তু!

—বলব না, যদি তুই নিষ্কথায় ছবিটা বার করে দিস।

—আমি সত্যিই আঁকিনি রে কিছু—

ডহা মিথ্যে কথা বল্ল অগুস্ত্।

—আঁকস্নি? ঝাড়া একঘণ্টা ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে
ছিলিস্?

কান দুটো লাল হয়ে ওঠে অগুস্ত্-এর। বলে, তুই না...তুই
একটা যাচ্ছেতাই!

তিনদিনের মাথায় আবার আক্রমণ। ভাইয়ের হাত ধরে
হিড় হিড় করে টেনে আনল আড়ালে। বললে, বাবা যা বলে
না, তুই ঠিক তাই! রামছাগল!

—কেন? কী করেছে আমি?

—পিছন দিকে গিয়ে বসেছিল কেন রে হতভাগা?
লজ্জা করছিল? এতে লজ্জার কিছু নেই, বুঝলি? সব
আর্টিস্টকেই ন্যুড আঁকতে হয়। তুই মস্ত আর্টিস্ট হবি!
লজ্জা কিসের? নে ধর।

ছবিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে একটা বাহুল্য প্রশ্ন করল
অগুস্ত্, তুই এটা কোথেকে পেলি!

মেরী দ্বিতীয় একখানা ছবি বাড়িয়ে ধরে সে বাহুল্য-প্রশ্নের
জবাব দিল, এই দ্যাখ! বানু'ভ্যা এঁকেছে সামনে থেকে।
সরাসরি টেম্পারায়।

সম্মুখদৃশ্যটি দেখে অগুস্ত্ বুঝতে পারে মহিলার বয়স
অত্যন্ত পরিশ্রম। নামে কুমারীষের ছোঁয়া থাকলেও সে নিশ্চয়
একাধিক সন্তানের জননী। শুনহয় শ্রোকনম্র এবং শুনবৃত্ত
বিস্ফারিত। বয়সকালে নিশ্চয়ই আরও সুন্দরী ছিল।

—এ কে জানিস্? মাদুমোয়াজেল লিজা!

—তুই নামটাও জানিস্?

—হ্যাঁ, বানু'ভ্যা বলেছে। বয়সকালে ও ছিল কামিল
কোরোর বাঁধা মডেল। পারীর নামকরা ডেমি-মণ্ডেন। অনেক
বড় বড় আর্টিস্ট-এর সঙ্গে এককালে ওর দহরম্-মহরম্ ছিল।
দারুণ আর্ট বোঝে।

অগুস্ত্ ততক্ষণে দুখানি ছবি পাশাপাশি ধরে পরীক্ষা
করিছিল। মেরী বলে, কী দেখাছিস? তুলনামূলকভাবে
তোর স্কেচটা অনেক ভালো উৎরেছে।

—কেন?

—তোর স্কেচটা দেখলে একটা কোঁতুহল থাকে। দর্শক
অনেক কিছু কম্পনায় দেখতে পায়। অথচ বানু'ভ্যার ছবিটা
যেন পোড়া দেশলাই কাঠ। বারুদ যেটুকু ছিল, জলে
নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ছোড়দিটা দারুণ কথা বলে কিন্তু!

আরও বছরখানেক পরে লেকক্ ওকে ছবি দেখে ছবি
আঁকার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তার আগেই শুনিয়ে দিলেন
সাবধানবাণী—ওল্ড-মাস্টার্সরা হচ্ছেন সিঁড়ির ধাপ। থাপন-
জুড়ে বসে পড়ার জন্য নয়, ডিঙিয়ে যাবার জন্য।

অগুস্ত্ দিনে দশ বারো ঘণ্টা ছবি আঁকে। ল্যাভরে কাটিয়ে
আসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, লেঅনার্দোর 'ম্যাডোনা অব দ্য রক্স',

রাফায়েল-এর 'লা বেলা জার্দিনেয়া', তিজিয়ানো, করোজ্জিও ডুয়ার, দাভিদ, দেলাক্রোয়ে। লেকক্-এর ব্যবস্থাপনায় ঐ সঙ্গে 'কলেজ দ্য ফ্রান্সে' সাহিত্য, ইতিহাস বিশেষ করে দান্তে পাঠের সুযোগ হল। তারপর ও ঠেকে গেল একটা অভাবনীয় ব্যাপারে। পেনসিল-ক্রেয়ন ছেড়ে এবার ওর রঙ-তুলি ধরার সময় হয়েছে। কিন্তু সেগুলি মহার্ঘ। মেরী যে বেবি-সিটিং-এর কাজটা করত সেটা হাতছাড়া হওয়াতেই হয়েছে প্রচণ্ড অসুবিধা। লেকক্ বললেন, স্কুলের মাহিনাটা না হয় আপাতত বাকি পড়বে, কিন্তু রং-তুলি-ক্যানভাস...

অগুস্ত্ বলে, তার চেয়ে এক কাজ করি মেংর। ছবি ছেড়ে আমি ভাস্কর্য ধরি!

লেকক্ হেসে বলেন, তুই যে শেষ পর্যন্ত একথা বলবি তা আমার জানাই ছিল। প্রথম দিনই তুই তাই বলেছিলি ল্যুভারে সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য ভেনাস ডি-মিলো। কিন্তু তোর ধারণায় কি ক্যানভাস-এর চেয়ে মার্বেল সস্তা?

—মার্বেল কেন মেংর? স্রেফ কাদা মাটির তো অভাব হবে না।

অগত্যা তাই। চিত্রকর নয়, অগুস্ত্ রোদ্যা হবে ভাস্কর; আপাতত মৃৎশিল্পী।

মেরী তো উজ্জ্বলিত। বলে, আমারও তাই স্বপ্ন! দাভিদ, দেলাক্রোয়ে নয়; তুই হবি ফিডিয়াস্-প্র্যাক্সিটেলস্-মিকেলাঞ্জেলো।

কথা হচ্ছিল নৈশ আহারের টেবিলে। পাপা রোদ্যা মাংসের টুকরোটা দ্বিখণ্ডিত করতে করতে বলে, ব্যাপারটা কি? খাবার টেবিলে গ্রীক দার্শনিকরা কেন?

মেরী বলে, দার্শনিক নয় পাপা, এঁরা সব প্রখ্যাত ভাস্কর।

—ভাস্কর! স্টোন-কাটার? কিন্তু তাঁরাই বা কেন?

অগুস্ত্ গভীর হয়ে বলে, তোমাকে বলা হয়নি। আমি আমার সিদ্ধান্তটা পাল্টেছি পাপা। চিত্রকর নয়, আমি হতে চলেছি ভাস্কর।

পাপা রোদ্যা ইতিমধ্যে মাংসের টুকরোটা মুখবিবরে ফেলে দিয়েছে। একথায় তার চর্চনকার্য বন্ধ হল। বললে, অ। সে-ক্ষেত্রে, তোমাকেও বলা হয়নি। আমিও আমার সিদ্ধান্তটা পাল্টেছি অগুস্ত্। রাম-ছাগল নয়, তুমি একটি বন্ধ উন্মাদ!

এ-কথা বলার হক্ আছে পাপা রোদ্যার। যে-আমলের

কথা তখন ভাস্কর্য ছিল একটি অবহেলিত শিল্প। সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ফরাসী ভাস্কর আতোইন লুই বারীর কথাই ধর না কেন। জীবজন্তুর ভাস্কর্যে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। অথচ তাঁর বাজার নেই। অন্ন-সংস্থান হয় না দেখে ফরাসী সরকার শেষ পর্যন্ত সরকারী দপ্তরে একটা নতুন পদ সৃষ্টি করলেন: প্রফেসর অব্ জুয়োলজিকাল ড্রইং। তাঁকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত করে বৃদ্ধ শিল্পীর সংসারযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা হল। অগুস্ত্ পরে তাঁর কাছেও শিক্ষানবিশী করেছিল।

রেনেসাঁযুগ থেকে ভাস্কর্য ছিল স্থাপত্যের সহোদর। প্রাসাদ, গীর্জা, সমাধি-মন্দির সর্বত্রই ভাস্কর্যের কদর। স্থপতি নির্দেশ দিতেন সৌধের কোন্ অংশে বসবে ফুল-লতাপাতা, কোথায় গারগয়েল, ক্যারিয়াটিড, কোরিঙ্কিয়ান পুস্পগুচ্ছ অথবা আয়নিক ভলুট। ভাস্করদল সৌধকে বিকশিত করতেন বিচিত্র ভাস্কর্যে। সৌধ সে আমলে উঠত না, ফুটতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের নতুন যুগের খ্যাতি হাওয়ার রাতারাতি সব বদলে গেল। অলঙ্করণ আর চায় না খন্দের। কেয়ূর-কঙ্কন-চন্দ্রহার, বেনারসী-চীনাংশুক-সাঁচ্চা-জরির ওড়নায় আর মন ভরে না; ওরা চায় নিরাভরণ ন্যুড! সহজ সরল রেখা! 'স্ট্রীম-লাইন্ড'—ফ্যাক্টরির ঐ চোঙটার চঙে। ফলে ভাস্কর্যের বাজারে রীতিমতো মন্দা। এমতাবস্থায় যদি কোন ষোড়শবর্ষীয় তরুণ বলে বসে যে, সে ভাস্কর হতে চায়, তবে তাকে আর 'রামছাগল' উপাধিতে বিভূষিত করা চলে না; সে বন্ধ উন্মাদ!



এরপর 1857-58 সালে অগুস্ত্-রোদ্যার জীবনে পর পর দুটি ঘটনা ঘটে, যার কার্য-কারণ সম্পর্কের বিষয়ে ইতিহাস নীরব। ঘটনা দুটি এমন জাতের যে, জীবনীকারেরা প্রথিতযশা শিল্পীকে পরবর্তীকালে খোলা-খুলি প্রশ্নও করতে পারেননি। আপনারা যদি অনুমতি করেন এবং কথাসাহিত্যিকের প্রত্যাশিত ছাড়পত্রটা মঞ্জুর করেন, তাহলে কম্পনার জাল বিস্তার করতে পারি। কিন্তু তার পূর্বে স্থূল তথ্য দুটি—যতদূর জীবনীকারেরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন—পেশ করি।

এক নম্বর: অগুস্ত্ রোদ্যা পর পর তিনবার বো-আর্ৎ-এ পুবেশিকা পরীক্ষায় বসেন, এবং ব্যর্থ হন। হেতু হিসাবে গবেষকদল দু-জাতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন,

পরীক্ষক ছিলেন লেকক্-এর বিরুদ্ধবাদী শিল্পী। তাই লেকক্-এর পিতৃশিষ্যকে পরিত্যাগের মধ্যে বৈরী নির্ধাতনের তীক্ষ্ণ কৃপা লাভ করেছেন। কেউ বলেছেন, এটা নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা, যেমন আইনস্টাইনের স্কুলশিক্ষক ক্লাস-রিপোর্টে লিখেছিলেন—‘এ ছেলে অক্ষ ছাড়া সব কিছুতেই সঠিকমুঠি ভাল। শুধু অঙ্ক ও ভীষণ কাঁচা!’

দ্বিতীয় তথ্য: ঐ সময়ে, অর্থাৎ সতের আঠারো বছর বয়সে, রোদ্যা একটি পতিতালয়ে গমন করেন। কীসের আকর্ষণে অথবা কীসের বিকর্ষণে জানা যায় না। তবে এটুকু জানা গেছে, জনপদবধূটি ছিলেন বয়সে প্রায় ঠাঁর দ্বিগুণ। রোদ্যার বিস্তারিত জীবনী লেখক ডেভিড উইস্-এর মতে অগুস্ত্ সেখানে গিয়েছিলেন বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে। তাঁর জীবনীভিত্তিক উপন্যাস “নেকেড কেমন আই”-তে তিনি সভ্যবৈ কাম্পনায় ঘটনা সাজিয়েছেন। ফুটি করতে বানু’ভ্যার নতুন রোদ্যা একরাতে ওপাড়ায় গিয়েছিলেন। সেটা আবার আমার পছন্দ হয়নি। এবার তাহলে আমাকে আমার মতো করে ঘটনা সাজাতে দিন—

অগুস্ত্ যখন চোখে অন্ধকার দেখছে—পেতি একোলে টিকে থাকাই দায়—তখনই শোনা গেল একটা আনন্দ সংবাদ। ফুই নেপলিয়’ ঘোষণা করলেন, অতঃপর শুধুমাত্র প্রতিভার বিচারে সরকারী শিক্ষায়তন ব্যো-আর্ৎ-এ ছাত্র ভর্তি করা হবে। এবং তারা স্কলারশিপ পাবে, যাতে রঙ-তুলি-ক্যানভাসের অভাবে তাদের শিল্পপ্রচেষ্টা ব্যাহত না হয়। ফরাসীদের শিল্পপ্রিয়তা কিংবদন্তীর পর্যায়ে। ব্যো-আর্ৎ এবং সার্লো তার যুগল কেন্দ্রবিন্দু। ফলে এভাবেই জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা করলেন নবীন রাষ্ট্রপতি।

অগুস্ত্ উঠে পড়ে লাগল ব্যো-আর্ৎ-এ ভর্তি হবার জন্য। মুরুরি বলতে একমাত্র ওরাস লেকক্; কিন্তু তিনি সুপারিশ করলে হিতে বিপরীত হবে। কারণ ব্যো-আর্ৎ-এর ধারণায় লেকক্ তাদের জাতশত্রু। বিশেষ করে বৃদ্ধ শিল্পী থিয়োডোর দুমা-র চোখে;—যিনি প্রধান নির্বাচক।

প্রথম দফায় পেতি একোল থেকে লেকক্-এর বাছা-বাছা পাঁচজন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়; তার মধ্যে পাশ করে মাত্র একজন, বানু’ভ্যা। কারণ ছিল; সে জ্বর মুরুরি পাকড়াও করেছিল। কম্প্ৎ-দ্য লোরেন; যিনি দুমার পেট্রন। অগুস্ত্ পাশ করতে পারল না। দোষটা তার নিজের, না

ভাগ্যের, সেটাও ঠাণ্ডা হল না।

সেবার পরীক্ষার্থীদের আঁকতে দেওয়া হয়েছিল একাটি মেল ন্যুড। ন্যুড ঠিক নয়, জাঙিয়া পরে সে বসে ছিল বিচিত্র ভঙ্গিমায়। ভঙ্গিটা দেখেই চমকে উঠেছিল অগুস্ত্। এ ভঙ্গিমা তার অতি পরিচিত: পুগিলিস—মুষ্টিযোদ্ধা। হেলেনিস্টিক-যুগের একটি প্রখ্যাত ভাস্কর্য। গ্ল্যাডিয়েটার এরিনায় বসে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে উচ্চ-আসনে সমবেত ঘরানা-ঘরের রোমান-সুন্দরীদের, যারা দেখতে এসেছে কীভাবে ও প্রতিপক্ষকে রক্ত-স্নান করাবে অথবা রক্তস্নাত হয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাবে। অগুস্ত্ নিপুণ-হাতে স্কেচটি শেষ করে দাখিল করল। সে নিঃসন্দেহ যে, তার ছবিটা শিল্প-হিসাবে দারুণ উৎরেছে।



চিত্র-২ : Pugilis—মুষ্টিযোদ্ধা,
গ্ল্যাডিয়েটার—হেলেনিস্টিক শৈলী

লিখিত পরীক্ষার পর ‘ভাইভা’। মৌখিক পরীক্ষা। প্রবেশার্থী শিল্পের ইতিহাস ও মর্মকথা কতটা জানে তার যাচাই হবে। পরীক্ষার্থীরা স্কুলের মাঠে অপেক্ষা করছে। ডাক পড়লে একে একে যাচ্ছে মৌখিক পরীক্ষা দিতে। বানু’ভ্যা মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এল নাচতে নাচতে। অগুস্ত্কে কানে কানে বললে, কিল্লা ফতে!

—কী জিজ্ঞেস করল তোমাকে?

—নাম আর বয়স। ব্যস্, আর কিছু না!

—সে কি! আর সবাইকে তো নাতানাবুদ করে ছাড়ছে।

—শর্মা যে তার আগেই রুমাত্রটি ছেড়ে বসে আছে।

স্বয়ং কম্পং দ্য লোরেন-এর সুপারিশপত্র। বুড়োটা আমাকে প্রশ্ন করবে কী, কাঁচুমাচু হয়ে বললে, কম্পংকে ব'ল, দুমা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শালাহ্! বুড়ো ভাম! নাচতে নাচতেই বেরিয়ে গেল বানু'ভ্যা, সবাইকে খবরটা জানাতে।

অগুস্ত্-এর যখন ডাক পড়ল তখন পরন্তু বিকেল। পথ-প্রদর্শক পর্দাটা তুলে ধরে ভিতরে যেতে বলল। অগুস্ত্ কক্ষে প্রবেশ করে দেখে, সেটি একটি প্রকাণ্ড হল-কামরা। এক পাশে ক্লাস হচ্ছে। একটি মহিলা আধশোয়া অবস্থায় সিটিং দিচ্ছেন। তাঁর পরিধানে ঢিলে-ঢালা গ্রীক পোষাক। ছেলেরা চারিদিকে ঘিরে তাঁর স্বেচ করছে। এরা সবাই ব্যো-আর্ৎ-এর ছাত্র। সামনে এ-প্রান্তে একটি টেবিলের একদিকে বসে আছেন তিনজন পরীক্ষক। অপরাদিকে একটি শূন্যগর্ভ চেয়ার।

অনুমতি পেয়ে অগুস্ত্ আসন গ্রহণ করে, আড়চোখে ও-পাশের মহিলাটিকে আর এক-নজর দেখে নেয়। ওর মনে হল—এঁকে আগে কোথাও দেখেছে। ঠিক কোথায় তা মনে পড়ল না। পরীক্ষকদের মধ্যমাণ প্রশ্ন করলেন, মসুয়ে রোদ্যা, আপনি এতদিন কার কাছে শিক্ষানবিশী করছিলেন? উপায় নেই। নামটা জানাতে হল। একটা কুর হাসি ফুটে উঠল দুমার অধরপ্রান্তে। ওর পরীক্ষাপত্রের ছবিখানি মেলে ধরে বলেন, মসুয়ে রোদ্যা, আপনি মডেলের দাড়ি-গোঁফ এঁকেছেন কেন? মডেল তো ছিল নিপাট কামানো?

অগুস্ত্ বললে, স্যার, আমি মডেলের হুবহু অনুকরণ করিনি। ওর ভঙ্গিমায় যে ক্লাসিকাল আবেদনটা আছে তা হেলেনিস্টিক্; তাই...

—কী করে বুঝলেন হেলেনিস্টিক্? হেলেনিক্ নয় কেন? অথবা রোমান?

—যে ভঙ্গিমায় মডেলকে বসানো হয়েছিল, মায় তার দুহাতের দস্তানা—তা একটি প্রখ্যাত হেলেনিস্টিক্ শিল্পের ঐতিহ্যবাহী: 'পুর্গালিস্'। তার অরিজিনাল ব্রোঞ্জটা আছে রোম-এ, তাম্বে সংগ্রহশালায়; একটি কাস্ট্ আছে পারীতে—বিব্লিওতেক্ নাসিওনাল-এর দ্বিতলে—বস্তুত সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এ। তাই ঐ মডেলের চুল আঁচড়ানোর কায়দা...

দুমার পাশে যে পরীক্ষক ছিলেন তিনি ওকে মাঝপথে থামিয়ে বলে ওঠেন, মাদমোয়াজেল লিজা বর্তমানে যে ভঙ্গিমায় অর্ধশয়ান সেটা কি আপনার পরিচিত? কোনও বিখ্যাত

চিত্রের কথা কি আপনার মনে পড়ছে?

অগুস্ত্ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। মাদমোয়াজেল লিজা একচুল নড়ল না। কিন্তু তার চোখের দুটি পাতা একবার পড়ল। যেন শুধুমাত্র অর্ধ-পল্লবে 'বাও' করল। অগুস্ত্ এতক্ষণে তাকে চিনতে পারে। প্রশ্নের জবাবে সে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ। এ ভঙ্গিমাটি দেখে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে জাক লুই দাভিড্-এর বিখ্যাত চিত্র: 'মাদাম রেকেমোয়া'-কে।

এ পর্যন্ত যেটুকু বলেছে তাতে ভাইভায় ওর দশে দশ পাওয়ার কথা। কিন্তু দুমা যে কিছুতেই ভুলতে পারছেন না—এ ছোকরা লেকক্-এর ছাত্র। তাই বলে ওঠেন, কিন্তু পোট্রেট পেইন্টার কি এতটা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে? ভল্‌তেয়ারের তোবড়ানো গণ্ডে লেঅনার্ডের বভভো দাড়ি!

ওপাশের ছাত্রদলের দিক থেকে ভেসে এল একটা মৃদু হাস্যগুঞ্জন। ওরা প্রবেশার্থীর লাঞ্ছনাটা উপভোগ করছে। হাতের কাজ বন্ধ হয়েছে তাদের। অগুস্ত্-এর মনে হল লেকক্-এর ক্লাসে এটা ঘটলে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন। সে নিজেকে সংযত করে বললে, স্যার, প্রশ্নে আমাকে পোট্রেট আঁকতে বলা হয়নি; বলা হয়েছে স্বেচ আঁকতে। 'স্বেচ' হচ্ছে কয়েকটি আঁচড়ে একটি আইডিয়াল প্রকাশ। এখানে যেহেতু সেই আইডিয়াটা হচ্ছে হেলেনিস্টিক্ গ্ল্যাডিয়েটোরের, তাই ভেবেছিলাম গ্রীকরীতিতেই ওকে ঠিক মানাবে।

দুমা বলেন, আমাকে যদি বলা হয় আপনার একটি স্বেচ আঁকতে এবং আমার যদি মনে হয় মসুয়ে রোদ্যার মাথায় একজোড়া শিং ঠিক মানাবে, তাহলে আমি তা আঁকতে পারি?

এবার ছাত্রদল উদ্দাম হাস্যরোলে ফেটে পড়ে। যেন দারুণ একটা রসিকতা করেছেন, দুমা ছাত্রদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কাজ কর। আমাদের এসব এ্যাকাডেমিক শিল্পচর্চায় কান দিও না। আর ভাল কথা—মাদমোয়াজেল লিজার মাথায় শিং এঁকো না যেন।

মেদিনীনিবন্ধদৃষ্টিতে অগুস্ত্ নিশ্চুপ বসে থাকে। তার কান দুটো লাল হয়ে ওঠে।

—কি হল? জবাব দিন মসুয়ে রোদ্যা।

—জবাব শুনতে চান আপনি?

—না হলে প্রশ্ন করেছি কেন?

অগুস্ত্ স্পর্ষভাষে বললে, আপনার যদি মিকেলাঞ্জেলোর

মতো দিব্যদৃষ্টি থাকে, এবং আমার মধ্যে যদি আপনি মোজেস্-এর প্রজ্ঞা দেখতে পেয়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় একজোড়া শিং আপনি আঁকতে পারেন স্যার।

দুমার চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠল। বললেন, আপনি যেতে পারেন।

সেই প্রথম বার।

দ্বিতীয় দফায় ওর মডেল ছিল রোমকসজ্জায় সজ্জিত একজন সৈনিক। অগুস্ত্‌ এবার হুবহু নকল করল। চুলোয় যাক লেকক্-এর নির্দেশ : হৃদয় দিয়ে দেখা আর মস্তিষ্ক দিয়ে আঁকা। চর্মচক্ষে যা দেখল, নকশানবিশের মত নকল করে গেল। মায় মডেলের গলায় নেপলিয়ন্ বোনাপার্টের মূর্তি-আঁকা মেডেলটাও। রোমান সৈনিকের গলায়! 'এ্যানাক্রিনজ' আপাতত শিকয়ে তোলা থাক ; ওর লক্ষ্য আজ রসোত্তীর্ণ শিল্প নয়, ব্যো-আর্ৎস্-এ টোকার ছাড়পত্র।

কিন্তু দুমা অচল আল্প্‌স! একতিলও টলানো গেল না। ভাইভায় তিনি বললেন, আমি দুর্গত মসুয়ে রোদ্যা ; হয় আমার দৃষ্টি মিকেলাঞ্জেলোর মত তীক্ষ্ণ নয়, নাহলে মোজেস্-এর প্রজ্ঞা আপনার মাথায় পয়দা হয়নি। শিং-জোড়া এখনও ফুটে বার হয়নি!

তৃতীয়বার। ছ'মাস পরে। এবার ওর মডেল পুরুষ নয়, নারী। পরিচিতা রমনী—মাদমোয়েজেল এলিজাবেথ্‌। জর্জনের ভেনাসের মতো সে শূয়েছে, যদিও চোখ দুটি খোলা—তিজিয়ানোর ভেনাস-এর মতো। নুড নয়, বস্ত্রাবৃত। সমকালীন ফরাসী গাউন।

অগুস্ত্‌ প্রাণপাত করে আঁকল অপূর্ব একটি স্কেচ।

ছবিখানা দাখিল করে আর অপেক্ষা করল না। মনস্কুর করেছে সে। লিখিত পরীক্ষায় নব্বই নম্বর, মৌখিকে দশ। শেষেরটাতে শূন্য পেলেও সে পাশ করবে নিশ্চিত। কিন্তু লেকক্-এর প্রিয় ছাত্রটিকে চাক্ষুষ দেখলে দুমা আবার ঘ্যাচ্-ঘ্যাচ্ করে দেবে। ওর নাম যখন ডাকা হল তখন ও অস্বপ্নগোপন করে আছে বাগানে, একটা এলুম্‌ গাছের আড়ালে। দেখাই যাক কী হয়।

হল না। দুমা নাকি নামেই তাকে সনাক্ত করেছেন। ওর ছবির নিচে স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন : 'তিন বার ফেল মানে পার্মানেন্ট্‌লি ফেল। এই প্রবেশার্থীকে ভবিষ্যতে আর পরীক্ষায় যেন বসতে দেওয়া না হয়।'।

রোদ্যা—৩

খবরটা দিয়ে গেল দুবয় ; ওর সহপাঠী। সে-ও বার বার তিনবারে পাশ করেনি। বোধকার লেকক্-এর প্রিয় ছাত্র হবার অপরাধে।



চিত্র—3 : 'মোজেস্‌', মিকেলাঞ্জেলো-কৃত

একটা প্রচণ্ড অবসাদে দেহমন ভেঙে পড়তে চাইছে। ব্যো-আর্ৎ-এর দরজা ওর মুখের সামনে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। পায়ে পায়ে নেমে এল পথে। বু জাকব ধরে বু দ্য সেন্ত জারমেই। এবার উত্তর-মুখো সেন' নদীর দিকে! দুপাশে মাথাখাড়া পপ্‌লার, তার মাঝখান দিয়ে চওড়া কাঁকরে পথ। ডাইনে এ'গ্যাস্তিৎ দ্য ফঁস ; তার সামনে দাভিদ-এর সাবেক বাড়ি। বর্তমানে সংগ্রহালয়। পস্ত দ্য আর্ৎস ধরে চলে এল সেন' এর উত্তর পারে। সামনেই ল্যুভর। বিশ্বশিল্পের ভ্যাটিকান। কিন্তু সেদিকে নজর গেল না আজ। বসে পড়ে একটা উইলো গাছের তলায়, তৃণশয্যা। ঋতুটা 'ফল'। ভারতবর্ষে এ ঋতু ওভাবে আসে না।

পাতাঝরার দিন। সেন-এর দু-পাশে অসংখ্য পাদপ সে-সন্ধ্যায় অগুস্ত্-এর সমবেদনায় পল্লব-অশ্রু বিসর্জন করছে ক্রমাগত! নগরপালক-নিয়োজিত ঝাড়ুদারনি সেই ঝরা পাতাকে সম্মার্জনীর শাসনে একত্র করছে। যেভাবে এবার ও জড়ো করবে ওর তিন-চার-পাঁচ বছর ধরে আঁকা স্কেচগুলো। বৃথা যাবে না। ফায়ার-প্লেসে ফেলে দিলে শীতের কয়েকটি মুহূর্তে ঘরটাকে তারা উত্তপ্ত করবে। শিম্পের তো তাই লক্ষ্য—শিম্পীর অন্তরের উত্তাপে দরদীকে উত্তপ্ত করা।

—পাদৃ? আপনি কি মসুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যা?

নিজের নামটা কানে যাওয়ায় চমকে উঠে বসে তৃণশয্যা ছেড়ে। দিনের আলো মিলিয়ে এসেছে। আগন্তুকের মুখ আলো-আঁধারে; তার পশ্চাৎপটে পৌঁন্যক্-এর আলোর শতনরী। তবু সেই শিয়ালুয়ে দেখেই তাঁকে চিনতে পারল: মাদমোয়াজেল লিজা।

ফরাসী কায়দায় টুপি খুলে অগুস্ত্ ‘বাও’ করল: শুভ-সন্ধ্যা! —আদৌ নয়। তবে সন্ধ্যাটা যে শুভ নয় এজন্য আপনি দায়ী নন। কিছোটো আপনার মন্দ-ভাগ্য; কিছোটো মসুয়ে লেকক্-এর। আমি সব জানি তো!

জ্ঞান হাসল অগুস্ত্। কীই বা বলার আছে?

লিজা বলে, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করব না। কারণ এ যন্ত্রণায় সান্ত্বনা নেই। আমি শুধু একটি সংবাদ জানাবো বলে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটলাম।

হাত-বটুয়া হাৎড়ে একখণ্ড কাগজ দেখিয়ে বললে, এটা ওদের কাছ থেকে আমি চেয়ে এনেছি।

—কী ওটা?—অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

—মসুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যার স্বাক্ষরিত স্কেচ।

উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে এবার। বোধকরি কান্নাটা চাপতে।

—হাসবেন না মসুয়ে। এই অভাগীর স্কেচ এককালে অনেকেই করেছেন—গেরাড, দোমিয়ে, আঙরে, কোরো, দেলারুয়ে। এঁদের স্বাক্ষরিত স্কেচ আছে আমার সংগ্রহে। সেই এ্যালবামে আজ একটি স্কেচ যুক্ত হবে—রোদ্যার।

হঠাৎ কী-য়েন হল অগুস্ত্-এর। আবেগের বশে মহিলার হাত দুটি ধরে বলে, এর চেয়ে বড় পুরস্কার আমাকে কেউ কখনও দেয়নি।

—তাহলে আমার একটি উপকার করুন?

—উপকার! কী উপকার? নিশ্চয় করব। বলুন?

—আমি থাকি নহুদাম্ আর ওতেল দ্য-ভিল্-এর মাঝামাঝি পস্ লুই ফিলিপ্-এ। এই সাঁঝের বেলায় ও অঞ্চলে মাতালদের বড় দৌরাণ্ড। আমাকে পৌঁছে দেবেন?

—সানন্দে।

অগুস্ত্ চলে আসে ওর পাশে। উনিবিংশ শতাব্দীর ফ্যাশনে বাঁ-হাতে আলতো করে জড়িয়ে ধরে মহিলার মধ্যক্ষাম কটিদেশ। বলে, চলুন মাদমোয়াজেল—

থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ে লিজা। বলে, হল না। পথ-চল্টি সঙ্গিনীকে ‘চলুন’ বলা পারীর শিষ্ঠাচারে মানা। বল, চল; আর ‘মাদমোয়াজেল’ নয়, লিজা।

—তাই হবে লিজা, চল।

—তুমি কি এখন মাথার পিছনে একটা ‘হ্যালো’-র অন্তিষ্ট টের পাচ্ছে?

—‘হ্যালো’! মানে?

—এ্যাঞ্জেলদের মাথার পিছনে যেমন ‘ছটা’ থাকে। একজন ফরাসী কবি বলেছেন, ‘পারীর পথে কোনও সুন্দরীকে যে এস্কট করে নিয়ে যায় সে নিজের মাথার পিছনে একটা ‘হ্যালো’ অনুভব করে।

অগুস্ত্ লজ্জা পায়। জবাব জোগায় না তার মুখে।

লিজা বলে, তোমার নীরবতার কী অর্থ হল জানো?

—না। কী? আমি চাষীর ছেলে, এসব পারীসিন্ ভব্যতার বিশেষ খোঁজ রাখি না।

—নীরবতার অর্থ হল, তুমি মনে মনে বলছ—বিশ বছর আগেকার চিন্তাধারা এই মহিলাটিকে আজও গ্রাস করে আছে। ও ভাবে, ও বুঝি আজও সুন্দরী।

—না, না, তা মোটেই ভাবিছি না আমি। আফ্রোদিভের কখনও বয়স বাড়ে না।

লিজা মিষ্টি হাসল। বলল, এই তো কৃষকভনয় দিবিয়া পারী ভব্যতার বুলি কপ্চাচ্ছেন! কর্ম্মিমেণ্টটির জন্য ধন্যবাদ। বহুদিন এ জাতীয় কথা শুনিনা।

চলতে চলতে অগুস্ত্ প্রশ্ন করে, তুমি দাঁড়িয়ে দেখেছ?

—কেমন করে দেখব? আমার জন্মের আগেই তো তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন ব্রাসেল্‌স্-এ।

—আর মিচেলকে?

—না। এবার কিন্তু আমি প্রশ্ন করব, তুমি জবাব দেবে।

তুমি কখনও ‘ফেমি-ন্যুড’ এঁকেছ?

অগুস্ত মুখ লুকিয়ে হাসে। বলে, জীবনে একবার। তাও পছন্দ থেকে।

—তাই লেকক্-এর শূক্‌বাবের ক্লাসে তোমাকে কখনও দেখিনি। যার ‘ব্যাকভিস্ট’ এংকোছিলে সে কি তোমার প্রণয়িনী? ‘ফ্রন্টাল-ভু’ দিতে রাজি হয়নি?

হু হু করে হেসে ওঠে অগুস্ত। বলে, তোমার প্রথম প্রশ্নটা অবৈধ! আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব...না, আর তাস লুকিয়ে লাভ নেই। আমি তোমারই স্কেচ করেছিলাম লিজা, শূক্‌বাবের ক্লাসে।

—ওহ! তাই নাকি? আমি তো জানি না।

—তুমি কেমন করে জানবে? আমি যে জায়গা পেয়েছিলাম পছন্দ দিকে।

লিজা নীরবে পথ চলে অনেকক্ষণ, ঝরাপাতার কাপেট বহনো পথে। জোড়ায় জোড়ায় পারীসিন পের্মিক যুগল সন্ধ্যাবহারে পথে নেমেছে। অবশ্য তারা এমন অসম-বয়সের নয়। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে লিজা। ওর দিকে ফিরে বলে, পেটম করেছ কখনও?

অগুস্তও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বললে, নুনা।

—কেন? প্রণয়িনী জোন্টোন বলে? সেটাও তো অসম্ভব। তুমি শিল্পী।

—শিল্পী, তাই কী?

—শিল্পী, কারি, চিত্রকরদের প্রতি মেয়ে-মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকেই। তাছাড়া তুমি তো সুন্দর।

—এবার কি আমার বলার পালা : কর্মপ্লগমেন্টটির জন্য ধন্যবাদ?

—না. এবার আমার বলার পালা : আমি থিয়োডোর দুমার সঙ্গে একমত। আমি যদি কখনও তোমার স্কেচ আঁকি তবে মাথায় একজোড়া শিংও আঁকব!

দুমার অট্টহাস্য করে ওঠে অগুস্ত : আমার এতবড় সন্তোষের হেতু?

—সেহেতু তুমি মোজেস্-এর মতো একটি দুর্লভ ব্যতিক্রম। কেউ যা কখনও দেখেনি মোজেস্ তাই চর্মচক্ষে দেখেছিলেন—তবুও আড়ালে আগুন! আর সবাই যা হামেহাল দেখে পর্জিত, আঠারো-বছর-বয়সেও অগুস্ত রোদ্যাঁ তা চর্মচক্ষে চিত্রও দেখেননি—ঝোপের আড়ালে আগুন।

—এর একটু স্পষ্ট করে বলবে?

—না! এখানেই ‘আর্ট’ আর ‘পার্নো’-র সীমানা!

এর জবাবে একটা কথাই বলা চলত; কিন্তু যে মেয়েটি—মহিলাটি—আঙুরে, কোরো, দেলাক্লয়ের মডেল হয়েছে এককালে, মানলাম—দশ-পনের বছর আগে,—সেই প্রফেশনাল ‘ভেম-মন্ডেন’কে এমন একটা কথা কি বলতে পারে অগুস্ত? যার জেব ফাঁকা? যে ব্যো-আর্থ থেকে সদ্য-প্রত্যাখ্যাত?

দূরত্ব সিকি-লীগুও হবে না। পায়ে পায়ে ওরা চলে এল পোঁ লুই ফিলিপে। দ্বিতলবাড়ি। দোতলায় লিজার দু-কামরার এ্যাপার্টমেন্ট। একাই থাকে সে। অগুস্ত সিঁড়ির মুখে ইতস্তত করে। এখন তার কী করণীয়? ডেটিং করলে সঙ্গিনীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তার দোর-গোড়ায় বিদায়-চুম্বন করতে হয়। এক্ষেত্রে সে ডেটিং করছে না আদৌ। মহিলাটির বয়সও তার দ্বিগুণ। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। লিজা বলে, কী হল? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন-আবার? এস, ঘরে এসে বসবে চল। এ্যালবামটা দেখবে না? গেরাড থেকে দ্যমিয়ের স্বাক্ষরিত স্কেচ, যার শেষ সংযোজন—রোদ্যাঁ?

ফলে দ্বিতলে উঠে আসতে হল। চাবি খুলে ওরা ঘরে ঢোকে। ইয়েল লক। ঠেলে দিতেই বুদ্ধ হয়ে গেল দ্বার। ড্রইংরুমে ওকে বসিয়ে লিজা ক্যাবিনেট থেকে দুটি ড্রিংক্‌স্ বানিয়ে আনে। শ্যাম্পেন। নুন-আনুতে-পাস্তা-ফুরানোর সংসারে মানুষ এ জাতীয় পানীয়তে অভ্যস্ত নয়। লিজা বলে, কী সেলিব্রেট করব আমরা এ শুভ সন্ধ্যায়? ব্যো-আর্থ বাস্তিল্ থেকে মসুয়ে রোদ্যাঁর মুস্তিলাভের?

—না! তাঁর সাফল্যের। এ শুভ-সন্ধ্যায় অগুস্ত রোদ্যাঁর স্কেচ আঙুরে-কোরো-দেলাক্লয়ের পংক্তিতে ঠাঁই পেল বলে।

হঠাৎ অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করল লিজা। বলল, ঠিক তোমারই বয়সে মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনরতি কীভাবে শিল্পজগতের এক বুদ্ধ দুয়ার খুলেছিলেন জানো? ফাদার নিকোলাস সহায়তায়?

—না। ফাদার নিকোলাস নামই শুনিনি।

—ফাদার নিকোলা বিচেইল্লিনি ছিলেন সান্তো স্পিরিতোর ধর্মযাজক। ফ্লোরেন্সে। মিকেলাঞ্জেলো যখন তোমার বয়সী তখন তাঁর বয়স—এই ধর, আমার মতো। সন্ধ্যাগ্রহণের আগে নিকোলা ছিলেন নামকরা খেলোয়াড় এবং মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্র। কিশোর মিকেলাঞ্জেলোর মধ্যে একটি

অসীম সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন তিনি...তুমি লজ্জা পাবে, না-হলে বলতুম, ঠিক আমি যেমন আজ লক্ষ্য করছি তোমার ভিতর। সে যা হোক, ফাদার নিকোলা নানাভাবে মিকেলাঞ্জেলোকে সাহায্য করতেন। উপদেশ দিতেন, ও কখন কী গড়ছে তত্ত্ব-তালাশ নিতেন। গীর্জা সংলগ্ন গ্রন্থাগার—প্রসঙ্গত, সেটাই ফ্লোরেন্স শহরের প্রাচীনতম লাইব্রেরী—তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন ঐ তরুণ শিল্পীর কাছে, এমনকি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন বোকাচিও পড়তে—যে গ্রন্থ সেই সাতোনারোলার ধর্মাস্থ-যুগে ছিল নিষিদ্ধ। মিকেলাঞ্জেলোর তখন ধারণা হয়েছে—মানবদেহের অভ্যন্তর-ভাগটা না জানলে—অস্থিসংস্থান, অস্ত্র, জননেন্দ্রিয়, হৃদপিণ্ড, মাংসপেশীর প্রত্যক্ষজ্ঞান না থাকলে কেউ সার্থক ভাস্কর হতে পারে না। কিন্তু যে-আমলের কথা তখন শুধু শল্য চিকিৎসকই প্রয়োজনে শবব্যবচ্ছেদ করতে পারে; আর কেউ নয়। মিকেলাঞ্জেলো একদিন সরাসরি প্রশ্ন করে বসল : ফাদার, আপনি যখন ডাক্তারী পড়তেন তখন নিশ্চয় মরা-মানুষের ভিতরটা দেখেছেন ?

—না, দেখিনি। মেডিকেল ক্লাসে অতদূর অগ্রসর হবার আগেই আমি চার্চে যোগদান করেছিলাম।

—আপনি কি মনে করেন না—একজন ভাস্করের পক্ষে প্রত্যক্ষজ্ঞানে জানা প্রয়োজন এই চামড়ার আড়ালে মানবদেহে কোথায় কী আছে ?

ভূকুণ্ডিত হল ফাদারের। বলেন, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন ?

—আচ্ছা, কোন ডাক্তার যখন শবব্যবচ্ছেদ করছেন তখন কি আমি দর্শক হিসাবেও উপস্থিত থাকতে পারি না ?

—নিশ্চয় নয় ! মহামান্য পোপের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। তুমি জান না ?

—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ?

—না। মৃত্যু।

মিকেলাঞ্জেলো নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলে, ধরুন, তা সত্ত্বেও কেউ যদি সে ঝুঁকিটা নেয় ? কবরখানা থেকে সদ্যসম্মাধিস্ত কোনও শব—

কথাটা তার শেষ হয় না। ফাদার ধম্কে ওঠেন, মাই ডিয়ার ইয়াং ফ্রেন্ড ! এসব সর্বনেশে কথা মনে একেবারেই ঠাই দেবে না। সে চেষ্টা কেউ করলে তাকে অনিবার্যভাবে

ফাঁসিকাঠ থেকে ঝুলতে হবে। ওসব অবাস্তব কথা থাক। বরং ভাস্কর্যের কথা বল। কী গড়বে এর পর ? কী ভাবছ ? একগাল হাসল মিকেলাঞ্জেলো। বলে, তাই তো এতক্ষণ বলছিলাম, ফাদার।

মিকেলাঞ্জেলো জানত, ঐ গীর্জার নিচে, বেসমেন্ট ফ্লোরে আছে একটা মরা-কাটা ঘর। সে এক ক্যাটাকুম্ব—অন্ধকূপ-কক্ষ। ফ্লোরেন্স শহরের যাবতীয় বেওয়ারিশ মৃতদেহ প্রাথমিক পর্যায়ে ওখানে এনে রাখা হয়। দু-তিন দিনের ভিতরেও মৃতদেহটির কোন দাবীদার উপস্থিত না হলে তখন চার্চের খরচে ও ব্যবস্থাপনায় সেই হতভাগ্যকে সমাধিস্থ করা হয়। মিকেলাঞ্জেলো যদি কোনক্রমে ঐ পাতালকক্ষে একবার প্রবেশ করতে পারে তাহলে সে একটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের ভিতরটা একনজর দেখতে পারে। স্কেচ করে নিতে পারে। তারপর আবার কাঁফনে ভরে রাখতে পারে। মিকেলাঞ্জেলো জানত না, ঠিক ঐ ভাবেই প্রায় তার সমসাময়িক—সাতাশ বছরের বড়—লেঅনার্দো গোপনে বেওয়ারিশ শব ব্যবচ্ছেদ করে অনবদ্য সব স্কেচ এঁকেছেন। লুকিয়ে সে ঐ পাতাল রাজ্যে ঢুকতেও গেল—পারল না—দরজায় প্রকাণ্ড গা-তালা।

ও বুঝল, ফাদার নিকোলার অনুমতি ছাড়া ঐ শব সংরক্ষণ-কক্ষে তার পক্ষে প্রবেশ করা অসম্ভব। জীবনসত্যের আদিম তত্ত্বটা জানবার জন্য তার জ্ঞানস্পর্শে এতই উদগ্র যে, একদিন সে সরাসরি অনুমতি চেয়ে বসল। প্রস্তাবটা সে পুরোপুরি পেশ করতে পারল না। মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিয়ে ফাদার নিকোলা গর্জে ওঠেন, যথেষ্ট ! তুমি কী বলতে চাও, আমি বুঝছি ! ব্যস্ ! ও কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবে না ! মহামান্য পোপের নির্দেশ এ বিষয়ে শেষ কথা। তুমি যে ঐ কথাটা মনে মনেও ভেবেছিলেন তা আমি ভুলে যাব। তুমিও ভুলে যেও।

দিন-সাতেক লজ্জায় ও চার্চের দিকে যায়নি। তারপর মনকে বোঝালো, যতই আধুনিকমনা হোন, ফাদার নিকোলার পক্ষে পোপের নির্দেশ লঙ্ঘন করা সম্ভবপর নয়। হস্তা-খানেক পর ও ক্ষমা চাইতে ফিরে এল।

কিন্তু ক্ষমা চাওয়া হল না। প্রসঙ্গটার অবতারণামাত্র ধমক খেতে হল, সেদিন বলিছি না—ও কথা আমরা আর কোন দিন আলোচনা করব না ?

মিকেলাঞ্জেলো অপরাধীর ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে।

ফাদার নিকোলা তৎক্ষণাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে আসেন, এ কার্দিন আসানি কেন? তোমাকে খুঁজছিলাম যে।

—কেন ফাদার?

—রোম থেকে এক ক্রেট বই এসেছে। তার মধ্যে খান-কয়েক ভাস্কর্যের। তোমার জন্য আলাদা করে রেখেছি। এস, লাইব্রেরীতে যাই।

মিকেলাঞ্জেলোর স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। দুজনে পায়ে পায়ে উঠে আসেন দ্বিতলে, লাইব্রেরী কক্ষে। ফাদার গ্রন্থাগারিককে বললেন, গ্রীক ভাস্কর্যের ওপর নতুন যে বইগুলি সেদিন সরিয়ে রেখেছিলাম, সেগুলি একে এনে দাও।

বইয়ের বাঁগুল নিয়ে মিকেলাঞ্জেলো ডুবে রইলে সারাদিন। ফাদার নিজের কাজে গেলেন। তৃতীয় বইখানা খুলতেই ওর নজরে পড়ে প্রকাণ্ড এ্যালবামটির পাতার ভাঁজে পেগ্নায় একটা লোহার চাবি। নিশ্চয় অনামনস্ক ফাদার নিকোলার কাণ্ড। পেজ-মার্ক হিসেবে চাবিটি রেখে ভুলে বসে আছেন। বোধকরি এতক্ষণ হারানো চাবিটা তিনি আঁতপাতি খুঁজছেন। মিকেলাঞ্জেলো গ্রন্থাগারিককে চাবিটা দিয়ে বলে, ফাদারকে দিয়ে আসুন। দিনের আলো যখন মিলিয়ে এল তখন ও উঠে পড়ে। ফাদার তখন উপাসনা কক্ষে।

পরদিন সে আবার এল লাইব্রেরীতে। ফাদারের দেখা পেল না। তিনি নাকি কোন মৃত্যু পথযাত্রীর শেষকৃত্য করতে বেরিয়েছেন। গ্রন্থাগারে উপস্থিত হতেই গ্রন্থাগারিক 'রিজার্ভে রাখা' বইগুলো পেড়ে নামায়। মিকেলাঞ্জেলো বলে, চাবিটা ফেরত দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, কাল বিকালেই। ফাদার বললেন ওটা নাকি খুব জরুরী চাবি। কাল সারাটা দিন উনি সেটা খুঁজছেন। কোথায় ফেলেছেন মনে করতে পারাছিলেন না।

মিকেলাঞ্জেলো বলে, উনি কি খুব ভুলো মানুষ? অগোছালো?

—আদৌ নয়। পান থেকে চুন খসলে ওঁর নজরে পড়ে।

গ্রন্থাগারিক প্রস্থান করতেই মিকেলাঞ্জেলো তার বইগুলো টেনে নেয়। গতকাল যে বইখানা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় রেখে গেছে সেখানাই খুলে বসে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! বইয়ের ভাঁজে যে পাখির পালকটা সে গতকাল রেখে গিয়েছিল সেটি অন্তর্ভুক্ত। তার

স্থলার্ভাষিত হয়েছে প্রকাণ্ড একটি লোহার চাবি।

হুবহু কালকের সেই চাবিটা।

চাবিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারিকের দিকে একপদ অগ্রসর হয়েই সে যেন বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক পা পিছিয়ে আসে। বসে পড়ে। ভাবে!

এর মানে কী? যা ভাবছে, তাই কী?

ফাদারের অধরোষ্ঠ আর অন্তঃকরণ কি দ্বৈরথ সমরে নেমেছে? জিহ্বা বলছে, মহামান্য পোপের আদেশ হচ্ছে শেষ কথা। আধুনিক মন বলছে, সত্যের সন্ধানে অভিযাত্রা শেষতর কথা! জিহ্বা বলছে, তোমার নরকবাস আনিবার্ষ! মন বলছে, সত্যকে ধর্মাক্ততার অচলায়তন থেকে মুক্ত করতে যদি নরকবাসই হয় আমার নিয়তির লিখন, তবে তাই হোক! নিঃশব্দে চাবিটা সে এবার রেখে দিল ওভারকোটের পকেটে। গভীররাত্রি সে ফিরে এল গীর্জায়। তার হাতে মোমবাতি আর চক্‌মাক, পকেটে চাবি, অন্তরে দুরন্ত জিজ্ঞাসা। ফ্লোরেন্স তখন ঘুমাচ্ছে। চরাচর নিষুতি। পাহারাদারের হাঁক শোনা যায় বহুদূরে। সদরের সিং-দরোজা বন্ধ; প্যাঁচল ডিঙিয়ে নিঃশব্দে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। ক্যাটাকুম্ব-এর প্রবেশপথটা ওর চেনা। চোরের মতো নীরব্র অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে নেমে যায় পাষাণ সোপান বেয়ে পাতালরাজ্যে। এই অন্ধকূপে মোমবাতি জ্বাললে কারও নজর পড়বে না। চক্‌মাক ঠুকে ও মোমবাতিটা জ্বালায়। সিঁড়ির পাশে কুলুঙ্গিতে মোমবাতিটা রাখতে গিয়ে ওর নজরে পড়ে একটি কুর্শাবদ্ধ মানবশিশুকে— সত্যের জন্য যিনি প্রাণ দিয়েছেন। মিকেলাঞ্জেলো নতজানু হল। অক্ষুণ্টে বল্ল, ও লর্ড যীসাস্! এ যদি পাপ, তবে শাস্তিটা আমাকেই দিও—ঐ বুদ্ধদ্বারের ও-প্রান্তে যে হতভাগ্য আমার প্রতীক্ষায় আছে সে নির্দোষ! আমার অপরাধে তার 'স্যালভেশন' যেন ব্যাহত না হয়!

মিকেলাঞ্জেলো এবার লোহ কুণ্ডিকাটি উদ্যত করে ধরে। ক্ষণিক মুহূর্তে কবি মিকেলাঞ্জেলোর মনে হল—ওর হস্তধৃত এই 'প্রবেশেচ্ছু' কুণ্ডিকা আর বুদ্ধদ্বারের ঐ প্রতীক্ষমানা ছিদ্রপথ যেন একটা আদিমসত্যের গূঢ় স্মৃতিপ্রতীক!

ধীরে ধীরে সে কুণ্ডিকাটি ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়ে দিল। অকারণ রোমাঞ্চ হল ওর সর্বাবয়বে। ওর অনুমান যদি সত্য হয় তবে পরমুহূর্তেই জীবনসত্যের নগ্নস্বরূপটা উদঘাটিত হয়ে যাবে।

মিকেলাঞ্জেলো চাঁবিটা ঘোরালো। অক্ষুটে একটা আর্তনাদ করে উঠল পাল্লাটা। যেন অনাস্থাতার প্রথম মিলনের আনন্দ-বেদনার শীংকার!

বুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল ঠেলতেই।

লিজা থামল। শ্যাম্পেনের তলানিটুকু কঠিনালীতে ঢেলে দিয়ে অগুস্ত্ বলে, তারপর?

লিজা খিল্খিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, গম্পের যে ওখানেই শেষ!

—কিন্তু ভিতরে গিয়ে তিনি কী দেখলেন?

—বোধকরি মোজেস্ যা দেখেছিলেন: ষোপের ভিতর আগুন!

—তার মানে?

—তার মানে বোঝাতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি যে জন্য এসেছ সেটা যে শুরুরই হয়নি এখনও।

শ্যাম্পেনের প্রভাবেই বোধহয়, ওর সারা দেহে রোমাণ্ড হল। বলে, কী? কী জন্য এসেছি আমি?

—বাঃ। আমার ছবির এ্যালবামটা দেখতে। তাই নয়? তুমি কী ভাবাছিলে?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন। অগুস্ত্ বলে, ঠিক কথা। এ্যালবামটা আনো।

—না। এ ঘরে বাতির জোর কম। চল, ও ঘরে গিয়ে বসবে, চলো।

দুজনে পর্দা সরিয়ে সংলগ্ন কক্ষে প্রবেশ করে। সেটি লিজার শয়নকক্ষ। ঘরজোড়া প্রকাণ্ড পালঙ্ক—ষোড়শ লুই-এর আমলের ফ্যাশন। ঘরের কাপেট, ট্র্যাপেস্ট, আসবাব সবই সে আমলের। খানকয় অয়েল-পোর্টিংও ঝুলছে দেয়ালে। খুঁটিয়ে দেখা হল না। মনে হয় রোকোকো শৈলীর সাদৃশ্যের চিত্র। অগুস্ত্কে একটি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে আলমারি খুলে লিজা বার করে আনে খানতিনেক এ্যালবাম। ওর সামনে টেবিলে সেগুলি নামিয়ে রেখে বলে, তোমার দেখতে আধঘণ্টা-খানেক লাগবেই। ততক্ষণ আমি বরং গা ধুয়ে আসি। যা প্যাচপ্যাচে গরম গেছে সারাদিন।

কথাটা অগুস্ত্-এর ভালো করে কানে গেল না। হাত বাড়িয়ে সে এ্যালবামগুলো গ্রহণ করে। সেজ্‌বাতির পল্টেটা উস্কে দিয়ে সে বসে ছবি দেখতে। লিজা পোষাক গুঁছিয়ে নিয়ে সংলগ্ন স্নানঘরে প্রবেশ করল।

প্রথম এ্যালবামটা নিসর্গ দৃশ্য। বিভিন্ন চিত্রকরের। বিভিন্ন যুগের। সবই স্কেচ। পেনসিলে অথবা ক্রেয়নে। সবগুলিই অটোগ্রাফ-করা। দ্বিতীয় এ্যালবামটি শুধুমাত্র মাদমোয়াজেল লিজার ন্যুড। প্রায় পনের-বিশ বছরের সংগ্রহ। বিগত দশকের নানান নামকরা চিত্র শিল্পীর। সম্ভবত বৃহদায়তন তৈলচিত্র আঁকার পূর্বে শিল্পীদল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে স্কেচ করে দেখেছেন কোন পোজটা ভাল হবে। হয়তো বাতিল স্কেচগুলিই সে সংগ্রহ করে রেখেছে। অথবা মডেলকে খুশি করতে এগুলি শিল্পীর প্রণয়োপহার।

বিকচোন্মুখ-যোবনা লিজা, বিকচযোবনা লিজা, পরিণত যোবনা লিজা। পাশ থেকে, পিছন থেকে, সামনে থেকে। দণ্ডায়মানা, উপবিষ্টা, আল্লেখশয়না। যেন একটি নারীত্বের বিবর্তন ইতিহাস।

ঠিক তখনই সংলগ্ন স্নানঘরে জল পড়ার শব্দে তন্ময়তা ব্যাহত হল। অগুস্ত্ চোখ তুলে বুদ্ধদ্বারের দিকে দৃকপাত করল একবার। মনশিক্ষে দেখতে পেল যবনিকার ও-প্রান্তে একটি নিরাবরণা স্নানরতার ন্যুড। পূর্ণ-যোবনা নয়, পরিণত যোবনাও নয়, অন্তাচলচুম্বিত আফ্রোদিতির শেষ 'কনে-দেখা-আলো'!

জোর করে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে আনে এ্যালবামে। অতীত লিজায়। পরের পৃষ্ঠাটা ওপ্টাতেই বজ্রাহত হয়ে গেল অগুস্ত্।

সেই পরের পৃষ্ঠার ভাঁজে একটি পেজমার্ক: একটি চাঁবি!

এ্যালবামটা নামিয়ে রাখে সন্তপণে। নিঃশব্দে চোরের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় স্নানঘরের দিকে। হঠাৎ নজরে পড়ে পাশের কুলুঙ্গিতে সন্তানকোড়ে মেরীমাতার একটি প্রস্তরমূর্তি। অগুস্ত্ অক্ষুটে মন্তোচ্চারণ করে: আভে মারিয়া! তুমি আমাকে মার্জনা কর! না হয় শান্তিই দিও—কিন্তু ঐ বুদ্ধদ্বারের ও-প্রান্তে আমার প্রতীক্ষায় যে আছে তাকে অপরাধী কর না। স্নানঘরের দ্বারের ছিদ্রপথে লোহ-কুণ্ডিকাটি প্রবেশ করানোর সময় ওরও মনে পড়ল এক আদিম গৃঢ় দ্বৈতপ্রতীকের কথা। ওর অনুমান যদি সত্য হয়, তবে পরমুহূর্তেই ওর আঠারো বছরের জীবনে আদিম রহস্যটা এই প্রথম উদঘাটিত হয়ে যাবে। চাঁবিটা ঘোরালো। অক্ষুটে আর্তনাদ করল পাল্লাটা। যেন কীসের আনন্দ-বেদনার শীংকার!

ঠেলতেই, বুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

আ

অজ্ঞতা শিল্পদর্শনের পূর্বে যেমন দুটি পূর্বজ্ঞান
আবশ্যিক : বুদ্ধদেবের জীবনী তথা বাণী এবং
জাতককাহিনী, তেমনি রোদ্যঁ-শিল্প দর্শনের
অনবরত প্রস্তুতি : গ্রীক লোকগাথা এবং রোদ্যঁর সমকালীন
পারীশিল্পের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা। গ্রীক যুগ থেকে রেনেসাঁ
চলবে করে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত যে ভাস্কর্যচিন্তা রোদ্যঁ
তর পরিণতি। তাঁকে জানতে হলে চিনে নিতে হবে
শিল্পবিস্তার করে ফিডিয়াস্ এবং প্র্যাক্সিটেলস্কে এবং ঘনিষ্ঠ
ভাবে মিকেলাঞ্জেলোকে। রোদ্যঁর সমকালীন এবং সম্ভবত
পরবর্তীকালীন অন্য কোন শিল্পী—ভাস্কর তো নয়ই,
চিত্রকরও—এভাবে ক্রমাগত ক্লাসিকাল শৈলী ও ভাবকে
সমকালীন চিন্তাধারার পরকলায় নবমূল্যায়ন করেননি। তবে
নতুন শিল্পচিন্তা—ফর্ম-ভাঙার ভাবনা—ঊনবিংশ শতকের
মঝামাঝি থেকেই শুরু হয়েছে। এ ধারার আদিসূরী—
'মানে' (Manet)।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে পারীশিল্পের অপ্রতিদ্বন্দ্বী
নরক হচ্ছেন দ্যাভিড (1748-1825)। তিনি পুরোপুরি
ক্লাসিকাল। নেপলিয়ঁর সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি ধরে
রেখেছেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্যানভাসে—কিন্তু রেনেসাঁ-শৈলীতে।
পরবর্তী পর্যায়ের দুই দিকপাল—আঙুরে এবং দেলাক্সে।
তঁরাও অতীতমুখী।

'মানে' আনলেন নতুন যুগের বার্তা। বয়সে অগুস্ত-এর
চল আট বছরের বড়। এলেন রুদ মনে, পল সেজান,
এংগার দেগা, কামিল পিসারো, পল গোগাঁ, তুলজ্-লুক্রেক্স।
ব্রিটিশ চিত্রকর,—রসেটি, লেয় ও সিস্লে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

হুইস্‌লার এবং ডাচ্ শিল্পী ভ্যান্ড্যানগঙ্ক। এঁরা অনেকেই
রোদ্যঁর বন্ধু—সকলেই প্রায় তাঁর সমসাময়িক—দশ-পনের
বছরের আগুপিছু। এঁদের ভাবধারায় তিনি যে প্রভাবিত
হবেন এটাই তো প্রত্যাশিত; বিশেষ পারীর প্রচলিত
শিল্পচিন্তা—সালোঁ ও ব্যো আঁ-এর প্রাচীনপন্থী ধারণা
ভেঙে ফেলার যে জোয়ার আনলেন পারীর 'কল্লোল গোষ্ঠী',
রোদ্যঁ তার অন্তর্ভুক্ত।

ক্লাসিকাল শৈলীকে যে এঁরা অস্বীকার করতে চান একথা
উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবার উদ্দেশ্যেই ইম্প্রেশনিষ্ট যুগের
আদিসূরী 'মানে' বারে বারে বেছে নিয়েছেন—প্রথম যুগে—
ক্লাসিকাল কম্পোজিশন। তাঁর 'অলিম্পিয়া' (1863)-তে
নুড যেভাবে অর্ধশয়ান তা জর্জনে এবং টিশিয়ানের বিখ্যাত
ভেনাস-এর ভঙ্গিমায়। কিন্তু ক্লাসিকালত্বকে অস্বীকার
করতে তিনি নগ্নিকার চুলে বেঁধেছেন সমকালীন ফরাসী-
ফ্যাসনের লাল-রিবন, পায়ে দিয়েছেন হাই-হিল্-জুতো। তাঁর
ডেজোনে সুর লো'-ব্ (1863) বা 'লাঞ্চন অন দ্য গ্রাস্'-এর
কম্পোজিশনটি জর্জনের 'ফেং শোপের্ড'-এর (1510)
অনুকরণে; একটি পুরুষমূর্তিতে হুবহু রাফায়েলের 'দ্য
জাজ্‌মেণ্ট অফ প্যারিস্'-চিত্রের একটি পুরুষমূর্তির নকল।
স্বজ্ঞানে কেন তিনি এ অনুকরণ করলেন? নতুন মূল্যবোধে
তাকে নতুন করে সাজাতে। তার ক্লাসিকালত্বকে অস্বীকার
করতে তিনি নারীদের করলেন নুড, পুরুষদের পরালেন
সমকালীন ফরাসী থ্রি-পীস স্যুট। এই জনাই ঐ চিত্রটি
1863-র সালোঁতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল—অশ্লীলতার দায়ে।
বলাবাহুল্য, আজ তা একটি বিশ্ববন্দিত তৈলচিত্র।

এতকথা বলছি শুধু বোঝাতে—কেন রোদ্যাঁ বারে বারে তাঁর বিষয়বস্তু চয়ন করেছেন ক্লাসিকাল যুগ থেকে, গ্রীক উপকথা থেকে। শুধুমাত্র তাকে নতুন যুগে চেনায় নতুন করে রূপায়িত করতে।

তুলনা করে বলতে পারি—যেন মাইকেল তাঁর নবাবিষ্কৃত অমিগ্রাক্ষর ছন্দটা পরিবেশন করবার উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তু হিসাবে বেছে নিচ্ছেন—রামায়ণকে। শুধু আঙ্গিক নয়, ভাবরাজ্যেও বিস্তারণ ঘটতে। মেঘনাদবধে নায়ক হয়েছে সেই হতভাগ্য—রামায়ণে যে ছিল খলনায়ক। পরিবর্তে রামায়ণের নায়ককে তিন করলেন খলনায়ক!

এই মৌল তত্ত্বটা জানা না থাকলে আমরা রোদ্যাঁর শিল্পের অন্তর্নিহিত সত্যে উপনীত হতে পারব না। তার বহিঃরঙ্গ—এ্যানাটমি ও রিয়ালিজম—মাংসপেশীর বাস্তবতা নিয়ে অহেতুক উচ্ছ্বাসপ্রবণ হয়ে উঠবে।

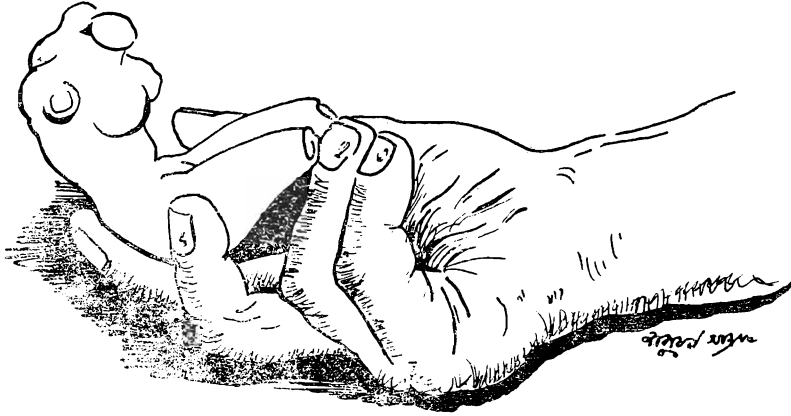
আসুন, এবার দু-একটি শিল্প নিয়ে খুঁটিয়ে দেখি :

হত তাহলে আমাদের মতো স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন কিন্তু অপারিসীম কৌতূহলী দর্শকের অনেক সুবিধা হত। স্বীকার করি : বিদেশের প্রদর্শনীতে তা করা হয় না। কিন্তু সেখানে সাক্ষরের হার কত? শিক্ষিতের?

রোদ্যাঁর হাত :

আরক পদুস্তিকার প্রচ্ছদপটটি লক্ষ্য করেছিলেন? রোদ্যাঁর হাত? আরক-পদুস্তিকায় শুধুমাত্র বলা হয়েছে : Rodin's hand cast from life. অত্যন্ত রিয়ালিস্টিক, নয়? প্রতিটি আঙুল, চামড়ার কুণ্ডন, নখের কোণায় কাদামাটির ছিটে। কিন্তু মাদাম তুসোর সংগ্রহশালাতেও তো দেখেছি এজাতীয় বাস্তবতা। তাহলে রোদ্যাঁর বৈশিষ্ট্য কোথায়?

সেটা অনুভব করতে হলে ঐ রিয়ালিজম-এর জগমোহনে মূর্তিগুলিকে দেখেই মোহিত হলে চলবে না। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে হবে। শিল্পের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা। ইব্‌সেন তাঁর 'ডল্‌স্-হাউস্' বা 'পুতুল খেলা'য় যা বলতে



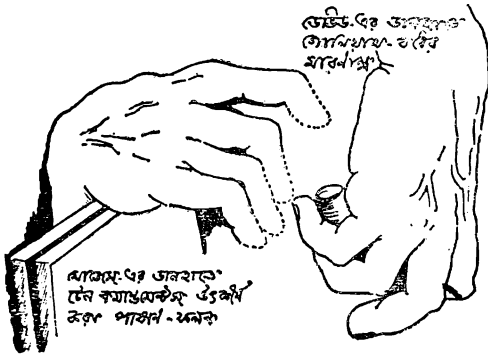
চিত্র-4 : রোদ্যাঁর হাত ও পুতুল

'বিড়লা আকাদেমী অফ আর্টস্ এ্যাণ্ড কালচার' রোদ্যাঁ প্রদর্শনীর জন্য একটি সুন্দর আরক-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। সোলোটি অনবদ্য ফটো-ব্লক আছে তাতে; মূল্য ছিল দশ টাকা। শুনোছি, প্রথম কয়েক দিনের ভিতরেই তা নিঃশেষিত হয়ে যায়। ঐ পুস্তিকায় যদি আর একটু ব্যাখ্যা থাকত, বিস্তার থাকত—কী দেখতে হবে, কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে হবে তা যদি আর একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া

চেয়েছেন, রোদ্যাঁও এখানে তাই বলেছেন। এই পুরুষশাসিত উনবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়ী পারীতে 'নারীর মূল্য' নতুন করে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি। সমাজের গাওে একটি চপেটাঘাত করেছেন। পুরুষের হাতটি বাস্তব মানুষের হাতের চেয়েও বাস্তব—মিকেলাঞ্জেলোর অনবদ্য 'মোজেস্'-এর দক্ষিণ-হস্তের মতো, অথবা তাঁর 'ডেভিড'-এর ডান হাতের মতো বাস্তব। তফাৎ এই : মোজেস্-এর হাতে ছিল টেন্-কমাওমেন্ট্‌স্

উৎকীর্ণ করা প্রস্তর ফলক ; ডেভিড-এর হাতে ছিল গোলিয়াথ-বধের মারণাস্ত্র । তুলনায় পারীনগরীর সমকালীন নাগরদের হাতে—নারীপুতুল । বাইবেলযুগের যে দৃপ্ত পৌরুষ—জ্ঞান ও শক্তিকে মূর্ত্যে ধরে রাখার প্রয়াস তা যেন পর্ষবসিত হয়েছে নিতান্ত পুতুল খেলায় !

নব্বের ডগায়, আঙুলের ফাঁকে যে পাক-মাটির চিহ্ন তা কি শুধু বাস্তবতার খাতিরে ? শিম্পী আর কিছু বলতে চাননি তো ? সবচেয়ে বড় কথা : যে কথা ইবসেন বলেননি রোদ্যা সেকথাও বলেছেন। বলেছেন স্পষ্টভাবে : নারীপুতুলের মাথা নেই, হাত-পা নেই ! যেন হস্তপদশূন্য নারীর কবন্ধটাই যথেষ্ট ! যোবনের যুগ্ম-জয়োচ্চাস-শোভিত উরস, 'নামিতা নিম্ননাভি' আর গুরু-উরু-বিধৃত সাগর-সঙ্গম প্রত্যাশী একটি



চিত্র—৫ : মিকেলাঞ্জেলোকৃত মোজোন্স ও ডেভিড-এর হাত সম্মেলন বন্দীপ ! বাস্ ! পারী নগর-নাগরদের প্যার-এর জন্য আর কী চাই ?

স্বই তো বুঝলাম ! তবু একটা কথার ব্যাখ্যা এখনও পাইনি। রোদ্যা কেন নিজের হাতের ছাঁচ নিয়েছিলেন ? হাঁচ হুলে ভাস্কর্য বানানো তো তাঁর ধাতে নেই। তবে কি ধরে নেব এটা তাঁর আত্মধিকার ? মেরী রোজ, কামিল, ডাচেস্স সেরাজোল প্রভৃতির প্রতি তাঁর ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া ?

LARGE CLENCHED HAND WITH SUPPLIANT FIGURE (1890) :

প্রভাণ্ড আগ্রাসী হস্ত ও বন্দিনী :

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বন্দিনী এবং আগ্রাসী হস্ত দুটি মিলে একোকার হয়ে গেছে ! শিম্পী এ প্রতীক-ভাস্কর্যে কি বোঝাতে চাইছেন, নারী-মাংসলোলুপ ঐ হাতটির এই অবক্ষয়ে

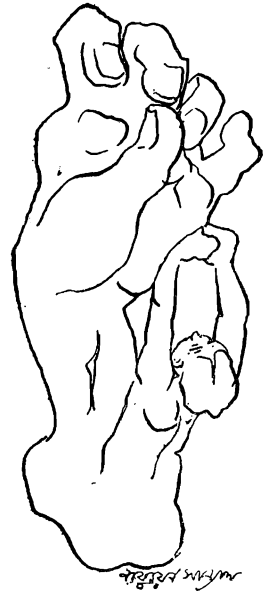
বন্দিদারও ভূমিকা আছে ? সুপ্ত সিংহকে সে নিজেই জাগ্রত করেছে ? রূপান্তরিত করেছে আগ্রাসী হস্তে ? না হলে নারী-মূর্তির পদদ্বয় কেন একাত্ম হয়ে গেল আগ্রাসী হস্তে ? নায়িকার ঐ উৎক্ষিপ্ত হস্ত-দ্বয় কি মিনতির ? নাকি প্রতিবাদের ? অথবা আত্মরক্ষার 'রিফ্লেক্স-এ্যাকশন' ? এই প্রতীক-ব্যঞ্জনায় অনেক অনেক কিছু ভাববার আছে। গাইড বইতে সে-সব কথা কিছু নেই।

সু্যভেনেরে শুধু লেখা আছে : We see a spectacular composition which draws attention to the contrast between the strong and cruel hand and the suppliant figure. It is worth noting that the pathological character of the hand attracted the attention of the doctors, specializing in the surgery of this portion of the anatomy, by its senews, its joints and the hypertension of its muscles' [আমরা একটি অপূর্ব কম্পোজিশন দেখতে পাচ্ছি, যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মিনতি ভিক্ষার্থীর্ণীর সঙ্গে ঐ কর্ঠন, নির্দয় আগ্রাসী হস্তের বৈপরীত্যে। বিশেষভাবে

লক্ষণীয় হাতটির প্যাথলজিক্যাল চরিত্র। চিকিৎসাবিজ্ঞানী চিত্র—৭ : আগ্রাসী হস্ত ও বন্দিনী—বিশেষ করে হস্তপদাদির এ্যানাটমি ঘাঁটা শল্যচিকিৎসকবৃন্দ



চিত্র—৬ : আগ্রাসী হস্ত ও বন্দিনী (1890 ?)



শুধু বিস্ময়ে প্রশংসা করেছেন ঐ হাতের নিখুঁত মাংসপেশীর
বিন্যাস এবং অস্থিমজ্জার 'নৈখুঁতা' !

পশ্চিমী শল্যাচিকিৎসকবৃন্দের এ সার্টিফিকেট শুনে মনে পড়ে
গেল আমাদের মৈত্রমশায়ের উচ্ছ্বাস : 'আহা, যেন অমর্ত !'

শিবতুল্য ভালোমানুষ মৈত্রমশাই ভিনগাঁয়ে গিয়েছিলেন বড়
ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে। মেয়ে দেখে ফিরে আসার পরে
বাড়ির মেয়েরা ওঁকে ঘিরে ধরেছে, বাবা, কেমন মেয়ে দেখলেন
বলুন ?

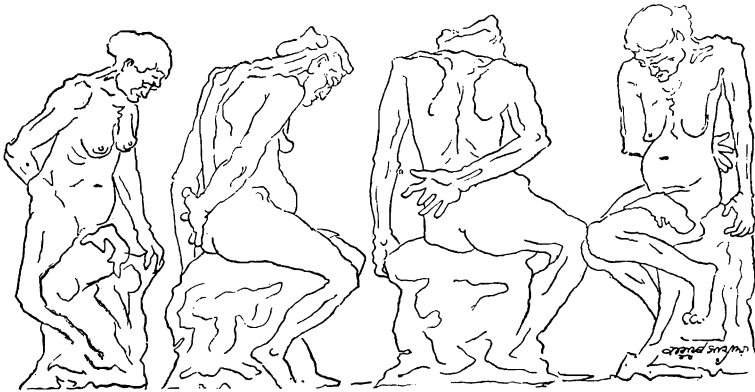
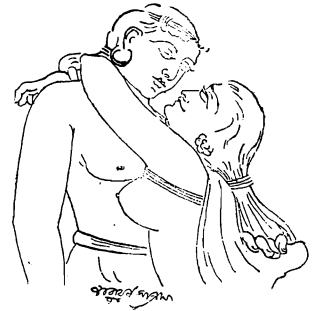
মৈত্রমশাই বলেন, কন্যাকর্তার দ্বিতল বাড়ি - সার্বকীয় ইন্টের,
চুন সুরাকির গাঁথনি। সামনে ফলের বাগান - তা বিঘে-তিনেক
হবেই - আম-জাম-লিচু, আর কাঁঠাল যা হয়, কী বলব - জাত
রসখাজা ! এক-এক কোয়া, এক-এক পোয়া !

মেজ মেয়ে বলে, আসল কথা বলুন, মেয়ে দেখতে কেমন ?
কদ্দর লেখাপড়া করেছে ?

মৈত্রমশায়ের উচ্ছ্বাস তবু থামে না, আর দেখে এলাম ওদের
গোয়ালে ! তিন-তিনটি ভগবতী - চোখ জুড়িয়ে যায় ! দিনে
আধমণ দুধ ! যেন কামধেনু !

বড় মেয়ে ধমক দেয়, বাজে কথা ছেড়ে বলুন, পাত্রী
কেমন ?

—পাত্রী ? মানে... ইয়ে হয়েছে ঘরে অনেকগুলি অনূঢ়া কন্যা
ছিল তো তাই পাত্রী কোন্টি তা আমার ঠিক ঠাণ্ড হলে
না। কিন্তু ফলার যা করালে কী বলব ! ঘন দুধের সঙ্গে
রসখাজার রস - আহা, যেন অমর্ত !



খ

১৮৬০ সাল। অগুস্ত্ একজন ভাস্করের সহকারী।
অনুমতি পেলে ফুলকাটা নকশা খোদাই করে ;
তবে অনুমতি বিশেষ পাওয়া যায় না। অধিকাংশ

সময়ে বিকটাকার মর্মরকে ছোঁনি-হাতুড়ির শাসনে জ্যামিতিক
আকার দেয়। মাল বইতে হয়, মশলা মাখে, ধরাধরি করে
পাথরের চাঁইকে ঠাঁইনাড়া করে। এ জন্য তোমরা যদি বল
—ও দিনমজুর, তা বল ; ও কিন্তু নিজেকে তা ভাবে না।
ভাস্করের প্রথম সোপান : স্টোনকাটার। মিকেলান্জেলোকেও
এভাবে শুরুর করতে হয়েছিল।

অগুস্ত্-এর এই পরিণতিতে সে নিজে যতটা মর্মাহত তার চেয়ে
অনেক বেশি হয়েছে তার ছোড়িদি। একটা দৌর্ভাগ্যবশত সে
যেন দিন দিন ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে। মেরীর দুঃখের অবশ্য
দ্রাব্যও একটি হেতু আছে। বোয়া-আং'-এ ভর্তি হবার পর
থেকে বার্নুভ্যাঁ মেলামেশাটা কমিয়ে দিয়েছে। সে যেন এখন
ঊচ্চতর মহলের জীব। নানান সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে সে
পর্যায়ক্রমে ডেটিং করছে। জনশ্রুতি, তার নবীনতমা বান্ধবী
একজন বিধবা, অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছে সাম্প্রতিক
স্বামীবিয়োগে।

দৈনিক মজদুর হিসাবে খাতায় নাম লেখাবার আগের সপ্তাহে
একদিন সকালে অগুস্ত্ হঠাৎ বলে বসল, আজ একটা হেড-
স্টাডি করব। অগুস্ত্ রোদ্যাঁর প্রথম ও শেষ ভাস্কর্য।

সেদিন আকাশ ভেঙে নেমেছে বৃষ্টি। পাপা রোদ্যাঁ ইঁজিচেয়ারে
নহবান, মা রান্নাঘরে বাস। ছোড়িদি কোথায় গুমড়ে গুমড়ে
কঁদছে কে জানে! অগত্যা অগুস্ত্ এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব
পেশ করে বসে স্বয়ং পাপা রোদ্যাঁর দরবারে।

পাপা রোদ্যাঁ আঁকে ওঠে : আমার মাথা ! স্কেপেছিঁস্ !
অত ধৈর্য আমার নেই।

মা রান্নাঘর থেকে ধমক দেয়, আর তো কিছু নয়, চুপচাপ বসে
আছ, বসেই থাকবে !

—ও যে নড়তে চড়তে দেবে না ! এক ভাবে ঠায় বসে থাকা—
শিকার ফস্কে যাচ্ছে দেখে অগুস্ত্ বলে, না, না, নড়া-চড়া
করতে পার। তাতে আমার অসুবিধা হবে না কিছু।

মা বলে, এত করে বলছে, শোনই না কথাটা ! না হয় ওর
একটা সখ্ই মেটালে আজ !

কথাটা মনে লাগল। তা বটে ! ছেলেটাকে কোনদিন কিছু
হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। শুধু গালমন্দই করে এসেছে
এতকাল। আহা বেচারি অনেক দুঃখে ও কথাটা বলেছে
আজ—‘অগুস্ত্ রোদ্যাঁর প্রথম ও শেষ ভাস্কর্য’ !

রাজি হয়ে গেল পাপা রোদ্যাঁ।

অগুস্ত্ বলে, মুখখানা অমন পাতি হাঁড়ির মতো করে রেখেছ
কেন ?

পাপা রোদ্যাঁ গৌজ হয়ে বলে, সে দোষ আমার সৃষ্টিকর্তার।
কথাটা ঠিক। ভাবে অগুস্ত্। পাপার চরিত্রে গান্ধীর্ষটাই
ঠিক মানাবে। পাপা রোদ্যাঁ হাসতে ভুলেছে। বড় মেয়ে
ম্যাগদালেন, ছোট মেয়ে ব্যর্থপ্রেমিকা। আর একমাত্র ছেলেটির
কিছু হল না—দিন মজুর হতে চলেছে ! পাপা রোদ্যাঁ
হাসতে যাবে কোন দুঃখে ?

সারা দিনে মোটামুটি সারা হল হেডস্টাডিটা। কাদামাটির।
কিন্তু আদৌ পছন্দ হল না পাপা রোদ্যাঁর। বলে, এটা কী
হল ? মাথা আর মুণ্ড ? আমার গৌফ কই ?

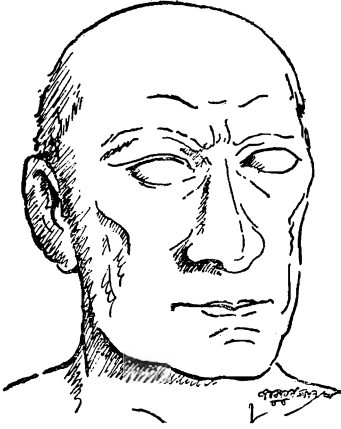
—মাথা এবং মুণ্ডু তো বটেই ! তবে গৌফটা বাদ দিয়ে গড়েছি আমি। গৌফটা তোমার মুখে বেমানান।

—গৌফটা বেমানান ! ইয়ার্কি হচ্ছে ! বাপের সঙ্গে ? সংসারের চৌহদ্দির বাইরে নিরক্ষর সংবাদবহর ঐটুকুই তো পৌরুষের পরিচয়।

কিন্তু কিছুতেই রাজি করানো গেল না অগুস্ত'কে।

মা মারিয়ার পাপার পক্ষ নেয়, এই তোর বড় দোষ খোকন। জিদ্দিবাজি। সোঁদিন বল্লি—ব্যা-আৎ থেকে তোকে তাড়িয়ে দিল মডেলের মুখে বেমক্কা গৌফ এঁকে'হিস্ বলে ; আর আজ তোর মডেলের মুখে গৌফ আছে—দিব্যি মোম্ দিয়ে পাকানো অমন সুন্দর গৌফ-জোড়া—তবু তুই গড়বি না ?

পাপা সযত্নে গৌফের উপর হাত বুলায়। ধর্মপত্নীর মুখে 'অমন সুন্দর গৌফ-জোড়া' ওর কানে মধুবর্ণ করেছে। কিন্তু অগুস্ত' তার জিদ্দ ছাড়বে না। বলে, ও তোমরা 'বুঝবে না। পাপার মুখে গৌফ-জোড়া সুপারফ্লুয়াস্ ! বাহা, প্রক্ষিপ্ত !



চিত্র—৪ : জাঁ ব্যাপ্তিস্ত্ (পাপা) রোদ্যা (১৮৬০)

মেরী পাপা-র হেড-স্টাডিটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। বলল, আমি যদি কোনদিন উপার্জন করি অগুস্ত', তবে আমার প্রথম কাজ হবে এটার একটা ব্রোঞ্জ-কাস্ট বানানো। এটা তোর শেষ ভাস্কর্য নয় রে, এটা তোর প্রথম ভাস্কর্য।

...ঠিকই বলেছিল মেরী। বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রোদ্যা'র এইটাই আদিমতম শিল্প (১৮৬০), যা ভাবীকাল সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে তাঁরই নামাঙ্কিত সংগ্রহালয়ে, পারীতে।

এর পরের পর্যায়ে পাপা রোদ্যা'র সংসারে নেমে এল আবার

একটি আঘাত।

নৈশ আহারের টেবিলে আহারান্তে মেরী শান্ত সমাহিত কণ্ঠে জানালো তার সিদ্ধান্ত : সে স্থির করেছে, সেট যুথিমির কন্ডেণ্টে নাম লেখাবে। সন্ধ্যাসিনী হয়ে যাবে।

মা মারিয়ার দু-গাল বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল অশ্রুধারা। সে অশ্রুটে উচ্চারণ করল 'আভে মারিয়া'-মন্ত্র। অগুস্ত' কী বলবে ভেবে পেল না। সে জানত, বানু'ভ্যার সঙ্গে তার সেই বিধবা প্রণয়িনীর এন্জেলমেণ্ট সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে। কিছু করার নেই। বানু'ভ্যার অন্যান্য বান্ধবীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মেরী পিছপাও নয় ; কিন্তু এবার সে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হল। এবার ওর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন অস্ত্র নিয়ে লড়তে এসেছে তা রক্তাক্ত : ব্যাঙ্কের চেক বই ! এ রোগের ওষুধ নেই। ব্যা-আৎ দুর্গন্ধারে দুর্গেশ দুমা-রাজার মতো ! ছোড়দিটা সের্টিমেণ্টাল জানা ছিল—বানু'ভ্যাকে সে যে ভীষণ ভালোবাসতো এটাও অজানা নয়, কিন্তু সে প্রেম কি ছিল এত গভীর ? কুমারী-মনের আয়না কত মুখই তো প্রতিবিম্বিত হয়, প্রথম প্রত্যাহানেই কি কেউ এভাবে ভেঙ্গে পড়ে ? বেছে নেয় সন্ধ্যাসিনীর জীবন ?

শুধু পাপা রোদ্যা'র কোন ভাবান্তর হল না। জেদী, এক-রোখা আত্মজাকে সে ভালভাবেই চেনে। ওর কণ্ঠস্বরে যে নম্র-দৃঢ়তা তা যে পরিবর্তিত হবার নয় ঐটুকু পাপা বুঝেছে। মেরী প্রাপ্তবয়স্ক। পাপা রোদ্যা'র বাধাদানের কোনও অধিকার নেই। না সামাজিক, না নৈতিক।

দু-দিন পরেই পোর্টম্যান্টো গুঁছিয়ে মেরী চলে গেল কন্ডেণ্টে। মেয়ে চিরকাল থাকে না। জানে পাপা, জানে মারিয়া। কিন্তু এভাবে !

মাত্র ছয়মাস সন্ধ্যাসিনীর জীবন অতিবাহিত করেছিল ওর ছোড়দি। তারপরেই কঠিন 'পেরিটোনাইটিস'-রোগে—অন্ত্রদাহে—অস্পাদিনের রোগ-ভোগের পর মেরী মারা যায়। ছোড়দি ঘোরতর অসুস্থ এ খবর পেয়ে ছুটে এসেছে অগুস্ত'। তার পরিধানে ওভর-অল, সর্বাস্থে কাদার ছিটে। ছোড়দি খুবই অসুস্থ ঐটুকুই সে জেনেছে, জানত না সে মৃত্যুশয্যায়।

একটি নার্স পথ দেখিয়ে ওকে পৌঁছে দিল কেবিনে। অসহায়ের মতো চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে। মা বসে আছে ছোড়দির পায়ের কাছে। দু-হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদছে। শব্দ হচ্ছে না কোনও। পিঠটা মাঝে মাঝে শুধু ফুলে

ফুলে উঠছে। পাপা রোদ্যা দাঁড়িয়ে আছে বাইরের বারান্দায়।
দূরের গীজার মাথায় কুশাচিহ্নটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।
ছোড়াদির মাথার কাছেও একটি প্লাস্টার-কাস্ট : কুশাবিক্র
যীশুর।

ওকে দেখতে পেয়ে মেরী ডাকল, আয়, কাছে আয়।

অগুস্ত্ নতজানু হয়ে বসে পড়ে ওর শয্যার পাশে। ছোড়াদির
হাতটা টেনে নিয়ে আলতো চুমু খেল। উঃ! মাত্র ছয় মাসেই
হাতটা কী বিশীর্ণ হয়ে গেছে। সাদা, রক্তহীন! মেরী বললে,
কাঁদছিচ্ কেন রে বোকাছেলে? একদিন তো সবাইকেই
যেতে হবে?

অগুস্ত্ কী যেন বলতে গেল। পারল না। উদ্গত অশ্রুর
চাপে কথাটা আটকে গেল ওর কণ্ঠনালীতে। মেরী হাত
বাড়িয়ে বালিসের তলা থেকে বার করে আনল একটা মুখবন্ধ
খাম। অক্ষুটে বললে, এটা রাখ্। এখন দেখিস্ না।
যীসাস্ আমাকে করুণা করেছেন খবর পেলে দেখিস্।

মারিয়া ধমকে ওঠে : কী যা তা বক্ছিস্! চুপ কর!

মেরী স্নান হাসে। বলে, না, আর অব্যথা হব না। চুপই
করব এবার। পাপাকে ডাক। তোমাদের তিনজনের মুখ
দেখতে দেখতে...আহ্! এ সময় বড়াদটা যদি...

এই তার শেষ কথা। মেরীর মুখে ম্যাগ্‌দেলেন-এর
নাম।

পাপা রোদ্যাকে ডাকতে হল না। নিজেই সে এগিয়ে এল।
যে মেয়েকে কোনদিন কিছু হাতে তুলে দিতে পারেনি এবার
তার মাথায় শূন্য হাতখানাই রেখে মনে মনে কী যেন মল্লোচ্চারণ
করল।

মেরী শান্তিতে চোখ দুটি বঁজল।

মেরীর মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেল অগুস্ত্। ওর জীবনের
বানিয়াদটাই যেন ধ্বসে গেছে। ছোড়াদিকে কবর দিয়ে ফিরে
আসার পর মাসখানেক সে কোন কিছুতে মন দিতে পারেনি।
মজদুরি করতে যায়নি, কাদামাটি মাথেনি, বা স্বেচ্ছ করেনি।
তারপর একদিন নৈশ আহারের টেবিলে ঠিক একইভাবে সে
জ্ঞাপন করল তার সিদ্ধান্ত : শিম্পী হবার বাসনা ত্যাগ
করেছে অগুস্ত্ রোদ্যা। সে তার ছোড়াদির অসমাপ্ত রতটিকে
উদ্যাপন করতে চায়। এই হবে তার জীবনের লক্ষ্য। ইতি-
মধ্যেই হোলী স্যাক্রামেন্টে সে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে।

সন্ন্যাস নেবে সে।

মা মারিয়া ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে। কিন্তু পাপা রোদ্যা
নিশ্চল পাথর। অগুস্ত্ প্রাপ্তবয়স্ক। তার এ সিদ্ধান্তে বাধা
দেবার অধিকার পাপা রোদ্যার নেই। না সামাজিক, না
নৈতিক।

অগুস্ত্ তার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গেল গুরু লেকক্কে।
ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে লেকক্ ধমক দিয়ে ওঠেন,
তোমার এ সব ব্যক্তিগত কথা আমাকে জানাতে এসেছে
কেন?

—কী বলছেন মেংর! আপনি না আমার গুরু?

—ছিলাম। সে সম্পর্কটাও আমি স্বীকার করতে চাই না এর
পর থেকে।

—কেন মেংর?

—কেন? জানতে চাও? কিন্তু কেন জানতে চাও? তুমি
কি চাও ওরেন্স লেকক্ ঐ নরকে পচে মরুক? দাস্তের
নরকে?

অগুস্ত্ নতশির হয়। তা বটে। শিম্পাচার্য যে একমত নন,
এ-কথা রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হয়ে তিনি কেমন করে
উচ্চারণ করেন? অক্ষুটে বলে, আপনি আমাকে আশীর্বাদ
করুন মেংর!

গর্জে ওঠেন গুরু : নিশ্চয় নয়! তোমাকে আশীর্বাদ করার
আমার কী অধিকার? গীজায় যাচ্ছ, সেখানে অনেক 'ফাদার'-
এর দেখা পাবে। তাঁদের কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা কর। স্বর্গে
যাওয়া সহজ হবে! যাও! আমাকে বিরক্ত কর না। আমার
এখন অনেক কাজ।

নতমস্তকে প্রস্থানোদ্যত হয়। দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছেছে,
হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শোনে, শোন?

ঘুরে দাঁড়ায়। লেকক্ বলেন, এই চাবিটা রাখ!

এগিয়ে এসে চাবিটা নেয়। বলে, কীসের চাবি
এটা?

—স্টুডিওর। রঙ-তুলি-কাগজ, প্লাস্টার-মাটি-মার্বেল সবই
পাবে। যদি কখনও মন চায়...তবে, আমি স্টুডিওতে আছি
দেখলে ঢুকবে না। বুঝেছ?

—কেন মেংর?

—আহ্! সোজা কথাটাও বুঝিস্ না? তোর মুখদর্শন করব
না বলে!



দিনকতক পরে পোর্টম্যান্টো গুঁছিয়ে নিয়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, আমার জন্য দুঃখ কর না। মনকে শক্ত কর। আর বড়দিটা যদি কোনদিন ফিরে আসে...

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মারিয়া।

—পাপা রোদ্যা কোথায়?

—ঘরে দোর দিয়ে আছে সকাল থেকে।

—নাও এটা ধর। তোমার কাছেই থাক। এটা—

—জানি। ছোটখুকির বাঁ-হাতের আংটিটা—

হ্যাঁ তাই। মেরী এটা ওকে উপহার দিয়ে গেছে। ঝুটো-মুস্তো বসানো একটা আংটি। ওর মৃত্যু-সংবাদ পাবার পর অগুস্ত্ সেই মুখবন্ধ খামটা খুলেছিল, ছোড়দির নির্দেশ মতো। তাতে ছিল ছোট্ট একটা চিঠি। মেরীর অন্তিম অনুরোধ:

“অগুস্ত্-সোনা!

“দুটো অনুরোধ রেখে যাচ্ছি। আমাকে কফিনে শুইয়ে দেবার আগে আমার বাঁ-হাতের অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে নিস। যেদিন বিয়ে করবি সেদিন তোর বউয়ের হাতে ওটা পরিয়ে দিস। বলিস, এটা তার ছোড়দির আশীর্বাদ। মুস্তোটাই ঝুটো, ভালবাসাটা নয়। আর একটা অনুরোধ। যদি শিম্পী হিসাবে কখনও উপার্জন করতে পারিস—মনে রাখিস, অন্য কোনও বৃত্তিতে লক্ষপতি হলেও নয়—তাহলে তোর উপার্জনের অর্থে একটা সাদা মার্বেল-ফলক কিনিস। কালো মার্বেলে ‘ইন-লে’-করে আমার সমাধির মাথায় এই স্বরচিত কবিতাটি নিজে হাতে উৎকীর্ণ করে দিস। সিমেন্টারীর ওক্-ফার-পপ্‌লারের বনমর্মরে আমার মন ভরবে না রে, আমি চাই মনমর্মর! তোর হাতে মর্মরের মর্মর!

“অশুর অপচয় কর না এখানে অহেতুক!

কারণ, যাবার বেলায় তার কাঁকালে ছিল অশুর ঘড়া কানায়-কানায় ভরা।

পারলে, এখানে দাঁড়িয়ে হেস,

কারণ, সে ছিল হাসির কাঙাল।

পারলে, এখানে দাঁড়িয়ে ভালবেস,

কারণ, অনুর্বর পড়ে ছিল তার যৌবন-জাঙাল!

একটু আড়ালে সরে গিয়ে বরং

সঙ্গিনীকে চুমু খেও একটা;

কারণ,—না!—সেটাই তো মৃত্যুর বিরুদ্ধে

জীবনের জেহাদ।”

দুটো অনুরোধের একটাও রাখা যাবে না। আংটিটা রেখে গেল মায়ের জিম্মায়, অভিনিষ্ঠমণের আগে। ছোড়দির সমাধির শিয়রে ঐ ফলকটাও বসানো যাবে না কোনদিন। কারণ, ভাস্কর হিসাবে উপার্জনের আর কোনও সম্ভাবনার লেশ রইল না। সিমেন্টারির বনমর্মরের সাথে শিম্পীর হাতে খোদাই করা মর্মরের মনমর্মর ঐক্যতান রচনা করবে না কোনদিন। অরফিউস্-এর বীণার তার গেছে ছিঁড়ে, তার আঙুলগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত!

কিন্তু পাপা রোদ্যা কোথায়?

বুদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে সে কী করছে সকাল থেকে? অগুস্ত্ করাস্থাত করল বন্ধ দরজায়। পাপা রোদ্যা দ্বার খুলে বার হয়ে এল। অগুস্ত্ স্তম্ভিত হয়ে যায়। পাপার মুখমণ্ডলে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে। তার পুরুষ্ঠ্ গোঁফ-জোড়া নিমূল! অট্রহাস্যে ফেটে পড়তে চাইল অগুস্ত্। সেটাই ছিল ছোড়দির শেষ অনুরোধ: পারলে হেস’।

পারল না। ওর মনে হল, অনেক দুঃখে পাপা রোদ্যা এই চরম সিদ্ধান্তটা আজ নিয়েছে। নিয়তির বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ। প্রশ্ন করে, এ কী! গোঁফ-জোড়া কামিয়ে ফেললে কেন? এতদিনে তাহলে স্বীকার করছ—ওটা বেমানান ছিল তোমার মুখে?

—আদৌ না! তবে তোর মূর্তিটা ভারী বেমানান দেখাচ্ছিল বিনা গোঁফে। শিম্পী যখন মডেলের নাগাল পায় না তখন মডেলকেই শিম্পির দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হয়!

—শুধু এজন্যই গোঁফটা কামালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মস্যুয়ে রামছাগল!

রামছাগল! তিন তিনটে সন্তান খোয়ানোর পরেও! এতক্ষণে অট্রহাস্যে ফেটে পড়ে। পাপা রোদ্যাও যোগ দেয় সে হাসিতে। জ্বরী দিকে ফিরে বলে, কেমন মানিয়েছে বল?

মারিয়ার দু চোখে জল টলটল করছে। কিন্তু না! তা ঝরে পড়ল না। অশুর অপব্যয় এখানে নিষেধ! মা এগিয়ে এল সহাস্যে। জড়িয়ে ধরল বৃদ্ধ স্বামীকে। তার গণ্ডে সোহাগের একটা চুষনিচিহ্ন এঁকে দিয়ে বলে, ম্যাগ্নিফিক্! বৃদ্ধও তার সমদুঃখভাগিনীর তোবড়ানো গালে এঁকে দিল প্রতিচুষন।

কারণ—না !—সেটাই তো মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জেহাদ !

ফাদার পীয়ের-জুলিয়ন। এইমার্ড একজন বিচিত্র ধর্মযাজক। বয়স বেশি নয়, চর্চিশের কোঠায়। গোঁফ-দাড়ি কামানো। মাথার চুলগুলো উর্মি-মুখর। আশ্রমের কোথায় কী ঘটছে সব তাঁর নখদর্পণে। প্রাক-সন্ন্যাস জীবনে তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ছাত্র-জীবনে কবিতা লিখতেন। এখনও লেখেন, তবে প্রেমের কবিতা আর নয়; এখন ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করছেন : ডিভাইন কমিডি।

অগুস্তকে তিনি খুঁটিয়ে যাচাই করলেন। স্বাভাবিক নাগরিক জীবন ত্যাগ করে হঠাৎ সে কেন চার্চের আশ্রমে আসতে চায় তা জানতে চাইলেন। সেটাই নিয়ম। নবাগতকে সব কথা জানাতে হয়। অগুস্ত-ও জানালো। পাপের কথা, পাপার কথা, মায়ের কথা। বড়দির গৃহত্যাগ আর ছোটদির দেহত্যাগের কথা। লেককের স্নেহ আর দুমার বিদ্বেষ। এমনকি মাদমোয়াজেল লিজার স্নানঘরের দ্বারের ছিদ্রপথে লৌহ-কুণ্ডিকা প্রবেশ করানোর সরমের কথাও।

সব শুনে ফাদার বললেন, নিজের মনকে প্রশ্ন করে জবাব দাও ব্রাদার রোদ্যা, এই যে তুমি মেসশাবকের মতো চার্চের আশ্রমে ছুটে এসেছ তার মূল প্রেরণাটা কোথায়? যীসাস্-এর প্রতি আকর্ষণ, না কি সংসারের প্রতি বিকর্ষণ?

অগুস্ত নতনেদ্রে বললে, দুটোর একটাও নয়। আমার এ সিদ্ধান্ত ছোটদির প্রতি তাঁর ভালবাসায়। তার আরক্স কাজটা এঁগিয়ে নিয়ে যেতে।

হাসলেন ফাদার। বললেন, কথাটা ভুলো না, ব্রাদার রোদ্যা। এ প্রসঙ্গে আমরা আবার একদিন ফিরে আসব। আজ নয়; আজ তোমার অন্তর সে জন্য প্রস্তুত নয়।

—চার্চে আমি কী-জাতের কাজ করব?

—কী কাজ করতে তোমার ইচ্ছে?

—আপনি যা আদেশ করবেন। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজ।

হাসলেন ফাদার। বললেন, বেশ, লাইব্রেরী ঘরে এস। সেখানে তোমাকে কাজ বুঝিয়ে দেব। অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজ।

দুজনে উঠে এলেন গ্রন্থাগারে। ফাদার এইমার্ড প্রকাণ্ড একটি পাণ্ডুলিপি বার করে বলেন, এটি আমার অনুবাদ : ডিভাইন

কমিডি। পড়েছ?

—না।

—তবে এটাই তোমার প্রথম কাজ। পড়ে শেষ কর।

অগুস্ত অবাক হয়ে বলে, কেন ফাদার? আমি তো লেখাপড়া শিখতে আসিনি?

—জানি। যীসাস্-এর সেবা করতে এসেছ। কিন্তু সে কাজে সবার ভূমিকাই তো এক হতে পারে না। কেউ আত্মদের সেবা করে, কেউ দোরে দোরে গিয়ে যীসাস্-এর বাণী প্রচার করে, কেউ বা চার্চের বাগানে শজি বানায়, ফুল ফোটায়ে। তোমাকে দেওয়া হচ্ছে অন্য এক জাতের কাজ। এই পাণ্ডুলিপিটাকে সচিত্র করা। রঙ তুলি সবই আমি যোগান দেব। তোমাকে ছবি আঁকতে হবে। কিন্তু তার আগে কাব্যের বিষয়বস্তুটার সঙ্গে তো তোমাকে পরিচিত হতে হবে?

অগত্যা তাই। কিন্তু ক'লেক মাসের মধ্যেই ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মিনিয়চার-পোর্ট্রেট ওর ধাতে নেই। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। অকপটে সে-কথা স্বীকার করতে ফাদার বলেন, তাহলে শিম্পের কোন্ শাখার দিকে তোমার ঝোঁক?

—স্কাপচার।

—বেশ, তাহলে তোমার মনোমত একটি ভাস্কর্য তৈরী করে চার্চকে শ্রদ্ধার্থী উপহার দাও।

—কী ভাস্কর্য?

—তোমার যা ইচ্ছা। পীতা, ডিসেন্ট-ফ্রম-দ্য ক্রস্, রেজারেক-শান, যা খুসি।

—আপনার কী ইচ্ছা? কোন্টা?

—না! আমি আমার ইচ্ছার ভার তোমার স্বন্ধে চাপাবো না। তোমার যা ইচ্ছা—

—আমার যা ইচ্ছা? বেশ, বলুন, কখন আপনার সময় হবে?

—আমার সময়ের কথা আসছে কেন?

—বাঃ। আপনাকে সিটিং দিতে হবে না? আপনারই হেড-স্টাডি তৈরী করব যে।

—আমার? না, না, তা কেন?

—কী আশ্চর্য! আপনিই তো বললেন—আমার ইচ্ছামতো ভাস্কর্য গড়তে!

—ও! যু নটি বয়।



এই অনবদ্য হেডস্টাডি-র একটি ব্রোঞ্জ-কাস্টও রোদ্যা সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত (১৮৬৩)। তাঁর দ্বিতীয় ভাস্কর্য। ফাদার এইমার্ড ব্যস্ত মানুষ; স্থির হয়ে সিটিং দেবার সময় কোথা? অগুস্ত্-এবারেও রফা করেছিল তার মডেলের সঙ্গে।

ওয়ার্ক-টেবিলে বসে উনি কাজ করতেন। অগুস্ত্-সেই চপ্পল-মুখটির একাধিক স্কেচ বানালো। তারপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আঁকা স্কেচের সাহায্যে ত্রি-মাত্রিক ভাস্কর্যটা গড়ে তুলল।



চিত্র—৯ : ফাদার এইমার্ড (১৮৬৩)

আরও মাস ছ'য়েক অগুস্ত্ টিকে ছিল চার্চে। তারপর সে ফিরে আসে সংসারজীবনে। ফাদার এইমার্ডের নির্দেশেই। তিনি বলেছিলেন, প্রথম দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, —এ পথ তোমার নয়। কিন্তু বলিনি। কারণ তখন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তুমি বুঝতে না, অহেতুক তোমার অভিমান হত। কিন্তু যীসাস্-কে সেবা করার পথ তো একটা নয়। তোমার ক্ষেত্র শিপ্পজগৎ। ভাস্কর্য। সেখানেই ফিরে যেতে হবে তোমাকে। শিপ্পের মাধ্যমে অন্যায়ের, পাপের প্রতিবাদ জানাতে হবে; সত্য-সুন্দরের বাণী প্রচার করতে হবে। কাঁটার মুকুটটা তোমার জন্য সেখানেই প্রতীক্ষা করছে ব্রাদার রোদ্যা!

—কাঁটার মুকুট?

—হ্যাঁ; তাই কুশটা কাঁধে করে যখন বধ্যভূমির দিকে এগিয়ে যাবে তখন ওরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারবে। সেটাকে সহ্য করে আপোসবিহীন লড়াই করাই তো তোমার যীসাস্-এর সেবা! তোমার কুশ অন্য জাতের। কাঠের নয়। পাথরের। মর্মরের! সেই মর্মর-কুশের মর্মর শুনতে পাচ্ছ না?

—চার্চের ভিতর থেকে কি তা সম্ভব নয়?

—কেন নয়? ফ্রা ফিলিপ্পোলিপি তা করেছেন, ফ্রা বার্থো-লোমিউ তা করেছেন। কিন্তু চার্চের বাইরে থেকেও তা সম্ভব। যীসাস্-এর চার্চ কি এই পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দি? গোটা দুনিয়াটাই তো চার্চ! লেঅনার্দোর 'শেষ সায়মাস' আর মিকেলঞ্জেলোর 'পীতা' তো সেই যীসাস্-এরই কাজ! তাছাড়া একটা কথা কেন ভুলে যাচ্ছ রোদ্যা? তোমার ছোড়াঁদর এটা ইচ্ছা নয়। সে এটা চাইছে না।

—চাইছে না? এখন?

—হ্যাঁ এখন। সে তো স্বর্গ থেকে লক্ষ্য করছে তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ। তুমি অনুভব কর না? তুমি কি বোঝ না? সে কী ভীষণ মর্মান্বহত তুমি এই ব্রাদারহুড গ্রহণ করায়?

চম্কে ওঠে অগুস্ত্। বলে, কী বলছেন, ফাদার? ছোড়াঁদ মর্মান্বহত—আমি ব্রাদারহুড গ্রহণ করায়?

—নিশ্চয়ই। ভেবে দেখ, সে কী চেয়েছিল? সামান্য একটা সমাধিফলক। কিন্তু দুটি সঠে। তুমি নিজে হাতে খোদাই করবে। আর অন্যজীবিকায় লক্ষ্যপাত হলেও নয়!

অগুস্ত্ নতজানু হয়ে বলে, বুঝছি ফাদার! আমারই ভুল। আপনি আশীর্বাদ করুন আমাকে। কাঁটার মুকুটটার সন্ধান আমাকে চার্চ ছেড়ে যেতে হবে।

—আমেন!



হোলী স্যাক্রামেন্ট থেকে আবার সংসারে ফিরে এল বার্ষিট সালে। তখন ওর বয়স বাইশ। বাড়িতে গেল না কিন্তু। যদিও বেকার, মাঝে মাঝে দৈনিক দিনমজুরি করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে, তবু এ বয়সে যুরোপীয় তরুণ নিজের ডেরা-ডাঙা গাড়ে। পাপা রোদ্যা দুগ্ধ পেল; কিন্তু প্রতিবাদ করল না। এক-কামরার একটা খুপ্‌রি, আলো-হাওয়ার নাম-গন্ধ নেই, স্যাংসেতে, ঠাণ্ডা। কিন্তু কাফে

গ্যেরবোয়া থেকে দূরে নয়। এই কাফেটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার ; কারণ এখানেই সে-আমলে হপ্তায় দুদিন সমবেত হতেন ‘কল্লোল-গোষ্ঠী’। আগামীযুগের চিন্তাধারার একঝাঁক ভগীরথ। প্রচলিত শিম্পজাহ্নবীকে যঁরা নতুন খাতে বহাতে চান, সগর-রাজের মৃত্যুরাজ্যে। প্রাচীন ও নবীন দলের সেই শাস্ত্রতন্ত্র, যা মাঝে মাঝে মহাকালের নৈশ-আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক হানে। আঠারশ’ তেষ্টির সালোতে প্রত্যখ্যাত হয়েছিলেন পাঁচ-পাঁচজন উদীয়মান ‘কল্লোলগোষ্ঠী’র শিম্পী, যঁরা পরবর্তী যুগের দিকপাল। যঁদের নাম আজ সারা পৃথিবীর শিম্পানুরাগীর পরিচিত : এদুয়াড মানে (1832-83) ; আলফোর্সে লেগয় (1837-1911) এদগার দেগা (1834-1917) ; পীয়ের রেনোয় (1841-1919) অঁরি ফান্ত-লাতুর (1836-1904)। আর বিচার-বিবেচনা করে যঁরা সালো-প্রদর্শনীতে তাঁদের শিম্পকে অপাংস্তেয় বলে ঘোষণা করেছিলেন ? তাঁদের নাম জানি না। সেইসব দিগ্গজ শিম্পবোদ্ধার নাম আদৌ যদি কোথাও খুঁজে পান তবে পাবেন এ কারণে যে, তাঁরা ‘মানে’র ‘লাপ্তে’ অন দ্য গ্রাস্’-কে বাতিল করেছিলেন, অঙ্গীলতার দায়ে। তাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া শক্ত। যে কারণে ‘থিয়োডোর দুমা’র নামটা আমাকে কম্পনা করতে হয়েছে—ব্যো-আর্ৎ-এর সেই ধুরন্ধর শিম্পপিণ্ডের নামটা খুঁজে না পাওয়ায়। আবার ঘটনাচক্রে তাঁরা ইতিহাসে মাঝে মাঝে স্থান পেয়ে যান ঐ অপকীর্তির জন্যই, পিস্তিয়াস্ পিলেত-এর মতো।

হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আপনার এলাকায় যিনি এম. এল. এ. হবার তাল ভাঁজেন তিনি মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলেন, হঁয়ারে, তোদের কবিতা নাকি নামকরা পত্রিকার সম্পাদকেরা প্রত্যখ্যান করেছে ? কুছ পরোয়া নেই ! তোরা নিজেরাই একটা পত্রিকা বার কর, আমি পিছনে আছি ! ঐ রকমই একটা অহৈতুকী ঔদার্যে নয়্য রিপাবলিকের রাষ্ট্রপতি লুই নেপলিয়ন্—যিনি খুড়োর মতো একচ্ছত্র সম্রাট হবার স্বপ্নে বিভোর—তিনি একদিন ঐ ‘কল্লোলগোষ্ঠী’র বিদ্রোহী শিম্পীদের ডেকে বললেন, তোমরা একটা পৃথক প্রদর্শনীর আয়োজন কর : **Salon des Refuses**—প্রত্যখ্যাতদের প্রদর্শনী ; আম্মো পিছনে আছি !

ব্যান্ ! কেজ্জা ফতে। বিদ্রোহী শিম্পীর দল উঠে পড়ে লগল। তাঁরা সালোর পাশাপাশি প্রত্যখ্যাতদের প্রদর্শনী

করবে। তাদের কাজ রসোত্তীর্ণ হয়েছে কি হয়নি, তা এখন আর ঐ বুড়ো-হাবড়ার দল বিচার করবে না। করবে জনগণ।

কয়েক মাসের ভিতরেই প্রদর্শনী হবে। অগুস্ত্ও আছে সে দলে। কিন্তু কী প্রদর্শন করবে সে ? ফাদার এইমার্ড-এর হেডস্টিডিট দিয়ে এসেছে চার্চকে। সেটা পারলৌকিক ফাদার-এর সম্পত্তি। পাপা রোদঁয়ার মুণ্ডুটা ইহলৌকিক ফাদারের হেপাজতে। কিন্তু নতুন মডেল সে কোথায় পায় ? কোন মুখ্ বিনা পারিভ্রামিকে অখ্যাত ভাস্করের মডেল হতে রাজি হবে ? সবাই কাজের মানুষ।

নিতান্ত ঘটনাচক্রে সে পেয়ে গেল তার পরবর্তী মডেল : বিবি !

কাফে থেকে বাড়ি ফিরছে। সন্ধ্যা হব-হব। হঠাৎ নন্দ্যাম গীর্জার সামনে দেখল একটা জটলা। একটা পাগল প্যাকিং বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে বস্ত্রতা দিচ্ছে। আর সবাই মজা দেখছে। পাগলটার মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল, গৌফ-দাড়ির জঙ্গলে মুখটা ঢাকা। মাথার আর দাড়িতে কাঠের গুঁড়ো। বগলে একটা খালি ‘আবসাঁথ’-এর বোতল। লোকটা যেন সার্মন দিচ্ছে : শোন, শোন পারীবাসী ! শেষ বিচারের দিন সমাগত। আমি তোমাদের সংবাদটা আগে-ভাগে জানাতে এসেছি। প্রস্তুত হও !

ভীড়ের ভিতর থেকে কে যেন বলে, মসুয়ের নাম কি সাভোরানোলা ?

লোকটা বলে, আজে না। আমার নাম : বিবি। আমি হলুম গিয়ে যীসাস্-এর প্রেরিত পুত্র, বুয়েছেন ? সান্ অব্ দ্য সান্ অব্ গড্। তার মানে হল গিয়ে গ্র্যাণ্ড-সন্ অব্ গড্-দ্য-গ্র্যাণ্ড-ফাদার, বুয়েছেন ?

জনতা হাস্যরোলে ফেটে পড়ে।

অগুস্ত্ আকৃষ্ট হয়। লোকটার চোখের দৃষ্টিতে। সে যেন প্রত্যক্ষকে পার করে দেখছে। সব চেয়ে বীভৎস ওর নাকটা। সেটা থ্যাংলানো। ফলে মুখটা কদাকার। হঠাৎ কথাটা মনে হল ওর। একে মডেল করলে কেমন হয় ? সালোঁ এতদিন মডেল-এর ভিতর রূপকে খুঁজেছে—সুন্দরের অভিসারে শিম্পের যাত্রা ছিল এতদিন। পুরুষ-মডেল হবে মিকেলান্জেলোর ‘ডেভিড’-এর মতো সুগঠিত সুন্দরতনু ; নারী-মডেল হবে আণ্ডরের ‘লা-সুস’-এর মতো নিষ্পাপ, পেলব,

স্বর্গীয়। কিন্তু মানুষ কি তাই? দুনিয়ায় কি জোড়ায়-জোড়ায় শুধু এ্যাপোলো-ভেনাস? প্রাচীনপন্থীরা যাই বলুন, বিদ্রোহী ‘কল্লোলগোষ্ঠী’ তা মানে না। বিবি সুরূপ নয়; কিন্তু কুরূপ, না অপরূপ? দুটোর একটাও নয়; সে-সে। সে : অনুপম!

ভীড়ের মধ্যে কে যেন বললে, বিবি, তুমি তোমার ঠাকুর্দাকে দেখেছ?

একগাল হাসল পাগলটা: এই দ্যাখ বোকাটার প্রশ্ন! আমার ঠাকুর্দারে আমি দেখব না?

—কেমন দেখতে তিনি?

—এ্যাই আমারই মতো। চুল উস্কু-খস্কু; প্যাতুলুন তাঁঙ্গি মারা; আর নাকটা খাঁদা। আমারে তাঁরই আদলে বানিয়েছেন যে ঠাকুন্দা!

অগুস্ত্ ভাবে লোকটা পাগল না দার্শনিক! এঁগিয়ে এসে বলে, বিবি, একটা কথা বলতো? তোমার নাক তো ঈশ্বর ভেঙেছেন, নিজের মুখের আদল দিতে; কিন্তু ঈশ্বরের নাকটা কে ভাঙল?

—ওমা, তাও জান না? তুমি-আমি! গোটা পারী! পাপের পঁাকে ডুবিয়ে ঠাকুর্দার খোঁতা নাক ভোঁতা করে দিয়েছি আমরা সবাই। তাঁর নাতির দল!

অগুস্ত্ ভীড়ের হাত থেকে পাগলটাকে উদ্ধার করে আনল। এই কদর্য মানুষটার মুখাকৃতিই শুধু নয়, ওর জীবন-দর্শন বিদ্রোহী ‘কল্লোলগোষ্ঠী’র তালে তাল দিয়ে চলেছে। এই তার বিনা-পারিশ্রমিকের মডেল। দু-এক টুকরো ব্রাউন-রুটি, হল তো মাংসের একটা হান্ডি আর এক পঁাট ‘আবসাঁথ’; ব্যস্, লোকটা পোষা লেড়ি কুত্তার মতো পড়ে রইল ওর দোর-গোড়ায়।

এই হেডস্টাডিটা করতে গিয়ে অগুস্ত্ দু-দুটো আবিষ্কার করল। প্রথমত, মডেল যদি স্থির হয়ে থাকে তবে তার অসুবিধা হয়। মনে হয় মডেল তার স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ‘টিপিক্যাল-মডেল’ হয়ে গেছে। মডেল ক্রমাগত নড়বে-চড়বে আর ও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথমে একাধিক স্কেচ করে যাবে। সেই স্কেচগুলির সাহায্যে ক্রমে গড়ে উঠবে দ্বি-মাত্রিক ভাস্কর্য। হয়তো ইতিপূর্বে যে-দুটি হেডস্টাডি করেছে সেখানে স্থিরতা অলভ্য ছিল বলে এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। বিবি স্থির হবার পাত্র নয়। তাতে কিছুমাত্র অসুবিধা হল না

অগুস্ত্-এর। দ্বিতীয়ত, ও অনুভব করল—মডেলকে শুধু চোখে দেখে তার আত্মটাকে ধরা যায় না। মডেলের মুখে হাত বুলালে—দু-হাতের দশটা আঙুলে মডেলের দেহের কণ্টর—তরঙ্গভঙ্গ—অনুভব না করলে ও তার স্বরূপটা ধরতে পারছে না। স্পর্শেই যখন সে অনুভব করে তখন দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বার বুদ্ধ করে দেয়। অদ্ভুত পদ্ধতি।

...প্রসঙ্গত, বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রোদ্যাঁ তাঁর সমস্ত শিল্পজীবনে ঐ দুটি পদ্ধতি মোটামুটি মেনে চলেছেন। এজন্য অনেক পরে বিখ্যাত মার্কিন নর্তকী ইসাডোরা ডানকানের কাছে তিনি চরম অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। দু-হাতের দশটা আঙুলে যখন অনুভব করতে চেয়েছিলেন ইসাডোরা ডানকানের যৌবন তরঙ্গ...না, সে কথা যথাস্থানে।

অগুস্ত্ কিন্তু হেডস্টাডিটা শেষ করতে পারল না। মূর্তিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একদিন সকালে বিবিকে আর দেখতে পেল না। সেই কাকডাকা ভোরে উঠে পাগল-মানুষটা কোন্ নিবুদ্ধেশের পথে যাত্রা করেছে। নিশ্চিত রুটির নিরাপত্তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে সে বোধকরি অন্য কোনও শহরে ছুটেছে জানাতে: শেষ বিচারের দিন সমাগত!

অগুস্ত্ সমস্ত পারী শহরে তাকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজল; কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। উপায় নেই; স্মৃতিনির্ভর-পদ্ধতিকে এবার তাকে ভাস্কর্যটা শেষ করতে হবে।

স্মৃতিনির্ভর! তখনই মনে পড়ল গুরু লেকক্-এর কথা। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না। প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁতে মূর্তিটা দাখিল করার সময় পার হয়ে গেছে। তা যাক, মূর্তিটা শেষ করার আগে লেকক্-এর সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার। মূর্তিটা বগলদাবা করে সে গেল পেতি-একালে।

হেডস্টাডিটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন লেকক্। অনেক-অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখলেন সেটাকে। তারপর বলেন, তুই বোধহয় এতদিনে তোর পথটা খুঁজে পেয়েছিস্ অগুস্ত্। এ ভাস্কর্য প্রচলিত ধারার ধারে-কাছে নেই! আমি নিজেও প্রচলিত পারী ধারার ধার ধারিনি কোনদিন; কিন্তু আমি নিজেও সাহস করে এমন একটা বীভৎস মুখ...

মান্বপথেই থেমে গেলেন উনি।

অগুস্ত্ বলে, কী-যেন বলছিলেন, মেং?

—এ মডেলটাকে তুই কোথায় পেলি ? ওকে কেন এত চেনা চেনা লাগছে আমার ? নাকটা এমন ...

—কিন্তু সব বৃত্তান্ত খুলে বলে । আকাশ ফুড়ে বিবি এসেছিল, অবার বাতাসেই মিলিয়ে গেছে ।

—কিন্তু ওর নাকটা এভাবে ভাঙলো কি করে ?

—জানি না । সে নিজেও মনে করতে পারে না । পাগল তে ! আমি এই শিল্পীটির নাম রেখেছি—‘The Man with the Broken Nose’ বা ‘খাঁদা’ !

—সেখ দেখি, আর একটু কাৎ করে ধর তো ?

চারও মিনিট পাঁচেক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে লেকক বলেন, হরহে ! লোকটা আমার চেনা । চল্লিশ বছর আগে ওর স্কেচ করেছি আমি । আর তোকে দেখাই ।

স্ট্রীভিওর আলমারি হাৎড়ে অতি প্রাচীন একখানা এ্যালবাম বার করলেন । স্কেচটা খুঁজে বার করে মেলে ধরলেন অগুস্ত-এর সামনে । অগুস্ত সেই স্কেচ আর নিজের মূর্তিটা মিলিয়ে দেখে বললে, স্বীকার করতেই হবে, সাদৃশ্যটা বিস্ময়কর ! মনে হয়, যেন একই মডেল-এর । কিন্তু মেংর, সময়ের ব্যবধানটা যে চল্লিশ বছর !

লেকক অদ্ভুত হেসে বললেন, না রে, সময়ের ব্যবধানটা অনেক অনেক বেশি । ঠিক তিনশ বছরের ! এটা তো আঠারশ’ চৌষাট্টি, যে মূর্তিটার স্কেচ আমি করেছিলাম সেই মূর্তির মডেল স্বর্ণারোহণ করেছিলেন পনেরশ’ চৌষাট্টিতে ।

অগুস্ত বলে, বুঝলাম না । কার কথা বলছেন আপনি ?

—তুই ‘মিরাক্ল’-এ বিশ্বাস করিস ? মানতে রাজি আছিস—অস্টন আজও ঘটে !

কী ভাব দেবে অগুস্ত বুঝে উঠতে পারে না ।

লেকক আবার বলেন, কাউকে বলিস না, ওরা বিশ্বাস করবে না । কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোকে তাঁর উত্তরসূরীরূপে চিহ্নিত করতেই ঠিক তিনশ বছর পর তাঁর ‘রেজারেকশান’ হল । তিনি সশরীরে আবির্ভূত হলেন তোর সামনে ! আমি হলে এর নাম ‘দ্য ম্যান উইথ দ্য ব্রোক্ন্ নোজ’ রাখতাম না । রখতাম : ‘দ্য প্রফেট’ ।

—প্রফেট ? যীশাস ?

—না ! যীশাস তো সারা দুনিয়ার প্রফেট ! কিন্তু তোর অমর কাছে আরও একজন প্রফেট আছেন, যিনি যীশাস-এর মনস পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনশ বছর আগে ।

সিস্তিন চ্যাপেলের দেওয়ালে ঐ বিবির মতোই যিনি চীৎকার করে বলেছিলেন : শোন ! শেষ-বিচারের দিন সমাগত । প্রস্তুত হও !

সর্বাপেক্ষে রোমাণু হয় অগুস্ত-এর । বলে, কিন্তু ...তিনি...মানে...

—ঐ যে ভারতবর্ষে আর চীনে জন্মান্তরের কথাটা সাধুসন্তরা বলে না ? আমি ওটা বিশ্বাস করি । তিনিই ! মিলিয়ে দ্যাখ ! সেই এলোমেলা চুল-দাড়ি ! ভাঙা নাক ! বিবির নয়, এ ভাস্কর্য যাঁর, তাঁর নাম : মিকেলান্জেলো বুয়োনরতি !



মাস ছয়েক পরের কথা । সারাদিন পালে দু লাক্সেমবুর্গ-এর সংলগ্ন বাগানে স্কেচ করেছে । সন্ধ্যাবেলায় সেই অন্ধকূটুরিতে ফেরার পথে নৈশ-আহারটা সেরে নিতে একটা ছোট কাফেতে ঢুকেছে । নিতান্ত সাদামাটা দোকান । সেল্ফ-হেল্প আয়োজন ।

বু দে ল’-আদিয়ঁর ধারে এ কাফেতে সস্তায় রুটি-তড়কা পাওয়া যায় । ভীড়ও কম । খাবারের থালা নিয়ে টেবিলে বসেই ওর নজর পড়ল সামনের টেবিলে । ওর দিকে সামনে ফিরে একটি মেয়ে বসে আছে । বছর সতের বয়স । একটু গ্রাম্য ছাপ ; পোষাক মেহনতি মানুষের, প্রসাধনের লেশমাত্র নেই । বোধকরি তার প্রয়োজনও নেই ! কস্‌মোটিক্ অর্থমূল্যে ওকে যা দিতে পারত, প্রকৃতি যৌবনমূল্যে ওকে তা পুরোমাত্রায় জুগিয়ে গেছে সতেরাট বসন্তে । তাবলে যদি ভেবে থাক সে প্র্যাক্সিটেলিস্-এর আফ্রোদিতে অথবা জর্জনের ভেনাস্ তবে ভুল করবে । সে তিলোত্তমা । তিল তিল করে নানান তিল সে সংগ্রহ করেছে সহস্রাব্দব্যাপী শিল্পীদের স্বপ্ন থেকে । ফিডিয়াস্-এর রমণীয়তা, রাফায়েলের পূততা, বন্ডিচেলির ‘বায়ব্যতা’ আর বুবেশের ‘ভলাপ’চুয়াস্‌নেস্ কোন এক নারীদেহে সহাবস্থান করছে আন্দাজ করতে পার ? তাহলে মনশ্চক্ষে ওকে দেখতে পাবে । অথচ খুঁৎ আছে ওর চেহারায় । চোখ দুটি আর একটু আয়ত হলে আদর্শ মডেল হত ; তা’ হোক ওর চোখের মণি দুটি এমন অতলান্তিক নীল যে, ‘আয়ততা’র অভাবটা চাপা পড়েছে । নাসা গ্রীকরমণীর নয়, কিন্তু হনু দুটি ‘এ্যাম্বিশাস্’ হওয়ায় একটা ব্যস্তিৎ দিয়েছে । মধ্যক্ষাম, পীবরবক্ষা, নিম্নাঙ্গ টেবিলের আড়ালে । মোট কথা সবটা মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আকর্ষণশীল । সে অনন্যা । সে—সে !

অগুস্ত্‌ নিঃশব্দে ফ্রককোটের পকেট থেকে স্কেচ বইটা বর করে। দুতহস্তে মেয়েটির স্কেচ করতে থাকে। শুধু মুখখানা। কিন্তু শুধু মুখখানাতেই কী থামা যায়? ওর উপবেশনের ভঙ্গিটাকেও যে ধরতে হবে। আঁকতে গিয়ে নজর হল—কী অপূর্ব ওর চুলের গোছা। গলানো সোনা!

একটু পরেই দেখল মেয়েটিও ওকে লক্ষ্য করেছে। হয়তো ওর বারে বারে তাকানোর ভঙ্গিমায়ে। মেয়েটির আহর-পর্ব শেষ হয়ে এসেছে। ছুরি-কাঁটা ছুটি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। অগুস্ত্‌-এর ছুরি-কাঁটার এতক্ষণ ছুটি ছিল। কী করবে? ওর বুকে বিঁধেছে ছুরি; চোখে বিঁধেছে কাঁটা। ও দুতহস্তে লাইনের পর লাইন টেনে চলে! মেয়েটি গাছোথানের উপক্রম করতেই অগুস্ত্‌ না-ভেবে-চিন্তে এক লাফে হাজির হল ওর সামনে।

অবাক দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে মেয়েটি বলে, কিছু বলবেন?—হ্যাঁ! ইয়ে হয়েছে—মানে, আপনার কাছে এক ফ্রাঁ-র ভাঙনি হবে? তাহলে ঐ ভিখারীটাকে কিছু ভিক্ষা দিতাম। তর্জনী তুলে দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান টুপিহাতে মুশ্‌কিল-আসানটিকে দেখিয়ে দেয়। উভয় অর্থেই মুশ্‌কিল-আসান। মেয়েটি বিচির হাসল। যেন দম্‌কা বাতাসে দোল খেল একগুচ্ছ ড্যাফোডিল। নিঃশব্দে হাত-বটুয়া হাতড়ে একটা মুদ্রা বর করে আনল। স্বয়ং উঠে গিয়ে দিয়ে এল ভিখারীটাকে। ফিরে এসে বসল নিজ আসনে।

অগুস্ত্‌ বিন অমন্ত্রণে তার সামনের চেয়ারটায়ে বসে বলল, এটা কি ঠিক হল? দরার উল্লেখ হল আমার, আর গাঁটগচ্ছা গেল আপনার।

মেয়েটি তার কপালের উপর ঝাঁক দেওয়া কোঁহুলী সোনার গুচ্ছটাকে সঁরিয়ে দিয়ে বলে, ঠিক আছে। শেষবের হবে যাক! এবার না হয় আমার দরার উল্লেখ হ'ক আর আপনার গাঁটগচ্ছা যাক।

—সেটা কী-ভাবে?

—আপনাকে দয়া দেখাতে আমি বরং একপাত্র রেড-ওয়েইন পান করি, আপনি বিলটা মেটান। আর সেই ফাঁকে স্কেচটা শেষ করুন। যান, সীটে গিয়ে বসুন!

—ম্যাগ্নিফিক্‌! আপনার ঐ নীল চোখের মণি দুটোর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ? ভাবতেই পারিনি। আমার নাম রোদ্যা; অগুস্ত্‌ রোদ্যা। আপনাকে কী নামে ডাকব?

—স্কেচটা শেষ করতে মিনিট পাঁচেক লাগবে। এর ভিতর

নাম ডাকাডাকির প্রয়োজন হবে না। যান, নিজের সীটে গিয়ে বসুন।

—বাঃ। ছবির নিচে আপনার নামটা লিখে রাখতে হবে তো?

—হবে না। কারণ আপনার স্বাক্ষরিত ছবিটা আমি নিয়ে যাব।

—সেটাও কি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে?

মেরী-রোজ ব্যুরে হচ্ছে অগুস্ত্‌-এর জীবনে প্রথম বাস্কবী! এবং অগুস্ত্‌ রোদ্যা হচ্ছে মেরী-রোজ ব্যুরের জীবনে প্রথম ও শেষ বয়-ফ্রেণ্ড। উপন্যাস লিখলে এভাবে ঘটনা সাজাতে সাহস পেতুম না। আপনারা বলতেন আতিনাটকীয়তা, বলতেন মেলোড্রামাটিক! কিন্তু মহাকাল সমালোচকের তোয়াক্কা করেন খোড়াই। তাই স্থূল তথ্যটা এখানেই লিপিবদ্ধ করে রাখি: এই সপ্তদশী মেরী-রোজ—যে চরিশ বছরের অগুস্ত্‌ রোদ্যার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্কেচ আঁকতে অনুমতি দিয়েছিল, তাকে ঐ শিপ্পাচার্‌য়ের সহধর্মিণী হবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল তিন্সান বছর! আক্ষেপ হ্যাঁ, ছাপার ভুল হয়নি এখানে: পাঁচের-পিঠে-তিন—তিন্সানই বলছি আমি। বিবাহ-রাতে ঐ সতের বছরের তরুণীর বয়স ছিল সত্তর, রোদ্যার সাতাত্তর। মাত্র উনিশ দিন বিবাহিত জীবনান্তে মেরী-রোজ রোদ্যা চিরশান্তির দেশে প্রয়াত হন!



‘ল্যভ্‌ এ্যাট্‌ ফাস্ট্‌ সাইট্‌’-এ বিশ্বাস কর তোমরা? আধুনিক পাঠিকার দল? প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম? পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে জিজ্ঞাসিত হলে রোমিও জুলিয়েটের মনগড়া রোমান্টিক প্রেমের বর্ণনা লিখবার সময়

নয়—বস্তুর জীবনে? কর না, জানি। তোমরা যে কো-এডুকেশন-কনসেজ-পড়া পোড়-খাওয়া সব অতি-আধুনিক। সহপাঠীদের ‘তুই-তোকারি’ কর—যেন তারুণ্যের প্রথম শিহরণে এইই জনভাত! কিন্তু বিংশ-শতাব্দী যখন এইরকম সাতঘণ্টে-জল-খাওয়া অশীতিপর পক্ষকেশা বৃদ্ধা ছিল না—আমাদের যৌবনকালে—

না! কী সব আবেল-তাবেল বক্‌ছি!

মেরী-রোজ মরেছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই। জুলিয়েটের মতো। অথবা রাধার। কিন্তু অগুস্ত্‌ নির্বিকার। চরিশ বছরের একটি

তরতাজা তল্লুগের তখন একটি নারীদেহের প্রয়োজন—যার অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের জয়পত্র, যার হৃন্দময় যুগ্ম-উরসে কন্দপের জয়ন্তস্ত, যার রক্তিম অধরে মদনের রক্তসুরাচমক, যার কনক-কবরীতে মীনকেতনের জয়ধ্বজা ! কিন্তু কেন জানো ? ওর ভাস্কর্যের প্রয়োজনে একটি আদর্শ যৌবনবতীর প্রয়োজন বলে !



চিত্র—10 : ফোর্মি হেড [মেরী রোজ ব্যুরে (1864)]

নিজেকে কল্পনা কর ঐ মেরী রোজ-এর ভূমিকায়। তোমার বন্ধু তোমাকে দেখছে—ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে, সামনে-পিছন থেকে। যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে স্কেচ করে যাচ্ছে ক্রমাগত ! হুকুম চালাচ্ছে—‘হেঁটে চলে বেড়াও, এবার বস, আচ্ছা বরং শুষেই পড়। আঁচলটা বুকের উপর থেকে সরিয়ে দাও !’ তারপর তোমার পোজটা ওর মনোমত হলে সে ঘনিয়ে আসছে। চোখের দৃষ্টিতে যা অনুভব করেনি এবার তাই ও অনুভব করতে চাইছে হাতের দশ-দশটা আঙুলে—তোমার যৌবন কণ্টর, তরঙ্গভঙ্গ !

ভূমি হলে কী করতে ? ওর গালে একটি থাপ্পড় কষিয়ে দিলে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটতে তো ?

মেরী রোজ তা করেনি। দিনের পর দিন পাক্সা তিনমাস সে সিটিং দিয়েছে। লেকক্-এর নির্জন স্টুডিওতে। স্কুলছুটির পরে। ডুপ্লিকেট চাবিটা এতদিনে কাজে লেগেছে। প্রতিদিন সকালে টুপিতে গাঁথেছে টাট্কা গোলাপ—প্রতিদিন সন্ধ্যায় শুকিয়ে গেছে তা। পাপড়িগুলো ঝরে ঝরে পড়েছে সলজ্জে। নির্জনকক্ষে তিনমাসে অগুস্ত্ শেখ করল তার জীবনের প্রথম নারীমূর্তি : ‘ফোর্মি হেড’।

হেড-স্টাডিটাকে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলে রোদ্যা প্রদর্শনীতে। নজর এড়াবার উপায় ছিল না। অনবদ্য ভাস্কর্য। কিন্তু তখন কি একবারও মনে হয়েছিল—ঐ অধরোষ্ঠজোড়া চুষন-তৃষিত ? এই তিনমাসের মধ্যে অগুস্ত্ না হোক তিনশ’বার দু-হাতে ওর মুখটা তুলে ধরে ঝুঁকে পড়েছে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছে অনাঘাতার অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্য। আবেশে রোজ-এর দুটি চোখ মুদে এসেছে। তিনশ’বারই মূর্তিতনেত্রার প্রত্যাশা ছিল নিজ অধরোষ্ঠে একটি কবোক্ষ স্পর্শ। পায়নি ! একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অগুস্ত্ ফিরে গিয়ে বসেছে তার ওয়ার্কটুলে ! কাদার পিণ্ডকে নতুন করে দলিত-মথিত করেছে। টের পায়নি, দু-হাত দূরে দলিত-মথিত হচ্ছে আর কিছু।

তিনমাস ধরে রোজ-ব্যুরে শুধু একটা কথাই ভেবেছে : ও পুরুষ তো ?

হেডস্টাডিটা যেদিন শেষ হল, সেদিন সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখে মেরী রোজ বলল, দারুণ হয়েছে কিন্তু ! ঠিক যেন আর্মি !

অগুস্ত্ ধমকে ওঠে, ঘোড়ার ডিম হয়েছে। এভাবে হবে না, আর্মি জানতাম।

—কী ভাবে ? কী হলে খুশি হতে তুমি ?

—নারীমূর্তির ক্ষেত্রে ভাস্কর্য চিরকাল যা চেয়ে এসেছে : ন্যুড !

একটা বিবাক্ত সাপ যেন ওর রাউজের ভিতর দিয়ে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। মুখটা হয়ে উঠল টকটকে লাল। অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলে না। তারপর মেরী রোজ অস্ফুটে বলল, এখানে তা কী-করে সম্ভব ? যে-কোন মুহূর্তে মসুয়ে লেকক্ ফিরে আসতে পারেন।

উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে অগুস্ত্। বলে, আমার কোন বন্ধুর স্টুডিওতে যদি ব্যবস্থা করি ?

—না। তৃতীয় ব্যক্তিকে জানানো চলবে না।

ওর উৎসাহে যেন এক বালুতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া হয়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে তো সেটা আকাশ কুসুম।

—না। তুমি বরং মাস-তিনেকের জন্য একটা স্টুডিও ভাড়া কর।

—ভাড়া? আমি? আমার খাওয়ারই পয়সা জোটে না—

—তোমাকে খরচ করতে হবে না। আমি দেব। আমার বাক্সে এখন একশ বিশ ফ্রা জমেছে। তাতে হবে না?

বজ্রাহত হয়ে গেল অগুস্ত্। ইতিমধ্যে সে জেনোঁছিল—মেরী রোজ ব্যুরে পারীতে একাই থাকে। ফিমেল ওয়ার্কাস্ ডর্মেটারিতে। ওর দেশ লোরেন—জোন-অব-আর্কের দেশ। রোজ একজন ‘সীমস্ট্রেস্’—দরজির দোকানে সেলাই করে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছে। ঐ মেহনতি অবলার সমস্ত সম্ভব কি এভাবে হাতিয়ে নেওয়া যায়?

বলে, তা হয় না।

ওর কাদামাথা বলিষ্ঠ দুটি হাত টেনে নিয়ে রোজ বলে, কেন হবে না? আমি তো ধার দিচ্ছি তোমাকে। ভিক্ষা নয়। তুমি মস্ত শিল্পী হবে একদিন। তখন শোধ করে দিও?

—যদি আমি কোনদিন বড় শিল্পী না হতে পারি?

—হবেই। আমার মন বলছে: তুমি নিশ্চয় বড়, অনেক বড় শিল্পী হবে একদিন! জগৎজোড়া খ্যাতি—

—ধামে! অমর একটু বিজনেস্-ট্রানজাক্শানের কথা আলোচনা করছি। টেকারিক্‌র লেনদেন। স্বপ্ন বিলাসিতা অন্য সম্বন্ধে।

মেরী রোজ এবার আর ওর চোখে চোখ রাখতে পারছে না। জবাব দিতে ওর গলা কেঁপে গেল। অস্ফুটে বললে, বেশ! আমার কাছে যা স্বপ্ন তা তো তোমার মুঠোর ভিতর, অগুস্ত্। না হয় তোমার সুখদুঃখের ভাগীদার করে নাও আমাকে। যদি সার্থক শিল্পী হও তোমার স্টুডিওর দেখ-ভাল্ করব, মূর্তি-গুলো ঝাড়পৌছ করব আমি। যদি না হও, তোমার সন্তানদের কোলেপিঠে করে—

—না!—এবার ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে অগুস্ত্ বলে, আমি কোনদিনই বিবাহ করব না। সংসার—সহধর্মণী—সন্তান—ওসব আমার জন্য নয়। তুমি যদি সেই আশাতেই দাদন হিসাবে—

ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল রোজ। বলে, জানি, জানি! তুমি

আমাকে ভালবাস না! আমার বান্ধবীরাও তো ‘ডেটিং’ করে! আমি আজ এই তিনমাস নির্জন স্টুডিওতে...তবু এই সতের বছর বয়সেও আমি জানি না—পুরুষমানুষ ঠোঁটে চুমু খেলে দেহে কী-জাতের শিহরণ হয়!

গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অগুস্ত্। এখন ওকে চুমু খেলে মারাত্মক একটা ভুল বোঝাবুঝি হবে। সেটা ‘মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের জেহাদ’ হবে না, হবে ওর ‘জীবনের বিরুদ্ধে মৃত্যুর সীলমোহর’।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল উপেক্ষিতার। সামলে নিয়ে বলে, মা মেরীর নামে শপথ নিয়ে বলছি, তুমি নিজেকে থেকে না চাইলে আমি বিবাহ করার জন্য পীড়াপীড়ি করব না। এটা আমার দাদনই। একটা ফাটকাবার্জি! তোমার প্রতিভার ব্যাঙ্কে অর্থটা দীর্ঘমেয়াদী ফিক্সড্ ডিপোজিট রাখলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তুমি সুদ-সমেত তা আমাকে একদিন ফিরিয়ে দেবে।

—শুধু সেই সর্ভেই আমি স্বীকৃত।



আঠার শ চৌষটিটির সালোঁতে অগুস্ত্-এর ‘দ্য ম্যান উইথ্ দ্য ব্রোকন্ নোজ্’ প্রত্যাখ্যাত হল। ‘প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁ’ সার্থক হয়নি। পারীর মানুষ ওখানে এসেছিল শুধু ধিক্কার জানাতে। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং একদিন এলেন সে প্রদর্শনী দেখতে। তিনিও জনগণের সঙ্গে কষ্ট মিলিয়ে ধিক্কার দিলেন নবীন শিল্পীদের। জনগণ যদিও রাজনীতি-বিদেও সেদিকে।

নতুন স্টুডিও ভাড়া করার পর অগুস্ত্ এল পেতি একোলে, চাবিটা ফিরিয়ে দিতে। লেকক্ স্টুডিওতে একাই ছিলেন। ওর সিদ্ধান্তটা জানবার পর তিনি বললেন, কাজটা ভাল হচ্ছে না, অগুস্ত্। আমার ভাল লাগছে না আদৌ।

—প্রত্যেক ভাস্করকেই নিজের স্টুডিও বানাতে হয়!

—না, তোমার চলে যাওয়াটায় আপত্তি নেই আমার, কিন্তু যেভাবে যাচ্ছ...

—কী ভাবে? কী বলতে চাইছেন?

—ওকে তুমি কত করে সিটিং চার্জ দিতে?

—ওকে মানে? কাকে?

—অগুস্ত্! আমার ধৈর্যের একটা সীমা আছে! ঐ মেয়েটিকে, যার হেডস্টাডিটা করছ আজ তিনমাস ধরে।

মুখটা লাল হল। ঢোক গিলে বলে, ও আমার মডেল নয়, বান্ধবী।

—ওর ন্যুড স্টাডির জন্যই তো পৃথক্ স্টুডিও-র প্রয়োজন? এর চেয়ে ভালো হত যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে জানিয়ে সেটা এখানেই করতে!

অগুস্ত্ একটু ক্ষুব্ধ হল। যেন ওর ব্যক্তিগত জীবনে লেকক্ অহেতুক নাক গলাচ্ছেন। কণ্ঠস্বরে সে স্ফোভের রেশ যথাসম্ভব গোপন করে বললে, নতুন স্টুডিওটা আমি ভাড়া করে ফেলোছি মেৎর। আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে দিন।

—তাই দেব। কিন্তু একটা কথা! তুমি কি ওর কথা তোমার মাকে বলেছ? তুমি কি...মানে, ওকে বিবাহ করতে প্রস্তুত?

এবার আর বিরক্তিটা চেপে রাখা অসম্ভব হল। বললে, আপনি আমার শিক্ষাগুরু; কিন্তু তাই বলে কাকে আমার জীবনসঙ্গিনী করব..

—জীবনসঙ্গিনী নয় অগুস্ত্, সহধর্মিণীর কথা বলছি আমি। ভিক্তর যুগো থেকে পারীর সব কটা ওঁছা শিম্পীরও এক একটি করে জীবনসঙ্গিনী আছে! কিন্তু হিসাব করে দেখ, সেখানে সম্পর্কটা শুধু টাকা-কড়ির। শিম্পী টাকা দেয়। মডেল নেয়। এখানে যে সেটা উষ্টে যাচ্ছে। মডেল দিচ্ছে, শিম্পী নিচ্ছে! এ বোঝা বইতে পারবে তো?

অগুস্ত্ নিঃশব্দে ডুপলিকেট চাবিটা ওঁর টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে প্রস্থানোদ্যত হয়। এবারেও দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাতে পিছন থেকে ডাক শুনল : শোন!

অগুস্ত্ ঘুরে দাঁড়ালো। লেকক্ বললেন, সেবারে আমার পরামর্শে কান দাওনি। বছরখানেক পরে নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে ফিরে এসেছিলেন। এবারেও আমার সং পরামর্শে তুমি কান দেবে না—আমি জানতাম। জেদী, একরোখা, ‘পিগ্-হেডেড্’ না হলে বিদ্রোহী শিম্পী হওয়াও যায় না। কিন্তু চাবিটা তোমার কাছেই থাক। তিন মাস পরে যখন ভাড়ার অভাবে বাড়ি-আলা তোমাকে খেঁদিয়ে দেবে...অবশ্য আমি স্টুডিওতে আছি দেখলে ঢুকবে না।

অগুস্ত্ আবার চাবিটা উঠিয়ে নিয়ে হাসল। বলল, কারণটা জানি মেৎর। যেহেতু আপনি কোনদিন আর আমার মুখদর্শন করবেন না।



অঘটনটা ঘটে গেল ‘ন্যুড-স্টাডি’র প্রথম সিটিং-এই। সেদিন রবিবার। মেরী রোজ এর ছুটি। বেশ গরম পড়েছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি ঝলমলে দিন। রোজ সময়মত হাজিরা দিল। সকাল

নয়টায়। অগুস্ত্ একতাল কাদা মাথছে। দেহাকৃতির অনুপাতে একটি ‘আর্মেচার’ বানানো হয়েছে। মডেল-স্ট্যাণ্ডের পাশেই পাদপীঠের উপর খাড়া করা আছে সেই লোহার খাঁচাটা—মূর্তির কক্ষাল। মেরী রোজ একটা গোলাপী রঙের গাউন পরেছে! এটাই ওর সবচেয়ে ভাল পোষাক। তীর ছুঁড়তে হলে ধনুকের ছিলাটা নিজের দিকে টানতে হয়। তাই বোধকরি ওর সেরা পোষাকটাই পরে এসেছে আজ। সোনালী চুলের খোঁপায় টকটকে লাল একটি গ্ল্যাডিওলাস্। অগুস্ত্ আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখল ওর সাজপোষাক। কোনও মন্তব্য করল না। আপন মনে কাদা মাথতে থাকে। রোজ স্টোভটা জ্বালে। রুটি সৈঁকে ডিমের ওমলেট বানায়। তারপর দু-পাঠ কর্ফি বানিয়ে নিয়ে আসে। বলে, ব্রেকফাস্ট সেরে কাজে বসা যাক। তাহলে একটানা অনেকক্ষণ কাজ করা যাবে। অগুস্ত্ হাত ধুয়ে ওর পাশে এসে বসে। জামাটা টান মেরে খুলে ফেলে। লোমশ বুকটা অনাবৃত করে আরাম পায়! আহারান্তে অগুস্ত্ বলে : খোল এবার।

একটা আঘাত লাগল।

স্থূলতায়!

কাল সারারাত এই মুহূর্তটির কথা চিন্তা করেছে। এর আগে আর কোনও ছেলের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়নি। অনেকেই হোঁকহোঁক করেছে, ওর রূপের প্রশংসা করেছে—কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে যে লালসা লক্ষ্য করেছে তাতে ঘনিষ্ঠ হবার ইচ্ছাই জাগেনি। তাই এই বিশেষ মুহূর্তটির কথা ও কাল সারারাত ভেবেছে। কীভাবে শতদল পদ্মের মতো পাপাড়ির পর পাপাড়ি মেলে সে অনাবৃত ভেনাস্-এ বৃপান্তরিত হবে। একটি মুগ্ধ তরুণের—শিম্পীর—চোখের সামনে উদ্ভাসিত করে দেবে তার সকল গোপন রহস্য। সেই সুখস্বপ্নের সঙ্গে ঐ স্থূল নির্দেশটা এক সুরে বাঁধা নয় যেন!

—রোজ উঠে দাঁড়ায়। ঘষাকাচের জানলাগুলোর ছিটকানি পরীক্ষা করে দেখে নেয় একবার। তারপর অগুস্ত্-এর সমুখে এসে বলে, তুমি ওঁদিকে ফিরে বস।

—কেন ? ওঁদিকে ফিরে বসতে যাব কেন ?

গর্জে ওঠে মেরী রোজ : যা বলছি, শোন !

অগুস্ত্ ঘাবড়ে যায় সে কণ্ঠস্বরে। বলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে।

সে পিছন ফিরে বসার পর মেরী-রোজ একটা-একটা করে খুলতে থাকে তার বহিরাবরণ। তার নিশ্বাস ঘন হয়ে আসে। জুতো-মোজা, গাউন, ব্লাউস, বক্ষবন্ধনী এবং অসীম-আয়াসে : নিম্নাঙ্গের অধোবাস। উঠে দাঁড়ায় স্ট্যাণ্ডে ! ডানহাতটা বুকের উপর, বাঁ-হাতটা নাভির নিচে। তার নগ্ন-স্বরূপকে আচ্ছাদনের একটা অহেতুকী প্রয়াস। বলে, এবার এঁদিকে ফিরতে পার।

অগুস্ত্ এঁদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। মেরী-রোজ চোখে দেখতে পায় না, আন্দাজ করে। কারণ নিজে সে চোখ দুটি বুঁজেছে।

পুরো এক-মিনিট সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার পর মেরী-রোজ ধীরে ধীরে চোখ দুটি খোলে। দেখে, অগুস্ত্ ইতিমধ্যে গিয়ে বসেছে তার ওয়ার্কটুলে। দ্রুতহস্তে সে স্কেচ্ করে চলেছে। একটা প্রশংসাসূচক উচ্চাসও শুনতে পেল না হতভাগী।

—ডান হাতটা সরাও।

অসীম আয়াসে সে ডান হাতখানা সরিয়ে পাশে রাখল। ওর অন্তরের কামনা-বাসনা যেন যুগল-উচ্ছ্বাসে বিকশিত হয়ে উঠল।

—মাথার অব্যবহৃত ফুন্টা গুঁজেছ কেন ? ওটা ফেলে দাও।

আপাদমস্তক ত্রাণা করে ওঠে : শিম্পী না ছাই ! ফুন্টা অহেতুক ! অনাবৃত্ত হবার পর এই ওর প্রথম কথা : না ! ওটা থাকবে।

একটু ভেবে নিয়ে অগুস্ত্ বলে, থাকবে ? বেশ থাক্। ‘মানে’ও তার ‘অলিম্পিয়া’র মাথায় লাল রিবন দিয়েছিল একটা।

‘মানে’ কে জানবার কৌতূহল হল। অলিম্পিয়াকেও কি সে এভাবে বলেছিল : ‘খোলো এবার’ ? অলিম্পিয়ার সঙ্গে যদি কখনও আলাপ হয় তাহলে ও জানতে চাইবে সেই ‘মানে’ কি

অন্তত একটা ‘বাঃ’ বলেনি ? নাকি ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটরের মতো শুধু বলেছিল : ডান হাতটা সরাও !

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। কারণ লক্ষ্য হল অগুস্ত্ এগিয়ে আসছে। ওর কাছে, আরও কাছে। স্পর্শ করল না কিন্তু। যেন দেবী প্রতিমাকে প্রদর্শন করছে, চারপাশে ঘুরে এল একবার।

তারপর এসে দাঁড়ালো ওর সামনে। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে। আবেশে রোজ-মেরীর চোখ দুটি নিজে থেকেই বুঁজে যায়। তাই ও টের পেল না অগুস্ত্ও দুটি চোখ বন্ধ করেছে এতক্ষণে। দুটি হাতের দশটা আঙুল এবার স্পর্শেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধরতে চাইছে অধরার অন্তর্লীন সত্যস্বরূপ। যা দৃষ্টি দিয়ে ধরা যায় না। মাথার উপর রাখল দুটি হাত ; সোনা-গলানো চুলে বিলি কাটতে কাটতে নেমে এল কাঁধে। দুটি সুঠাম বাহু বেয়ে আঙুলের ডগায়। আবার কণ্ঠ। যেন গলা টিপে মেরে ফেলতে চায় ওকে। সর্বসম্মুখে রোজ চোখ মেলল—দেখল অন্ধের দর্শনভীষণতা। কণ্ঠ থেকে এবার পরুষস্পর্শ নেমে এল বুকে। ওর হৃদয়ের যুগ্মউচ্ছ্বাসকে নিরাসক্তভাবে দু-হাতে তোল করল যেন। আশ্চর্য ! সে-দুটি যেন ঐ অনাবৃত্তার অনুভূতি-প্রবণ যোনাঙ্গ নয়।

স্তম্ভিত হয়ে গেল মেরী-রোজ। লোকটা পুরুষমানুষ তো ?

এবার পৃষ্ঠদেশ বেয়ে হাত দুটি নেমে এল নিতম্বের দিকে। ফলে আরও একটু ঘনিষ্ঠ হতে হল অগুস্ত্কে। তার ঘন নিশ্বাস পড়ল মেরী-রোজ-এর মুখে। তার রোমশ বক্ষ স্পর্শ করল ওর লজ্জা-রাগ, স্তন্যগ্রন্থি।

ইতঃ কোথা-নিহে-কী-যেন ঘটে গেল। খণ্ডমুহূর্তের অসংকল্পিত ! মেরী-রোজ ভারসাম্য হারালো। মনের এবং দেহের। পতনেন্দ্রিয় ভেদে কণ্ঠলগ্না হল এ্যাডমিনিস্ট্র-এর।

না ! এ্যাডমিনিস্ট্র নয় ! ধ্যানভঙ্গ হল যোগী-মহেশ্বরের !

মদন কিন্তু ভদ্র হল না। মরে বাঁচল মেরী-রোজ !

নিঃসন্দেহে অগুস্ত্ শুধু ভদ্র নয়। সে পুরুষ !

ই

CARYATID (1880) : ভারনত্ৰা :

বিড়লা আকাদেমির স্মারক পুস্তিকায় এ মূৰ্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে—“এটি আদিতে ‘নরকের দ্বার’ ভাস্কৰ্যের অনুসঙ্গ হিসাবে নিৰ্মিত হয়েছিল। 18৭3 সাল থেকে রোদ্যা এটিকে একটি পৃথক ভাস্কৰ্যরূপে প্রদৰ্শনের অনুমতি দেন। গ্রীক শিল্পের ‘ক্যারিয়াটিড্’ ছিল ভাবলেশ-হীন ভারবহ। তিনি এ অনুভাবনাটির আমূল পৰিবৰ্তন ঘটালেন। In order to depict the misfortunes that befall *human beings*, this sculpture was portrayed in a state of dejection, crushed by the mass of boulder as though imposed by her sorrowful fate” [‘মনুষ্যসমাজের স্বন্ধে যে অভিশাপ নেমে এসেছে তাকে মূৰ্তি করতে এই ভাস্কৰ্যে দেখা যাচ্ছে একটি শোকাহতা নারীকে ; যেন দুৰ্ভাগ্যের বোঝায় সে নিষ্পেষিতা’ — বিশেষভাবে চিহ্নিত শব্দ দুটি আমাদের আরোপিত।]

এ সমালোচনাও খুঁশি মনে মনে নেওয়া চলে না। আমাদের মৌল আপত্তি ঐ ‘human beings’ বা ‘মনুষ্যসমাজ’ শব্দ-গুলিতে। আমাদের মতে এ ভাস্কৰ্যের মৌল আবেদন গোটা মনুষ্যসমাজের অবক্ষয়ের সমবেদনায় নয়। কেন, তাই বোঝাবার চেষ্টা করছি।

গ্রীকস্থাপত্যের অভিধায় ‘ক্যারিয়াটিড্’ হচ্ছে রমণীর প্রস্তরমূৰ্তি, যে-নারিক সৌধের ঊর্ধ্বাংশের—‘এণ্টারেচার’-এর—ভার বহন করে। অজস্তা-ইলোৱায় এ দায়িত্ব বর্তাতে গন্ধৰ্বদের বৃষস্বন্ধে ; এবং লক্ষ্য করে দেখছি, তাদের মুখে ভারবাহী মানুষের যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। গ্রীসে কী-জান-কেন ঐ গুরুভার বহন করতে

রোদ্যা—৬

হত মেয়েদের। শুনছি, শব্দটা এসেছে গ্রীক শব্দ Karyatides থেকে।

—আদিযুগে ক্যারিয়াটিড্‌রা ছিল Caryae-তে অবস্থিত ‘ডায়ানা’ মন্দিরের মহিলা-পুরোহিত। মন্দিরের সব দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। ক্রমে তারা বিবর্তিত হল একজাতের নারীমূৰ্তিতে। ওরা প্রায়ই প্রচুর বস্ত্রাবৃত—ন্যুড নয়, এবং সমভঙ্গে দণ্ডায়মান। সবচেয়ে আশ্চৰ্যের কথা—গ্রীক ক্যারিয়াটিড্‌দের দেখে মনে হত তারা ভাবলেশহীনা—জগদ্বল ভারে তারা আদৌ ক্লান্ত নয়। বিশ্বশিল্পে ‘ক্যারিয়াটিড্’-দের শ্রেষ্ঠ নিদৰ্শন এথেন্সের Erechtheum। সেই মূৰ্তির সঙ্গে



চিত্র—11 : এথেন্স-এর Erechtheum-মন্দিরে ক্যারিয়াটিড্‌, গ্রীকশৈলী

রোদ্যার শিল্পীটি তুলনা করলে বোঝা যাবে ‘মেঘনাদবধে’ রামায়ণের কতখানি পরিবর্তন করা হল। প্রথম কথা : দু-হাজার বছরের নির্ধাতনে ক্লাস্ত মেয়েটি আর সমভঙ্গি দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে। তার সেই পোষাকের বাহার আর নেই, সে প্রায়-নাগ্নিকা। পূর্ণযৌবনাও সে নয় আর—পুরুষশাষিত এ সমাজ দু-হাজার বছর ধরে তাকে নিঙড়ে নিঃশেষ করেছে। সে যৌবনোত্তীর্ণ। স্তোকনম্রা নয়, তার পরিদৃশ্যমান বামনুটি প্রায় বিশুদ্ধ। কিন্তু এ শিল্পে স্বতই নজর কাড়ে একটি জিনিস : ঐ জগদ্বন্দ পাতকের বোঝাটা।



চিত্র—12 : Caryatid (1880) ভারনম্রা

আগেই বলেছি, রোদ্যা-শৈলীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাস্কর্যের অংশ বিশেষ অসমাপ্ত রেখে যাওয়া। সেই অসম্পূর্ণ অংশটিকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব দর্শকের। শিল্পী রসের পেয়ালা এগিয়ে দেবেন আর তুমি চোখ বুঁজে গলায় ঢেলে দেবে, তা চলবে না ; তোমাকেও মনে মনে ছোঁন-হাতুড়ি চালাতে হবে। শিল্পীর অনুভাবনায় ভাবিত হয়ে। কোন পথে তুমি চলবে তার ইঙ্গিত অবশ্য শিল্পী রেখে যাবেন।

একবার ভালো করে দেখুন তো ঐ অধ্বংসকীর্তি জগদ্বন্দ পাতরটাকে। যার ভারে ঐ হতভাগিনী নুস্পৃষ্ট। ওটা কি শুধুই একটা বোঝা ? নাকি পুরুষ মানুষের মাথা ?

স্কেচ-এ হয় তো আমার মানসিকতা অন্যান্যভাবে প্রভাবিত করবে আপনাদের দৃষ্টিকে। তার চেয়ে আলোকচিত্র ভালো। ক্যামেরার চোখে ভাস্কর্য অবশ্য ধরা পড়ে না—ভাস্কর্য ঘুরে-

ফিরে দেখার। তবু ক্যামেরার চোখ অব্জেক্টিভ ; সাবজেক্টিভ নয়। তাই গ্রন্থের সামনের দিকে একটি ফটো প্লেটও যুক্ত করে দিয়েছি। যদি ঐ জগদ্বন্দ পাতরে পুরুষ-মানুষের মাথাটা মনের চোখে খুঁজে পান তবে নিশ্চয় আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন : এ শিল্পে শিল্পীর দরদ human being-এর জন্য নয়—তার ‘বেটার-হাফ’-এর ‘ওয়ার্স’ দুর্ভাগ্যের প্রতিই রোদ্যা এখানে সংবেদনশীল।

ORPHEUS (1892) : অরফিউস্ :

কাহিনীটি সুপরিচিত। অরফিউস্ রাজপুত্র। স্বভাবকবি, সঙ্গীতপাগল। কবিপত্নী ইউরিডিস্ অকস্মাৎ সর্পাঘাতে হত হলেন। অরফিউস্ অরণ্যপর্বতে বীণা বাজিয়ে কঁদে কঁদে ফেরে। অরণ্যচারী পশুপক্ষীরা ছুটে আসে, আসে না শুধু একজন—যাকে ও খুঁজছে। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং যমরাজ পর্যন্ত আর সহিতে না পেরে ওর সামনে হাজির হয়ে বললেন, কবি, মৃত্যুরাজ্য থেকে তুমি ইউরিডিস্কে ফিরিয়ে আনতে পার ; কিন্তু একটি সর্ত আছে। পাতাল রাজ্য থেকে পৃথিবীতে ফেরার পথে তুমি চোখ খুলবে না। মৃত্যুরাজ্যের স্বরূপ মরমানুষকে দেখতে নেই।

অরফিউস্ তো এক কথায় রাজি—এ আর শক্ত কী ? কিন্তু হায়রে মানুষের মন ! মৃত্যুরাজ্যের রহস্য সম্বন্ধে কোঁতুলে নয়, দীর্ঘদিনের প্রিয়া-বিবাহের আকৃতিতে সে বিস্মৃত হল তার প্রতিশ্রুতির কথা। অরফিউস্-এর পিছন পিছন এতক্ষণ আসছিল ইউরিডিস্। হঠাৎ অরফিউস্-এর আশঙ্কা হল—কই পিছনে তো পদশব্দ শোনা যাচ্ছে না। দূরন্ত উৎকণ্ঠায় সে পিছন ফিরে তাকালে। আর তখনই ঘটল চরম সর্বনাশ। পাতালরাজ্যের অমোঘ আকর্ষণে তিল তিল করে ইউরিডিস্ তলিয়ে গেল মৃত্যু-গহবরে। অতলান্তিক অন্ধকার থেকে ভেসে এল শুধু একট অর্ধিত : আর দু-দণ্ড সবুর সহিল না ? এই করুণ কাহিনীটি নিয়ে সেই গ্রীক-যুগ থেকে অনেক শিল্পী শিল্প গড়েছেন। প্রসঙ্গত বলি, দার্শনিকজ্ঞানার ভিতর দেওয়ান-ই-আম-এ শাহজাহাঁর মননদের পিছনে আছে মুগল যুগের একটি অনবদ্য অরফিউস্ আলেক্সা। শিল্পী ফরাসী : অস্তিন দ্য বোর্ডো। এই সুপরিচিত গ্রীক উপকথাটি রোদ্যার ‘মেঘনাদবধে’ কীভাবে রূপায়িত হল তা প্রাধান্য করতে হলে এ ভাস্কর্যটিকে তুলনা করতে হবে ক্লাসিকাল গ্রীক অরফিউস্-

এর সঙ্গে। এখানে তাই একটি প্রখ্যাত গ্রীক ভাস্কর্যের নমুনা যুক্ত করা গেল।



চিত্র-13 : অরফিউস, ক্লাসিকাল গ্রীক শৈলী

বিড়লা আকাদেমির স্মারক-পুস্তিকায় ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে একটি মাত্র পংক্তি : “Orpheus is represented by Rodin without his muse, imploring the gods to give Eurydice back to him.”

এ ক্ষেত্রেও আমাদের মনে হয়েছে আবেদনটি Suppliant-এর নয়, মিনার্তিভিক্ষার্থীর নয়।

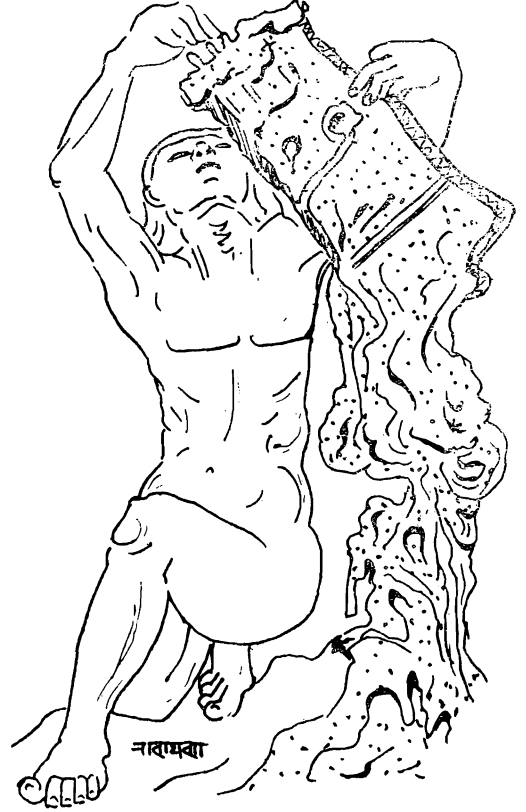
কেন তাই বলি :

এবারেও লক্ষ্য করে দেখুন—বীণা যন্ত্রটি যথেষ্ট যত্ন নিয়ে উৎকীর্ণ করা হয়নি। যে কথা বারে বারে বলেছি, পদনরুপিত দোষ সত্ত্বেও আবার তা বলতে হচ্ছে এখানে : বীণাযন্ত্রটির পাদপূরণের দায়িত্ব দর্শকের। যেমন ছিল—দানৈদ-এর কুস্ত্রপ্রতিম পাদপীঠ, ‘ক্যারিয়ার্টিড’-এর স্বল্পে জগদ্বল পাথরের বোঝা, ‘রোদ্যার হাত’-এ হাত-পা-মুণ্ডহীন নারীপদতুল। এখানে ঐ অসমাপ্ত বীণা যন্ত্রটি কী রূপ পরিগ্রহ করেছে? আমার তো মনে হল—একটা মোমবাতি যেন গলে গলে পড়ছে! বিরহানলের উত্তাপে নয়, অনুশোচনার আগুনে। বিরহের গান সে যখন গাইত তখন তার বীণাযন্ত্রটি ছিল অটুট। সপ-দংশনের দুর্ভাগ্যকে সে সঙ্গীতের যাদুতে পরাস্ত করিছিল। কিন্তু এখন সে লড়বে কার বিরুদ্ধে? এ যে তার স্বখাত-সলিল! এ তো দুর্ঘটনার্জনিত মৃত্যু নয়, এ যে স্বহস্তে হত্যা! প্রেমের

ঐকান্তিক আকৃতিই যে এখন রচনা করেছে তার প্রেমের সমাধি।

এ মূর্তিতে কী দেখিনি জানেন? ওর বাঁ-হাতের আঙুল-গুলো।

আপনি লক্ষ্য করেছিলেন? যে আঙুলটা বীণাযন্ত্রে ঝংকার তুলছে সেই বামহস্তের তর্জনীটা? করেননি? আমি করেছিলাম—তবু দেখতে পাইনি! দোষ আমার ব্যাপ্সা দৃষ্টির নয়। রোদ্যার।



চিত্র-14 : অরফিউস—রোদ্যাঁ (1892)

এজন্যও তোমার কলকাতায় আসার প্রয়োজন ছিল, মস্যুয়ে অগুস্ত-রোদ্যাঁ। এক শ বছর ধরে কোন্‌দিন কোন কলা-সমালোচক তোমার এতবড় ভ্রান্তিটার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি। বলেননি—তুমি ভুল করে অরফিউস-এর বাঁ-হাতে সাড়ে-তিনটে আঙুল গড়েছ। অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনী বাদে!

তোমার সেই শ্রাবকবৃন্দ—সেই পশ্চিমবঙ্গের শল্যচিকিৎসকবৃন্দ

—সেই যে ঝাঁরা ‘আগ্রাসী হস্তে’ তোমার ‘হিউম্যান এ্যানার্টিম-র’ জ্ঞান দেখে মুক্তকচ্ছ হয়ে বেলোঁছিলেন—‘যেন অমর্ত’, এবার তাঁরা নীরব কেন? এতবড় আপসাস্তিক এ্যানার্টিমিক্যাল ডিফেক্টটা কি তাঁদের নজরে পড়েনি?

ঐ কালিদাসী হেঁয়ালির ছন্দটাই, ‘নেই তাই পাচ্ছ’-টাই কিন্তু এ-মূর্তির সবচেয়ে বড় ব্যঙ্গনা। রসোত্তীর্ণ হবার ছাড়পত্র। অরফিউস্-এর চিরসাথী বীণাযন্ত্রটিই শুধু নয়, বীণার স্পর্শ-কাতর ঐ আঙুলগুলোও ক্ষয়িত হয়ে গেছে। অনুশোচনার

আগুনে গলে গলে পড়ছে আত্মদাহনরত মোমবার্তার মতো! বীণা তাই আর বাজছে না! ‘**Imploring the gods to give Eurydice back to him**’ এখন অতীত ইতিহাস। এখন অরফিউস্-এর সমস্ত দেহটাই নীরববীণায় রূপান্তরিত হয়ে নিঃশব্দে বাজছে। যন্ত্র ও যন্ত্রী, বাদ্য ও বাদক এখন অভেদাঙ্গ।

‘**Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter !**’



গ

অগুস্ত্ দীর্ঘদিন ধরে মাটি দিয়ে যে নগ্ননারীর মূর্তিটি গড়েছিল, যার প্লাস্টার-কাস্ট করানো যায়নি, নিঃসন্দেহে অর্থাভাবে—সেটি ভাবীকাল দেখেনি। একটি দুর্ঘটনায় সেটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। দুর্ঘটনা অর্থে—সে যখন বছর তিনেক পরে আর একটি স্টুডিও ভাড়া করে তার যাবতীয় ভাস্কর্য স্থানান্তরিত করছিল একটা ঠেলাগাড়িতে! সে ঠেলায় যারা কাঁধ দিয়েছিলেন তাঁদের সকলেই আপনাদের সুপরিচিত : মানে, মনে, দেগা, রেনোয়ঁ, মাতিস্।

অগুস্ত্ তার জীবনের প্রথম ন্যূড-মূর্তির নামকরণ করেছিল : *Bacchante*! বাঙলায় কী বল্বে? ‘ভেনাস্’ নয়, যে ‘উর্বশী’ বলা চলবে। ‘ব্যাক্চাস্’ হচ্ছেন প্রেমের দেবতা : মদনদেব। ফলে, ‘স্ট্রীয়াম্—একান্তে’—ব্যাক্চাস্তে = রতি! ওর জীবনের প্রথম অনাবৃত্ত নারীমূর্তির চিহ্নমাত্র নেই; কিন্তু তার প্রথম অনাবৃত্ত মডেলের—মাদ্রোয়াজেল লিজাকে বাদ দিয়ে বল্ছি—সৌভাগ্যে জুটল একটি স্থায়ী চিহ্ন।

বছরখানেক ধরে মেরী রোজ ক্রমাগত সিটিং দিয়েছে! নিজের হস্টেল ছেড়ে সে এসে পাকাপাকি আশ্রয় নিয়েছে স্টুডিওতে! অগুস্ত্ এখন ঐ স্টুডিওতে রাতিবাস করে। একটা ডব্ল্ বেড খাট, কিছু সস্তা আসবাব আর রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম কিনেছে। অগুস্ত্ তার বন্ধু-বান্ধবকে এই নতুন বান্ধবীর সংবাদটা জানায়নি। তার এই স্টুডিওর ঠিকানাটাও বলেনি কাউকে। রোজ কিছুটা ক্ষুধা। সে আশা করেছিল অগুস্ত্-এর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আলাপ হবে। বন্ধুর ফিয়ার্সের সঙ্গে যে-জাতের ফিস্ট-নিস্ট হয় সে-জাতের কোতুক-আলাপে কয়েকটি অলস সন্ধ্যা মুখর হয়ে উঠবে। সেসব কিছুই হল না! অগুস্ত্

আরব শেখ্-এর মতো বিবিজানকে পর্দানসীন করে রাখল।

কেন? অগুস্ত্ আধুনিকমনা! প্রাচীনপন্থার সঙ্গে তার শৈল্পিক এবং সামাজিক বিরোধ, তাহলে তার জীবনীতে এমন একটা বিরোধের আভাস পাচ্ছি কেন? আমাদের মনে হয়েছে তার হেতু দুজাতের :

এক . অগুস্ত্ মনে করেছিল—সুন্দরী মডেল নিয়ে শিল্পীদের মধ্যে মাঝে মাঝে রেশারেশি হয়। মডেলের অবস্থা তখন হয় ফ্রাঁসেস্কা দ্য রিমিনির মতো। কাকে সন্তুষ্ট করবে সে? নারীর মন স্বভাবতই একমুখী। অন্তত সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যবাহী বিবাহ-বন্ধনের প্রভাবে। কিন্তু পেশাদারী মডেলের উপর সে ঐতিহ্যের প্রভাব পড়ে না। ফুটে ওঠাতেই তার সার্থকতা—নিত্য নতুন ভ্রমরকে আকৃষ্ট করা তার স্বভাব-বিবুদ্ধ নয়। অগুস্ত্ চায়নি তার বান্ধবী মেরী-রোজ পেশাদারী মডেল হয়ে উঠুক। সে তাকে পুরোপুরি দখল করতে চেয়েছিল—একনায়কতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্যে। অগুস্ত্ যদি তাকে বিবাহ করত তাহলে অন্য কথা। বিবাহের একটা আলাদা মর্যাদা আছে। বন্ধুর বোঁকে নিয়ে কেউ কখনও প্রেম যে করেনি তা নয়, কিন্তু সেখানে প্রেমিক-সুগলকে নৈতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু সহ-শিল্পীর বাঁধা-মডেলকে নিয়ে দু-এক-রাত ফুর্তি-ফার্তা করায় সমসাময়িক পারী-সমাজের সকৌতুক গোপন সমর্থন ছিল। অগুস্ত্ তাই সাবধান হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝে নিয়েছিল—সহশিল্পীর জীবনের ঐ একটা দিক পরস্পরের কাছে গোপন থাকাই বাঞ্ছনীয়। গুস্তভ্ কর্ভের সেই বিশ্ববিখ্যাত তৈল-

চিঠাটির কথা মনে পড়ে ? ‘দ্য পেইন্টার’ স্টুডিও ? কবে
 চেয়ারে বসে একটি নিসর্গচিত্র আঁকছেন, তাঁর পায়ের কাছে
 একটি বিড়াল, সামনে একটি উধ্বমুখ বালক, পিছনে
 নগ্নিকা মডেল আর ঘরভর্তি কর্ভের বস্তু : মানে, মনে, কবি
 বদলেয়ার ইত্যাদি ? এমনই একটি কম্পোজিশানে অগুস্ত্
 প্রায় ধরা পড়েছিল। একবার এক বিশিষ্ট শিল্পীর
 স্টুডিওতে ঢুকতে গিয়ে ফিরে এসেছিল দোরগোড়া থেকে।
 পর্দা সরিয়ে সে দেখতে পায় স্টুডিওতে বেশ কয়েকটি
 পরিচিত মুখ। আর্টিস্ট তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন, তাঁর বন্ধুরা
 তন্ময় হয়ে ছবি আঁকা দেখছেন আর নগ্নিকা মডেল বিপরীত
 দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ অগুস্ত্কে
 নজর করেনি ! খণ্ড-মুহূর্তের জন্য পর্দা সরিয়েই সে স্তম্ভিত
 হয়ে যায়। চোরের মতো পালিয়ে বাঁচে !

অনাবৃত্তা মডেলকে সে চিনতে পেরেছিল : ক্লোতিল্ড !
 ওর বর্ডাদ !

সেই থেকে সে নিজেও কারও স্টুডিওতে যেত না, কাউকে
 আমন্ত্রণও করত না ওর স্টুডিওতে।

যে-কথা বলছিলাম। ব্যাক্যান্ডি নিশ্চয় ; মডেল পেল
 স্থায়ী চিত্র।

বহরখানেক পরের কথা। মেরী-রোজ-এর কদিন ধরে অরুচি
 হয়েছে। কিছুই মুখে রোচে না। তবু খালি-পেটেই রাগে
 উঠে বমি করল। হঠাৎ একটা দুরন্ত আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হয়ে
 গেল সে। শয্যার অপরাংশে অগুস্ত্ ঘুমাচ্ছে অঘোরে।
 রোজ-এর মনে পড়ল—মার্সাতিনেক হল ওর আকৈশোরের
 অভ্যস্ত জীবনচক্রে একটা মাসিক ছন্দপতনও ঘটেছে বটে।
 সারারাত দুশ্চিন্তায় তার ঘুম হল না। অগুস্ত্কে ডাকল না।
 ভোর হতেই সে ছুটল এক পরিচিত ভাস্করের কাছে।

ভাস্কারবাবু ওকে পরীক্ষা করে বললেন, আপন ঠিকই আন্দাজ
 করেছেন মাদাম...

—মাদাম নয়, মাদমোয়েজেল। আমার নাম মেরী-রোজ-বুয়ের।
 ভাস্কারবাবু একটু চিন্তা করে বলেন, দু-রকম ব্যবস্থাই সম্ভব।
 বলুন কী চান ?

শিউরে উঠল মেরী-রোজ : না, না, না ! সুস্থ-সবল
 সন্তানই চাই আমি।

—ওর পিতা কি আপনাকে বিবাহ করতে সম্মত হবেন ?

—সেটা অবাস্তব প্রশ্ন। আপনি আমার দায়িত্ব নিন্ ডক্টর।

অগুস্ত্কে বালি বালি করেও কথাটা বলা হয় না। সে কি
 খুশি হবে ? খুব সম্ভবত না। সে সংসার চায় না, সন্তান
 চায় না ; বোধকরি শয্যাসঙ্গিনীও—। না, এখানে ভুল হচ্ছে
 মেরী-রোজ-এর। সেটা সে চায়, নিবিড় করে চায়। গত
 এক বছরের অনেক-অনেক অভিজ্ঞতার কথা ওর মনে পড়ে।
 মূর্তি যখন গড়ে তখন সে অন্য মানুষ ; অন্য জগতের মানুষ।
 তখন অনাবৃত্তা মেরী-রোজ বুয়ের সঙ্গে অন্তর্সূর্য-উদ্ভাসিত
 কিউমিউলাস্ মেঘ, রবিন পার্থক্য বুকের লালিমা, তুষারাবৃত
 হৃদের শূদ্রতায় নববসন্ত-উদয়ভানুর প্রথম ‘থ’-য়ের থ-য়ে
 কোনও ফারাক নেই। সবই অতীন্দ্রিয় নন্দন-লোকের আনন্দের
 উপাদান। কিন্তু তারপর—মেরী-রোজ লক্ষ্য করেছে—শিল্পীর
 ধ্যানভঙ্গ হয় একসময়। ককুনের আবরণ ভেদ করে বৃপ-
 রসশব্দগন্ধস্পর্শময় পৃথিবীতে বেরিয়ে আসে প্রজাপতি।
 প্রজাপতির অমোঘ নির্দেশে। তখন সে শিল্পী নয়। তারুণ্যে
 ভরপুর অদম্য আদম।

অগুস্ত্ আজও মর্মর-স্বপ্নে মশগুল। আজও সে মার্বেল উৎকীর্ণ
 করেনি। কাদামাটিই ঘাঁটছে শুধু। অগুস্ত্ সংসার চায় না,
 সন্তান চায় না, চায় প্রকাণ্ড একখানা কারারা-মার্বেল। যাতে
 ‘ডোভিড’ বানানো যায় অথবা ‘ভেনাস্-ডি-মিলো’। অগুস্ত্
 যদি তাকে ভ্রূণহত্যা বাধ্য করে ? ও কী করবে ? ওর
 দেহের অভ্যস্তরে ঐ যে অপার বিস্ময়টা প্রাণপণ-প্রয়াসে
 প্রাণবন্ত হতে চাইছে তাকে রক্ষা করতে সে কি তাহলে
 অগুস্ত্কে ত্যাগ করে যাবে ? অসম্ভব ! এ জীবনে অগুস্ত্কে
 ত্যাগ করতে পারবে না। তাড়িয়ে দিলেও দোরগোড়ায় বসে
 থাকবে।

তবে কি অগুস্ত্কে ছাড়তে পারবে না বলে...না, না ! সেও
 অসম্ভব ! মা মেরী মূর্তির পদতলে নতজানু হয়ে বলে, তুমি
 আমাকে বলে দাও ! আমি কী করব ? তুমিও তো মা !

অরও মাসখানেক পরে একদিন রতিমন্দিরের পাদপীঠে
 ‘ব্যাক্যান্ডি’র ভূমিকায় উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই এভাবে
 অনাবৃত্তার সৌন্দর্য-পশরা নিয়ে তাকে কয়েকঘণ্টা মডেল-
 স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়াতে হয়। মূর্তিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।
 আর দু-এক মাসের মধ্যই সম্পূর্ণ হবে। অগুস্ত্ ওয়ার্কটুল
 ছেড়ে এগিয়ে আসে। ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। আপাদমস্তক
 একবার দেখে নিয়ে বলে, এদিকে বলছ অরুচি হয়েছে, খাচ্ছও
 না কিছু—কিন্তু পেটে এত চর্বি জমছে কোথা থেকে ?

অনাবৃত্ত নতুন করে লজ্জা পেল। মুখটা নীচু করে। কী লুকাবে ?

মাতৃ কি লুকাবার ?

অগুস্ত্ ওর তলপেটে হাত বুলিয়ে বলে, পেটটা অহেতুক ফুলিয়ে রেখেছ কেন, এ'য়া ? কী গড়িছ আমি ! ব্যাকান্তি, না এ্যানান্সিয়েশন্ ?

দু-হাতে মুখ ঢাকলো রোজ। সোনালী চুলে ভরা মাথাটা বাঁকিয়ে বললে, জানি না, আমি জানি না !

অগুস্ত্ চমকে ওঠে। দুটি চোখ বন্ধ করে। দু'হাতের দশটা আঙুল আলতো করে বুলোতে থাকে ওর তলপেটে। পর-মুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়ায় : ক মাস ?

—পাঁচ ! ডাক্তারবাবু বলেছেন—জানুয়ারীতে হবে।

অগুস্ত্ নিজেই এবার মডেল। প্রস্তুত-মূর্তি। মেরী রোজ সবলে আলিঙ্গন করে ধরে ওকে। ওর লোমশ বুক মুখটা লুকিয়ে বলে, অগুস্ত্ ! তুমি · তুমি খুশি হওনি ?

অগুস্ত্ ধীরে ধীরে ওকে বন্ধনমুক্ত করে। বলে, খুশি ! এটা কি আমি চেয়েছিলাম ? আমাদের দুজনেরই আহার জোটে না !

মেরী-রোজ আর পারে না। হাত বাড়িয়ে বিছানার চাদরটা টেনে নেয়। সর্বাঙ্গ ঢেকে বসে পড়ে শয্যার প্রান্তে ! অগুস্ত্ যে খুশি হবে না এটা আশঙ্কা ছিলই ! তবু—।

না, কাঁদবে না মেরী রোজ। কাঁদবে কেন ? মাতৃ কি অপরাধ ? সে তো বলেনি, ঐ অজাত সন্তানটির ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব তার মরদের ! সব দায়-বন্ধি তো সে নিজেই নিতে রাজি। ও তো আর কিছু চায়নি ! চেয়েছিল—যার সন্তানকে ও জঠরে ধারণ করেছে তার মুখে এক-চিলতে একটা আনন্দের আভাস। অগুস্ত্ খুশি হয়ে যে ওকে চুমায়-চুমায় দমবন্ধ করে দেবে না এটা জানা কথা। কিন্তু তাই বলে—

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অক্ষুটে বলে, তোমার মাকে সব কথা খুলে বলতে পারবে ?

—না, সে অসম্ভব ! তবে একজনকে তো বলতে তো হবেই ! তুমি একা একা ছোড়িদিটা থাকলে কোন ভাবনা ছিল না... আমি বরং থেরেস্-পিসিকে ডেকে আনি। ও সব জানে, সব বোঝা বইতে পারে।

মেরী রোজ লাফিয়ে উঠে পড়ে। জড়িয়ে ধরে অগুস্ত্কে

আবার ! বলে, তার মানে বাচ্চাটাকে পাব ? তুমিও খুশি ? অগুস্ত্ কেমন করে বোঝাবে সে আদৌ খুশি নয়। সে সন্তান একেবারেই চায়নি। কিন্তু তাই বলে একটা অসহায় প্রাণকে ...সে কি জানোয়ার ?



থেরেস-পিসি এসব ব্যাপারে ওয়াকিব্বাহল। সংবাদ পেয়েই ছুটে এল। রোজ-এর সঙ্গে একান্তে যখন পরামর্শ করল তখন অগুস্ত্কে ভিড়তে দিল না। বললে, তুই ভাগ ! এসব মেয়েলি ব্যাপারে পুরুষমানুষকে নাক গলাতে নেই। কাণ্ড যা বাধাবার তা তো বাধিয়েই বসে আছি। এখন আমাদের সামলাতে দে।

অনেকক্ষণ দুজনে পরামর্শ করে যখন পিসি বার হয়ে এল তখন অগুস্ত্ বলে, চল পিসি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সেস্ত্ মিশেল ব্যুলেভার্ড দিয়ে দুজনে যখন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে তখন থেরেস্ বলল, অগুস্ত্, বিশ-পঁচিশ বছর আগে এই সেস্ত্ মিশেল ব্যুলেভার্ডে তোকে নিয়ে যখন বেড়াতে আসতুম তখন তুই সবে হাঁটি হাঁটি পা-পা শিখিছ।

অগুস্ত্ জবাব দেয় না। বোঝে, কথাটা সত্যি। পিসি আবার বলে, ওকে বিয়ে করিছিস না কেন ?

—বিয়ে করার প্রণয় উঠছে না। ও আমার মডেল। আমার সঙ্গিনী। বান্ধবী।

—এবং বর্তমানে তোর সন্তানের আসন্ন-জননী। না কি সন্দেহ আছে তোর ?

—বিন্দুমাত্র না।

—তাহলে কী কারণে তুই ওকে বিয়ে করবি না ?

—আঃ ! কেমন করে তোমাকে বোঝাব পিসি ? ও জানে না—‘মোনালিজা’ কার আঁকা, জানে না—ডোভিড-পীতা-মোজেস্ কে গড়েছেন, বলতে পারবে না সিস্টিন্-চ্যাপেলে কী আছে ! ও কোনদিনই আমার সহধর্মিণী হতে পারবে না।

—তুই বলতে পারিস ‘ক্লশ্ স্টিচ্’-এ কীভাবে ও ফোঁড় তোলে ?

—তাই তো বলছি ও আর আমি ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ওর অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত নেই !

—তোর মায়ের আছে ?

—যুগ পাল্টে গেছে, পিসি !

—মায়ের কথা ছাড় ! তোর বাপের অক্ষর-পরিচয় আছে ?

অগুস্ত্ কথা ঘোরায : পিসি, তোমার তো তিন-তিনটি সন্তান হয়েছে। তাদের তো পিতৃপরিচয় নেই। তারা মানুষ হয়েছে, রোজগার করছে, বিয়ে-থা করে সংসারীও হয়েছে—

—জানি, জানি! সে-কথা তোকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। কিন্তু পিতৃপরিচয় না থাকায় তাদের যে কতটা যন্ত্রণা হয়েছে তা তুই কী বুঝবি? পিসির কাছে পিসের গল্পো!

অগুস্ত্ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, পিসি, একটা কথা বলি। নৈতিক কারণে যদি তোমার আপত্তি থাকে তো খোলাখুলি বল। আমি অন্য ব্যবস্থা দেখি!

থেরেস্ পিসিও দাঁড়িয়ে পড়েছে। বেদনার্ত হয়ে ওঠে তার মুখটা। সামলে নিয়ে বলে, এ-কথার জবাবে একটা কথাই বলা চলে অগুস্ত্ : দূর হয়ে যা তুই! আর কোনদিন তোর মুখদর্শন করব না! বলতুমও সে-কথা। কিন্তু ঐ আবাগী যে আমার মুখটা হাতচাপা দিয়ে রেখেছে! ওর পেটে যে শতদুরটা এসেছে তাকে সুভালাভালি খালাস করি, তারপর তোর সঙ্গে 'নৈতিক আপত্তি'-র বোঝাপড়া হবে!

—তাহলে একটা কথা পিসি। পাপা বা মাকে কিছু জানাতে পারবে না।

—জানি! বুড়ি পিসিকে হাতের কাছে পেয়েছি। সব বোঝা সেই বুড়ির কাঁধেই চাপিয়ে যা! জীবনভোর পরের বোঝা বইলুম। এ-ও সহিবে! তুই যে পুরুষ মানুষ। তায় নাকি আবার শিম্পী!

ডাক্তারবাবু বলেছেন, জানুয়ারী। প্রচণ্ড শীত সামনে। জ্বালানির জোগান চাই। উপাস করলেও প্রাণে বাঁচবে; কিন্তু ফায়ার-প্লেস্ না জ্বললে কক্ষালসার হয়েও বেঁচে থাকবে না। তাছাড়া মেরী-রোজ মাস দু-তিন রোজগার করবে না। 'সবেতন মোটার্ণিট-লীভ' শব্দগুলো তখনও ওঠেনি সামাজিক অস্ত্রধানে।

অগুস্ত্ দুচোখে অন্ধকার দেখল। থেরেস্ পিসি মূর্ত্ত্রী 'ক্যারিয়াটিড্'। উটের বোঝা ওর কাঁধে নির্বিবাদে চাপানো চলে; কিন্তু আর্থিক শাকের-আঁটির ভারটা ওর সহিবে না। এমনিতেই তার তিন-তিনটি সন্তানের তিন-তিন জন নাম-না-জানা পিতৃদেব ওর কাঁধে চাপিয়ে গিয়েছিল জগদল বোঝা— থেরেস্ পিসি হাঁটু ভেঙে সোঁদন বসে পড়েছিল। তার বেশবাস জীর্ণ। যৌবনোত্তীর্ণা অভাগিনীর বুকে জননীত্বের গঙ্গা-যমুনাও ধু ধু মরুভূমি!

: পিসি! ভগবান যদি দিন দেন, তবে তোমার একটা মূর্তি

গড়ব আমি। নাম দেব : ক্যারিয়াটিড্!

মনে মনে পিসিকে উদ্দেশ্য করে বলল অগুস্ত্। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। ভগবান 'দিন' দিলে। আপাতত ভগবান দিয়েছেন 'দুর্দিন'।

অগত্যা অগুস্ত্ এসে দাঁড়ালো অগতির গতি ওরেস্ লেককের স্ট্রুডিওতে।

আপনমনে একটা তেলরঙের ছবি আঁকছিলেন লেকক্! স্ট্রুডিওতে তিনি একাই। অগুস্ত্ নিঃশব্দে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল তাঁর পাশে! লেকক্ একবার চোখ তুলে দেখে ছবিতে মন দিলেন। না আবাহন, না বিসর্জন!

কী আঁকছেন উনি, নজর করল না অগুস্ত্। সে তখন অস্ফীট চমৎকারার শিকার। লেকক্ কিন্তু নজর করলেন যে, ও নজর করল না। মিনিট পাঁচেক কেউ কোন কথা বলে না। তারপর অগুস্ত্ সরাসরি নেমে এল কাজের কথায়—একটা বিপদে পড়েছি মেংর। একখানা সুপারিশ পত্র চাই। ছবি থেকে দৃষ্টি সরে এল না। প্যাঁলেটে তুলিটা বুলাতে বুলাতে পিছন ফিরেই লেকক্ বললেন, কোনও গাইনো-কলজিস্টের কাছে?

চড়াং করে রক্ত চড়ে গেল মাথায়! লোকটা শিম্পী না ছাই! আপাদমস্তক সংসারী! মাসখানেক আগেও মেরী রোজ বাজারে যেত—বুটি কিনতে, সবজি কিনতে। হয়তো পথে তাকে দেখেছেন উনি। নারীদেহের তরঙ্গভঙ্গে তিলমাত্র হের-ফের হলে ওঁর নজরে পড়বেই। হয়তো লেকক্ জেনে বসে আছেন, অগুস্ত্ কী জাতীয় বিপদে পড়েছে।

দাঁতে-দাঁত চেপে অগুস্ত্ বললে, না। কারিয়া-বলুজ-এর কাছে।

এতক্ষণে ঘুরে বসলেন লেকক্। অবাধ বিস্ময়ে বলেন, কারিয়া বলুজ! তুই জানিস সে কী জাতের কাজ করে? জানিস, ওর স্ট্রুডিওতে যারা কাজ করে তারা প্রস্তরশিম্পী নয়, ক্রীতদাস। মগজ খোলাই না করে ও কোনও কর্মীকে ছোঁন-হাতুড়ি ছুঁতে দেয় না।

—জানি মেংর! কিন্তু এ-ও জানি, সে মাহিনাটা ভালই দেয়। সে আপনার ছাত্র, আপনার সুপারিশে অনেকেই সেখানে দুটো ফ্রাঁর মুখ দেখছে!

লেকক্ বলেন, কারিয়া বলুজ যে আমার ছাত্র একথা মনে

হলে আমার লজ্জা হয়।

—অথচ সেই বোধকরি আপনার ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত।

—প্রতিষ্ঠিত নয়। রোজগেরে! সেখানে তোকে যেতে দেব না আমি!

—প্লীজ মেংর্! আমি দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছি! লেকক্ একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, তুই বলিছিলি ফাদার এইমার্ড তোকে ‘ডিভাইন কমিডি’ পড়তে বলিছিলেন। পড়েছিস্?

—হ্যাঁ। হঠাৎ সে-কথা কেন?

—দান্তে বর্ণনা করেছেন—নরকের প্রবেশদ্বারে লেখা আছে—
Abandon all hope, ye who enter here!—কারিয়া ব্লুজ-এর স্টুডিওটা যাতায়াতের পথে যখন দেখি আমি অদৃশ্য অক্ষরে ঐ বাণীটা দেখতে পাই—“এখানে মাথা গলাবার আগে সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আসতে হয়!”

অগুস্ত্ বলে, কিন্তু এ-কথা কেমন করে অস্বীকার করবেন মেংর্—সাধারণ মানুষ আপনার-আমার শিম্পকে গ্রহণ করছে না! অথচ ব্লুজ ফুলে ফেঁপে উঠছে।

—তাই তো হয় রে অগুস্ত্! দুধ-ওয়ালী বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধের বোতল পৌঁছে দেয়; আর শূঁড়ি জাঁকিয়ে বসে থাকে তার শূঁড়িখানায়! সবাই তার দোরের ধর্না দেয়।

অগুস্ত্ কিন্তু আজ নাছোড়বান্দা। সে জানায়—সব জেনে-বুঝে সে এসেছে সুপারিশপত্র চাইতে। এ একটা সাময়িক আত্মসমর্পণ। কারিয়া-ব্লুজ যদি সত্যি অগুস্ত্-এর মগজ ধোলাই করতে সক্ষম হয়, তবে ধরে নিতে হবে অগুস্ত্-এর মগজে ধোলাই হবার উপাদান ছিল।

লেকক্ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাগজ কলম টেনে নিলেন। সুপারিশপত্রটি ওকে লিখে দিলেন। অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে অগুস্ত্ যখন বিদায় চাইল তখন লেকক্ বললেন, এবার তুই বরং স্টুডিওর চাবিটা রেখে যা অগুস্ত্।

অগুস্ত্ চাবিটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলল, এর পর আমার মুখদর্শন করবেন কি না তা তো বললেন না মেংর্?

লেকক্ হাসলেন। হ্যান হারিস। প্রত্যুত্তরে বললেন, মুখদর্শন করব না কেন রে? রাম-শ্যাম-যদুর যখন মুখদর্শন করি তখন তোরও করব। এ জীবনে কয়েক হাজার ছাত্রই তো পার হয়ে গেল আমার হাত দিয়ে। তুই এবার তাদের একজন

হয়ে গেলি। কালে হয়তো সব চেয়ে ‘রোজগেরে’ শিম্প-ব্যবসায়ীও হয়ে উঠবি! চাবিটা চেয়ে রাখলুম অন্য কারণে। আবার নতুন করে পরশপাথর খুঁজতে হবে তো? নতুন কোনও ছাত্র,—যে আপোস করবে না, উপোস করবে।

অভিমান ব্ল্যাক্‌প্রিন্স গোলাপের মতো। কাঁটার উত্তরীয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে সে মুখটা কালো করে থাকে। তবু তা ফোটে যখন গোলাপচারি মাটির গভীর থেকে প্রাণরস টেনে নিতে পারে। সেই প্রাণরস হচ্ছে: প্রেম। ‘তোর মুখদর্শন করব না’ বাঁধা লজ্জা ছিল তেমনি মুখ-কালো-করা অভিমানের ব্ল্যাক্‌প্রিন্স। অগুস্ত্-এর মনে হল, আজ বোধ করি সে চারা গাছটা উপড়ে দিয়ে গেল!

মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সে।



জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে একটা পোর্টম্যান্টোতে জামা-কাপড় গুছিয়ে নিয়ে থেরেস্ পিসি স্টুডিওতে এসে হাজির। ঘরের মাঝামাঝি একটা পর্দা টাঙালো। এ পাশে অগুস্ত্ একা। না, একা নয়, সে পাশেই রইল তার স্বপ্ন: অসমাপ্ত ‘ব্যাক্সান্সি’। অপর পাশে মেরী-রোজকে নিয়ে পিসি শোয়। রাত-বিরতে ব্যথা উঠলে সামলাতে হবে তো?

জানুয়ারীর আঠারো তারিখে, আঠার শ’ ছেবটিতে ভোর রাতে জন্মগ্রহণ করল মেরী-রোজ এবং অগুস্ত্-এর প্রথম-তথা-একমাত্র সন্তান। অগুস্ত্-এর ঘুম ভেঙে গেল একটা চিল-চ্যাচানিতে। সারারাত পিসি একা-হাতে কী করেছে সে কিছুই জানে না! তাড়াতাড়ি পর্দার কাছে সরে এসে বলে, পিসি, ভিতরে আসব?

—না। সময় হলে ডাকব! তুই বরং মুখহাত ধুয়ে একটু গরম জল বসিয়ে দে।

আরও ঘণ্টাখানেক পর পিসি পর্দা সরিয়ে এ-পাশে এল! একগাল হেসে বলে, এবার এ-ঘরে আয়। ছেলেই হয়েছে। এক মাথা লাল চুল! রোদাঁ! তোর যেমন ছিল।

অগুস্ত্ পর্দা সরিয়ে এ-পাশে এল। মাতৃত্বের তৃপ্তি মেরী-রোজ-এর রক্তহীন মুখে। ওর কোল-ঘেঁষে ফুটফুটে একটা পুঁচকে। ঠিকই বলেছে পিসি—একমাথা লাল চুল!

অগুস্ত্ বাচ্চাটাকে দু-হাতে তুলে নিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে থাকে। ওর মনে হল সদ্যোজাত মানবশিশুর নাক-মুখ-চোখের প্রপোশান অন্য জাতের! প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মুখটা—সম্মুখদৃশ্যে—মস্তকের শীর্ষবিন্দু থেকে চিবুক-তক্ হচ্ছে দেহ-দৈর্ঘ্যের এক-অষ্টমাংশ। লেঅনাদেঁ তাই বলেছেন। এক্ষেত্রে এই মানবকের ..

পিসিসর ধমকে 'হিউম্যান-এ্যানার্টাম'র গবেষণা থেকে এক লহমায় ফিরে এল প্রসূতি-আগারে। পিসি বলে, তুই কী জংলী রে অগুস্ত্! ছেলে কোলে পেলে বউকে চুমু খেতে হয় তাও জানিস্ না?

অগুস্ত্ অপ্রস্তুত। এই মুহূর্তে ঐ 'বউ' কথাটায় প্রতিবাদ করতে মন সরল না। মেরী রোজ-এর দিকে ফিরে বললে, খুব যত্নগা হয়েছে, নয়?

মেরী রোজ মিষ্টি হেসে বলে, তোমার সামনে সিটিং দেবার চেয়ে কম।

অগুস্ত্ বুকে পড়ে ওর বিশীর্ণ ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেল। একটু বেলায় পিসি বলে, আমি এ দিকটা সামলাচ্ছি। তুই বরং বার্থ রেজিস্ট্রেশন অফিসে একবার যা। নাতির নাম আমি দেব। ওর নাম : ইউজীন-বুয়ে রোদ্যাঁ।

অগুস্ত্ ওভারকোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে বলে, না। ওর নাম অগুস্ত্ ইউজীন বুয়ে।

পিসি রীতিমতো মর্মান্বিত : মানে? ওর উপাধি রোদ্যাঁ নয়? অমন একমাথা লাল চুল সত্ত্বেও?

—পিতৃ হুতো আমি অস্বীকার করছি না পিসি। তাই নামের আগে 'অগুস্ত্' বসিয়েছি! কিন্তু মেরী-রোজ বুয়ে আমার বিবাহিত স্ত্রী নয়। বাচ্চাটা 'রোদ্যাঁ' হবে কেমন করে?

থেরেস্ বুখে ওঠে : না! তোকে নাম লেখাতে যেতে হবে না। তুই এখানে থাক। আমিই যাব। তোর নাম আমি লিখেছি খাতায়, তোর ছেলের নামও লিখব।

—তা হয় না পিসি। পাপা রোদ্যাঁর অক্ষর পরিচয় ছিল না, তাই তুমি লিখেছিলেন, ছেলের নাম বাপকেই লিখতে হয়। যেন এই সহজ কথাটা জানে না পিসি। পাঁচশ বছর আগেকার একটি দিনের কথা তার মনে পড়ে গেল। এক-কলম লিখে দেবার মজুরি সে দাবী করেছিল—যাতে তার নাতির নাম তার ভাইপো নিজে হাতে লিখতে পারে, অগুস্ত্ সে সব কথা জানে না। সে সেদিন ঐ পঞ্চকেটার মতো একমাথা লালচুল

সমেত অসহায় পিট্‌পিট্‌-দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু এই কি তার পুরস্কার? অসহায়ভাবে সে তাকিয়ে দেখল সদ্য-জননীর দিকে। দেখল, তার দু-চোখে জল টলটল করছে। অক্ষুটে সে বললে, ওকে বাধা দিও না পিসি। আমি তো সত্যিই ওর বউ নই। আমি ওর পুতুল, মডেল! ও আমাকে ভালবাসে না!

অগুস্ত্ রওনা হয় পড়েছিল। কথাটা কানে যেতে সে দ্বার প্রান্তে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, ভুল বললে রোজ! 'ভালোবাসা' শব্দটা আলেকজান্দার দুমা'র উপন্যাসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, ভিক্তর য্যুগো তার যে সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন আমি তা মানি না। আমি 'জোলা'-র ভালোবাসাকে জানি, বোদলেয়ারের ভালোবাসাকে মানি। তোমাকেও সেভাবেই ভালোবাসি, রোজ!

পিসি বিহ্বলভাবে বলে, তার মানে?

মেরী রোজ শব্দরভাষ্য দাঁখল করে, ও গ্রীক বলছে পিসি! না-বুঝেই ওটা মেনে নেওয়া হচ্ছে নিয়ম। ঐ ভাষাতেও নিত্য আমার সঙ্গে প্রেম করে তো; আমি জানি।

অগুস্ত্ আজকাল বাধ্য হয়ে রাত জেগে কাজ করে স্টুডিওতে। দিনের বেলায় সে কারিয়া ব্লুজ-এর ক্রীতদাস। লেকক্-এর মতে—অগুস্ত্-এর মতেও, সেটা শৈম্পিক বেশ্যাবৃত্তি। অধীনস্থ কর্মচারীদের স্বকীয়তা বলে সেখানে কিছু নেই। ক্রমাগত একই ছাঁচে, একই ঢঙে পুতুল গড়তে হয়। অধিকাংশই মিনিয়চার ন্যুড। নারী হলে, তারা ডানা-কাটা পরী—বিবস্ত্রা এ্যাজেল। তারা মানবী নয়, স্বর্গীয়; ফলে যৌনতার বাস্প-মাত্র নেই। জর্জনের চোখবোঁজা ভেনাস-এর চেয়েও আলুনি। পুরুষ হলে মনে হয়—ওরা জীবনে কখনও ব্যায়াম করেনি, নারী হতে-হতে তারা পুরুষ হয়ে গেছে। অথবা নপুংসক। অথচ অর্থবন বিনাসী পারীসিন মহলে এ-জাতের পুতুল-মূর্তির তখন দাবুণ চাহিদা। বাড়িতে, বাগানবাড়িতে, বাগানে, ফোরার ধরে, সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে, কিয়স্কে—সর্বত্র ঐ পুতুলের ছড়াছড়ি। চাহিদা মেটাতে ইদানীং ছাঁচে ফেলে ডজন-ডজন বানাতে হচ্ছে। কারিয়া ব্লুজ মধ্যবয়সী, দীর্ঘা নেয়াপাতি ভুঁড়ি হয়েছে। নিজে আর হেঁদা-হাতুড়ি ধরে না। হিসাব দেখে, হাজিরা রাখে, অর্ডার সংগ্রহ করে, টাকা আদায় করে। বড় জোর ছবি একে নতুন নতুন নারী পুতুল অথবা নপুংসক-

পুতুলের নমুনা ছকে। অগুস্ত্, এবং ওর মতো আরও দশ-
পনেরজন হতভাগ্য সেগুলি বানায়।

কিন্তু গুরু লেকক্-এর কাছে সে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে—তার
মগজ ধোলাই সে হতে দেবে না। তাই দিনভর খাটুনির পর
রাতভর সে স্টুডিওতে কাজ করে। ‘ব্যাক্তান্তি’ এখনও
শেষ হয়নি।

মাসখানেক পর মেরী-রোজ আবার মডেল স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়বার
দৈহিক ক্ষমতা ফিরে পেল। টরসোটো যে ইতিপূর্বেই শেষ
হয়েছে এই বাঁচোয়া, নাহলে বিপদে পড়তে হত। মেরী-রোজ-
এর শুনদ্বয় এখন মাতৃহরসে টাইটসুর; শুনবৃন্তের প্রভূত
পরিবর্তন হয়ে গেছে। মধ্যদেশ এখন আর ‘রতি’-র নয়,
গণেশজননীর! মুখেও এসেছে পরিবর্তন; অনাঘ্রাতা
কুমারীত্বের পেলবতার উপরে উঠেছে জননীত্বের অবগুষ্ঠণ।
উপায় কি?

কিন্তু কাজ করবার কি কোনও সুযোগ আছে? পঞ্চকেটা
লেগেছে পিছনে। দিনভর টানা ঘুমাতে, আর রাত ভোর
টানা চিল্লাবে! বিশেষ মা যদি মডেল-স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়ায়।
মেরী-রোজ একটা সহজ সমাধান দাখিল করেছিল; তাতে
তাকে মারতে বাকি রেখেছে অগুস্ত্। ‘ছেলে-কোলে-ব্যাক্তান্তি’!
তার চেয়ে আত্মহত্যা করা সহজ।

হৃদয়খানেক পর প্রস্তাবটা পেশ করল অগুস্ত্। বাচ্চাটাকে
বরণ রেখে আসা যাক পাপা রোদ্যার সংসারে; মায়ের
হেপাজতে।

রোজ আঁৎকে ওঠে: কী বলছ পাগলের মতো! ও যে বুকের
দুধ খায় এখনও।

—এবার থেকে থাকে না। অনেক মা-মরা বাচ্চা এ বয়সে
গরুর দুধ খায়।

—কিন্তু ওর মা যে মরেনি অগুস্ত্! তাছাড়া ওঁরা তো কিছই
জানেন না।

—এবার জানবেন। এখনও বুকের দুধ খাওয়ালে দুদিনেই
তোমার যা হাল হবে তাতে আমাকে অন্য মডেল খুঁজতে
হবে!

মেরী রোজ ফুঁপিয়ে উঠে। বাচ্চাটোও সুযোগ বুঝে পৌঁ ধরে।
পিসি কিন্তু এবার অগুস্ত্-এর দিকে চলল। মেরী রোজকে
আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, তুই রাজি হয়ে যা। ভেবে দেখ।
তোর বুকের ‘শেপ’ খারাপ হয়ে গেলে ও অন্য মডেল খুঁজবে।

পারীতে কি নেকীর অভাব, ওরা পথে ঘাটে ঘুরঘুর করে।
তাছাড়া পাপা রোদ্য আর মারিয়া যদি পঞ্চকেটাকে মেনে নেয়
তাহলে তোঁর পথটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

—পথ! কী পথ?

—তুই কী হাবা রে, রোজ! অগুস্ত্কে একদিন তোকে
বে-করতে হবে না? চিরটাকাল কি আমার মতো খুবড়ি হয়ে
জগদল বোঝা বয়ে বেড়াবি?

অনেক কষ্টে চোখের জলকে আঁটকে রাখে রোজ ব্যুরে।



নির্দিষ্ট দিনে অগুস্ত্ এল বাপ-মায়ের সঙ্গে
দেখা করতে। উপযুক্ত ছেলে ঘরে ফিরছে!
সঙ্গে তার অবিবাহিতা মডেল এবং তার কোলে
অবৈধ সন্তান! থেরেস্ পিসি আগেভাগেই
সব জানিয়ে রেখেছে। পাপা রোদ্যার মেজাজের
কথা অগুস্ত্-এর কাছ থেকে রোজ আগেই
শুনেছিল। কীভাবে মুহূর্ত মধ্যে সে ক্রোতিলুদকে তাড়িয়ে
দেয় বাড়ি থেকে। অপমান অনিবার্য! কিন্তু কী করবে
বেচারি? অগুস্ত্-এর আদেশ চিরকাল মেনে এসেছে, আজও
মানছে। ছেলে-কোলে অপমানিত হতে যেচে এসে হাজির।
কলিং-বেলের ঘণ্টা বাজাতে পিসিই এসে দরজা খুলে দিল।
বললে, আয়।

রাস্তার সমতল থেকে একতলা বাড়ির মেজের উঠতে তিনটি
ধাপ। কিন্তু উচ্চতাটা যেন ম’ র্না-র। তিনটি ধাপ অতিক্রম
করতে রোজ-এর সর্বশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। যেন আসামী
উঠে দাঁড়াচ্ছে কাঠগড়ায়। না! অপরাধী উঠে দাঁড়াচ্ছে
ফাঁসির মধ্যে।

মা মারিয়া সবার আগে দেখতে পেল। ছুটে এসে পঞ্চকেটাকে
ছিনিয়ে নিল ওর কোল থেকে। বললে: ও মা! কী সুন্দর
ফুটফুটে হয়েছে দেখতে! দেখ, দেখ, নাকটা ঠিক অগুস্ত্-এর
মতো।

পাপা রোদ্য ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল। বললে, নাকটা ঠিক
অগুস্ত্-এর মতো হতে পারে, কিন্তু কান দুটো ছুবছু পাপা
রোদ্যার মতো!

—মোটাই না! তোমার কান তো চ্যাপটা! ওর কান
খরগোশের মত খাড়া!

—আমার কান চ্যাপটা? বললেই হল?

দুজনে খামোকা ঝগড়া শুরু করে দিল।

মেরী-রোজ দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। আশ্চর্য! তার উপস্থিতিতে এরা পাতাই দিচ্ছে না একেবারে। অগুস্ত বললে, দরজাটা বন্ধ করে দাও রোজ; হিমেল হাওয়া ঢুকছে। বুড়ো-বুড়ির এতক্ষণে খেয়াল হল। পাপা রোদ্যাঁ ছেলেকে ধমক দেয়, ও কেন দেবে? তুই উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে পারিস্ না। দিন-রাত্তির ওর উপর হুকুম চালাস্ বুঝি?

মা বললে, হবে না? বাপ্‌কো বেটা! গতর নড়াতে যাবে কোন্‌ দুঃখে!

পাপা রোদ্যাঁ আবার মারিয়ার দিকে ফিরে বলে, আমি তোমার উপর হুকুম চালাই? কোন সুস্থান্দির-পো বলে?

মারী-রোজ ততক্ষণে দরজাটা বন্ধ করেছে। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। পিসি ধমক দেয় বুড়ো-বুড়িকে: তোমরা ঝগড়াটা আপাতত থামাবে?

পাপা রোদ্যাঁ বলল, সে-কথা বোঝাও মারিয়াকে। তারপর হঠাৎ রোজ ব্যুরের উপর দরদ উথলে উঠল ওর। বললে, এস, এস মা; ফায়ার-প্লেসের দিকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস। তোমার নাম তো রোজ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ।

—পাপা! আমাকে ‘পাপা’ বলে ডাকবে।

—ধন্যবাদ পাপা।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল। পাপা রোদ্যাঁ এবার অক্রমণ করে বসে অগুস্তকে। বলে, শোন অগুস্ত। ও শুষু তোর ছেলে নয়, ও আমার নাতিও বটে! অনেক দুঃখ নিরুইহিস্। আর নয়! এভাবে আমাদের বুড়ো বয়সে বসন্ত করতে পারবি না। পুঁচকেটা এ বাড়িতেই থাকবে। ছেলে মানুষ করার তুই কি জানিস্, এ্যা? আর রোজ-এর শরীর এখনও দুর্বল। অত ধকল ওই বা সইবে কেমন করে? আর দূরত্বও তো এমন কিছু নয়।

অগুস্ত বুঝতে পারে, থেরেস্-পিসি আগে ভাগেই সব বলে রেখেছে। অগুস্তকে প্রস্তাবটা পেশ করতে দেবে না বলে পাপা রোদ্যাঁ শুরুর্তেই আক্রমণাত্মক অসিচালনায় অবতীর্ণ হয়েছে। মনে মনে সে খুশি হল। বললে, সে আর এমন বেশি কি কথা?

মারিয়া মেরী-রোজ-এর দিকে ফিরে বললে, অগুস্ত তো সাত-

সকালে উঠেই কাজে বোঁরিয়ে যায়। তখন তুমি বরং এ-বাড়িতে চলে এস। দুপুরে এখানেই লাগু সেরে সন্ধ্যায় স্টুডিঙতে ফিরে যেও। রাতে বাচ্চাটা আমার কাছে থাকবে। কেমন?

মেরী-রোজ অগুস্ত-এর দিকে তাকায়: কী জবাব দেবে ভেবে পায় না।

অগুস্ত অবশ্য এটাই চায়। কিন্তু এককথায় রাজি হয়ে যাওয়া ভাল দেখায় না। একটু ইতস্তত করে বলে, রোজ-রোজ তা কি সম্ভব?

মা বলে, কেন নয়? দৈনিক বাচ্চাটাকে একবার চোখের দেখা না দেখলে ওর মায়ের প্রাণ মানুষে কেন?

পাছে অগুস্ত আবার আপত্তি তোলে তাই রোজ আগ্‌বাড়িয়ে বলে, থ্যাঙ্কু, মাদাম রোদ্যাঁ—

—মাম্মি! তোমার সঙ্গে কি আমার ভদ্রতার সম্পর্ক? তুমি হলে গিয়ে আমার একমাত্র ব্যাটার-বোঁ!

ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল মেরী-রোজ। সে জানে, ওঁরা জানেন — সে তা নয়!

ধমক ওঠে পাপা রোদ্যাঁ: এ্যাঁই দ্যাখ! কান্না কিসের? কান্নার কথা আসে কোথেকে? তোমাকে প্রথমদিনই একটা কথা বলে রাখছি বোঁমা, এ বাড়িতে চোখের জল ফেলা নিষেধ! কান্নার ঘড়াটা কাঁকালে নিয়ে যোঁদিন থেকে সে হতভাগী...

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বাকিটা পাপা রোদ্যাঁ শেষ করতে পারে না। থেরেস্-পিসির তোবড়ানো গালও তখন ভেসে যাচ্ছে অশ্রুর বন্যায়। সে বলে ওঠে, ভুল, ভুল বলছ পাপা রোদ্যাঁ। অজ্ঞ আমরা দুঃখে কাঁদছি না। কাঁদছি আনন্দে। ছোট খুকী থাকলে অজ্ঞের দিনে সেও তার কাঁকালের ঘড়াটা উবুড় করে দিত আনন্দে।



বহর-তনেক কারিয়া-বলুজ-এর পুতুল তৈরির কারখানার উদ্যান্ত খেটেছে অগুস্ত। কিন্তু জেনী একরোখা মানুষটা তার গোঁ ছাড়েনি। তার মগজ সে খোলাই হতে দেবে না। রাতের বেলা তাই বাতি জ্বলে একলবোর সাধনায় মেতেছে। ছুটির দিনে স্বেচ্ছ করতে বের হয়—

আউট-ডোর স্বেচ্ছ। বারে-বারে দেখা ক্লাসিকাল মূর্তিগুলোকে

আবার দেখে, আবার স্কেচ করে—পালে রয়্যালের বাঁগচায়, লাক্সেমবুর্গ-প্রাসাদে, একোল দ্য ব্যো-আৎ-স্-এর বাগানে, ল্যুভারে। ফিডিয়াস্-পলিক্রিটাস্-এর এ্যাপোলো, এ্যাস্কুই-লিন-ক্লিডিয়ান ভেনাস্, প্র্যাক্সিটেলিস্-এর ডায়না, ডিস্-কোবোলাস্, লাকুন-গ্রুপ্।

লেকক্-এর স্টুডিওতে কিন্তু আর সে পদার্পণ করেনি। যত দিন না সে প্রমাণ দিতে পারবে যে, সে রাম-শ্যাম-যদু নয়, ততদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে না!

তারপর আঠার শ সত্তর সালে লুই তৃতীয় নেপলিয়ন্—এতদিনে তিনি পুরোপুরি ফরাসী সম্রাট হয়ে উঠেছেন—করে বসলেন একটা আম্প্‌সান্তক মুখামি। প্রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। প্রুশিয়া বা জার্মানী আক্রমণ করে বসল ফ্রান্স। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল সারা দেশে। সকলেই আশা করেছিল সুশিক্ষিত ঐতিহ্যবান ফ্রান্সের কাছে অনতি-বিলম্বেই বর্বর প্রুশিয়া নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। হুঁ হুঁ বাবা! খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে, খুঁড়োর জোরে লুই। তৃতীয় নেপোল দধিভক্ষণ অনিবার্য, কারণ তার ধমনীতে বইছে স্বয়ং নেপোলিয়ঁ বোনাপার্টের রক্ত। বাস্তবে কিন্তু ঘটনাটা এবার ঘটল অন্যরকম। জার্মান বাহিনী অচিরেই উপনীত হল পারীতে। অত্যন্ত অসম্মানজনক সাক্ষী স্বীকার করে তৃতীয় নেপোলিয়ঁ আপাতত গদি বাঁচালেন। সেদিন পারীর অবস্থাটা ছিল রোদাঁয়ার সেই ‘আগ্লাসী হাত’-এর সম্মুখে নতজানু বিন্দিনীর মতো।

অগুস্ত্‌কে যুদ্ধে যোগদান করতে হয়েছিল। কর্পোরাল হিসাবে। রিজার্ভ-ফোর্স-এ লেফট্-রাইট করতে হয়েছে। বিনা জুতোয় বরফের উপর লেফট্-রাইট করতে করতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সম্মুখ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবার আগেই হার স্বীকার করল ফ্রান্স।

মেরী রোজ এখন পাপার সংসারে থাকে। ক্লোতিল্‌দ্ আর মেরীর শূন্যস্থানটা পূরণ করেছে সে। স্টুডিও তালাবন্ধ। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অগুস্ত্‌ দেখল তার স্টুডিও অক্ষত আছে। প্রাণ দিয়ে মূর্তিগুলিকে আগলেছে মেরী রোজ বর্বর প্রুশিয়ান সৈনিকদের হাত থেকে।

যুদ্ধোত্তর পারীতে ফিরে এসে আবার বেকার। খোঁজ নিয়ে জানল কারিয়া ব্লুজ চোখোস ছেলে। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার আগেই সে তার স্টুডিও গুটিয়ে নিয়ে বেলজিয়ামে

পারীয়ে গেছে। পারীতে তখন কাজ যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব। ইন্‌ফ্লেশান চরমে উঠেছে। অবশ্য পরের সপ্তাহেই অগুস্ত্‌ একটি চিঠি পেল ব্রাসেল্‌স্‌ থেকে। কারিয়া-ব্লুজ জানিয়েছে—ব্রাসেল্‌স্‌-এ সে জাঁকিয়ে ব্যবসা ফেঁদেছে। অগুস্ত্‌ যদি ইচ্ছে করে তাহলে সেখানে গিয়ে একই বেতনে ওর কারখানায় যোগ দিতে পারে।

উপায় নেই। অগুস্ত্‌ রাজি হয়ে গেল। পাপা রোদাঁ বলল, কদিন থাকবি?

—কে জানে! কয়েক মাস তো বটেই।

মারিয়া বলে, মাঝে মাঝে চিঠি লিখিস্‌। রোজকে। থেরেস্‌ পড়ে দেবে। সে-ই জবাব দেবে।

যাবার আগে লেকক্-এর কাছে একবার গিয়ে দেখা করবার দুরস্ত বাসনা হল। তারপর সে মত পরিবর্তন করল। রাম, শ্যাম, যদু তো নিতাই দেখা করছে তাঁর সঙ্গে।

যাত্রার আগে মেরী রোজকে ডেকে বলল, তুমি এ সংসারের দেখভাল কর। সাধ্যমতো টাকা কড়ি যা পারব পাঠাবো। আর আমার মূর্তিগুলো...

—জানি! দেহটাই ব্রাসেল্‌স্‌ যাচ্ছে। তোমার প্রাণটা পড়ে রইল স্টুডিওতে। ভয় নেই। যদিদিন আমি বেঁচে আছি, কেউ ওতে হাত দেবে না।

—যাই তাহলে?

মেরী রোজ বলবনা বলবনা করতে করতেই বলে ফেলল কথটা : ওখানে তুমি মডেল পাবে কেমন করে?

—কেমন করে আবার? সবাই যেভাবে পায়! ব্রাসেল্‌স্‌-এ সুন্দরী মডেল পাওয়া যাবে না কে বলল তোমায়?

মেরী রোজ ম্লান হয়ে গেল! দু-চোখ ছাঁপিয়ে জল এসে যায় তার।

অগুস্ত্‌ বলে, কিন্তু এখন মডেল পোষার পয়সা কোথায় আমার? দু-দুটো এস্ট্যাবলিস্‌মেন্ট হয়ে গেল তো? নিজের গ্রাসাচ্ছাদন, তোমাদের খরচ! মা-মেরীর কাছে প্রার্থনা কর, যেন দাঁড়াতে পারি।

তা কেমন করে করবে মেরী রোজ? দু-পায়ে দাঁড়াতে পারলেই তো অগুস্ত্‌ নতুন ময়না পুষবে! কিন্তু তাই বলে ও কি প্রার্থনা করতে পারে যে, অগুস্ত্‌ ঘাড় গুঁজড়ে পড়ুক!

মা মেরী! তুমি বলে দাও! ও কী প্রার্থনা করবে!



১৮৭০ থেকে ১৮৭৭, প্রায় সাত বছরের
প্রবাস জীবন। মূল ঘাঁটি ছিল
বেলজিয়ামে, ব্রাসেল্‌স্-এ। প্রথমে মজদুরি
করত কারিগর-ব্লুজ-এর কারখানায়,
পরে ভ্যা রাশবুর্গের সঙ্গে পার্টনারশিপে।
ব্রাসেল্‌স্ থেকে ঐ সময়ে একবার সে যায়

আম্‌স্টার্ডামে। রেমব্রান্টকে চিনে নিতে। আর একবার
ইতালিতে—তুরিন, জেনোয়া, পীসা, ফ্লোরেন্স এবং রোম! এই
সাত বছরের দীর্ঘ ইতিহাসটা সংক্ষেপে এবার জেনে নেওয়া
যাক!

অগুস্ত্ ব্রাসেল্‌স্-এ এসে যে এক-কামরার ঘরখানা ভাড়া
করেছিল সেটা সহরের প্রায় মাঝামাঝি, কারিগর-ব্লুজের
কারখানার কাছাকাছি বু দু পোঁ নুকে। প্রথম দর্শনে
ব্রাসেল্‌স্কে তার ভাল লাগেনি; পরেও নয়। ব্রাসেল্‌স্ যেন
পারীর এক ব্যর্থ অনুকরণ।

১৮৭১ সালে ফ্রান্সে বেধে গেল আবার এক গৃহযুদ্ধ। প্রুশিয়ার
কাছে পরাজিত নিষ্পেষিত ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ—কারখানার
শ্রমিক, কেরানি, দিনমজুর, দোকানদারেরা একটা ছোটখাটো
বিপ্লবের মাধ্যমে দখল করল পারীর শাসন কর্তৃত্ব। অনেকটা
সেই ঐতিহাসিক ১৭৭৩-এর বিপ্লবের মতো—তবে অনেক ক্ষুদ্র
সংস্করণ! এ বিপ্লবের ফসল ওরা বেশিদিন ভোগ করতে
পারেনি। রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা—ভার্সাই বাহিনী—যারা
প্রুশিয়ার সৈনিকদের কাছে মার খেয়ে সম্প্রতি নতজানু হয়েছিল
তারা এবার বীরবিক্রমে বিদ্রোহ দমন করল। প্রুশিয়ান সৈন্য-
দলকে যেভাবে কচুকাটা করবে ভেবেছিল, ক্ষমতায় কুলায়নি,
এবার সেইভাবে ঐ নিরস্ত্র সাধারণ বিদ্রোহীদের কচুকাটা
করল। ক্ষিপ্তের আলায় যারা মরিয়া হয়ে দল বেঁধেছিল
তারা এবার প্রাণ দিল বন্দুকের গুলিতে।

অগুস্ত্ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাড়ির কোন চিঠি নেই। উড়ে
খবর পেল—ওদের এলাকায় রক্তস্রব বয়ে গেছে! অগুস্ত্
তার মালিককে বলে, সে পারীতে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু
যাব বললেই তো যাওয়া যায় না। পাথের কোথায়?
তাছাড়া পারী শহর নাকি রাজতন্ত্রের সেনাবাহিনী ঘিরে
রেখেছে।

ভাগ্য ভালো। পরের সপ্তাহে রোজ-এর জবানীতে থেরেস্-পিসির
লেখা একখানি চিঠি পেল। মেরী রোজ জানাচ্ছে: ‘সবাই

প্রাণে বেঁচে আছে। রাস্তার লড়াই শেষ হয়েছে। এখন
সরকারী কাজ শুধু মৃতদেহ অপসারণ। যারা বেঁচে আছে
তাদের খাদ্য পানীয় সরবরাহের কথা কেউ ভাবে না। অবশ্য
সরবরাহ ব্যবস্থা হলেও আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।
কিছু কিনবার মতো এক কপর্দকও অবশিষ্ট নেই...তোমার
স্টুডিও অক্ষত আছে। রোজ আমি একবার করে স্টুডিওতে
যাই। ঝাড়া মোছা করি। আমি যতদিন বেঁচে আছি তোমার
মর্ত্যগুলোর কোন ক্ষতি হবে না, নিশ্চিত থাকতে পার। তবে
একথাও বলি, ওগুলো মাটির না হয়ে যদি ময়দার হত,
তাহলে হয়তো আমরা নিজেরাই সেগুলো খেয়ে ফেলতাম।...
মায়ের শরীর খুব খারাপ। ডাক্তার দেখানো বৃথা। মায়ের
অসুখটার নাম—‘অনাহার’! দিন পনেরর মধ্যে যদি তোমার
কাছ থেকে কোনও সাহায্য না আসে তবে মাকে বাঁচাতে পারব
বলে মনে হয় না।’

চিঠি পড়ে অগুস্ত্ ক্ষেপে গেল। মা না খেয়ে মরবে? আর সে
জোয়ান ছেলে কিছু করতে পারবে না? পাগলের মতো সে
গিয়ে হাজির হল কারিগর-ব্লুজ-এর দপ্তরে। কিছু অগ্রিম
চাইল। কারিগর-ব্লুজ সহানুভূতি জানালো অত্যন্ত মার্জিত
ভদ্র ভাষায়; কিন্তু আগাম দিতে রাজি হল না। বললে,
অগ্রিম মাহিনা দেওয়া আমার কারবারে বে-আইনি।
মাসকাবারি মাইনে মিটিয়ে দেওয়া হবে। অগুস্ত্ বললে, মসুয়ে
ব্লুজ, তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কিছু ধার দিন
—কারখানার টাকা যদি নাও দিতে পারেন তবু আপনার নিজস্ব
এ্যাকাউন্ট থেকে।

বাধা দিয়ে কারিগর ব্লুজ বলে, রোদ্যা, বাইরে থেকে মনে
হয় আমি বুঝি টাকার কুমার, আসলে ব্যাপ্ক থেকে ওভারড্রাফ্ট
নিয়ে আমি ঋণাত্মক।

অগুস্ত্ আকুল স্বরে বলে, মসুয়ে ব্লুজ! আমি কিছু হাজার
ফ্রাঁ ধার চাইছি না। অস্ত্রত গোটা পঞ্চাশ ধার দিন, এ তো
আপনার যে কোন এক সন্ধ্যার মদের বিলের সমান।

ব্লুজ কঠিন স্বরে বলে, মসুয়ে রোদ্যা, আমার কারখানায়
যদি আপনার না পোষায় আপনি অন্য কোনও কারখানায়
যোগদান করতে পারেন, যারা কাজ করার আগেই অগ্রিম
দেয়।

অগুস্ত্ ফিরে এল স্টুডিওতে। তখন সন্ধ্যা হব হব।
অন্যান্য কর্মীরা একে একে বিদায় নিচ্ছে। অগুস্ত্ মরিয়া

হয়ে এক চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। দারোয়ান যখন স্টুডিওর সদর দরজা বন্ধ করছে তখন সে লুকিয়ে রইল একটা আলমারির আড়ালে। চরাচর নিশ্চল হয়ে গেলে সে গিয়ে বসল নিজের ওয়ার্ক-টুলে। খুঁজে বার করল একটা সাদা মার্বেল। তারপর ‘স্মৃতিনির্ভর’ শিল্পে মশগুল হয়ে গেল। মনে পড়ল লেকক-এর উপদেশ—‘চোখে যা দেখা য় তা মনের পটে আঁকা হয়ে যাওয়া চাই। যখন ইচ্ছে সেই মনের পটের ছবিখানা বাস্তবে রূপায়িত করার দক্ষতা অর্জন করা চাই।’ আর মনে পড়ল মেরী রোজ ব্যুরেকে। সেই সপ্তদশী সুন্দরী—যে প্রস্তুতিত পদ্মের মতো পাপাড়ির পর পাপাড়ি খুলে মডেল স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—‘না! মাথায় ফুলটা থাকবে!’ সারা রাত জেগে ‘ব্যাক্রান্ত’-তে গড়ল আবার। মিনিয়চার মূর্তি। হাতখানেক উঁচু। এই ওর জীবনে প্রথম মর্মর মূর্তি! দিনের আলো যখন ফুটল তখন ভালো করে দেখল মূর্তীটাকে। হুবহু মেরী রোজ, যদিও মাত্র হাত খানেক খাড়াই। সেই আলুলায়িত কুন্তল, অতলান্তিক দৃষ্টি, পীনোক্ত পীবর বন্ধ, সুঠাম জানু, সুডোল নিতম্ব। আশ্চর্য! মেরী রোজ-এর হাসিটাও হাসছে ঐ সাদা মার্বেলের টুকরোটা।

অগুস্ত্ জানে, যতই রসাতীর্ণ শিল্প হোক, অখ্যাত শিল্পীর এ ভাস্কর্য বাজারে বিকোবে না। তাই এবার সে মারিয়া হয়ে এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসে। ছেনি হাতুড়ি তুলে নিয়ে ঐ মূর্তির পাদপীঠে সে খোদাই করল তার মালিকের স্বাক্ষর : কারিয়া ব্লুজ !

দারোয়ান তখনও এসে সদর খোলেনি। সাবধানে একটি জানলা খুলে ও বের হয়ে এল স্টুডিও থেকে। বগলে মূর্তীটা। স্টুডিও থেকে বার হবার সময় কারও নজরে পড়েনি, এটুকুই ওর ভাগ্য। অগুস্ত্ জানত, কারিয়া ব্লুজ-এর ব্যবসায়িক পদ্ধতি। কোনও নতুন মূর্তি গড়া হলে প্রথমেই সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় মসুয়ে পিকোয়ান্‌র ঢালাই কারখানায়। মূল মূর্তীটা বিক্রি করার পূর্বে তার গোটা দুই ব্রোজ কাস্ট বানানো হয়। একটা বিক্রয় করে পিকোয়ান্‌, কমিশনে। একটি থাকে ব্লুজ-এর স্টুডিওতে—পরে যদি ‘রোপিকা’ বানানোর প্রয়োজন হয়, সে জন্য।

অগুস্ত্-এর হাত থেকে মূর্তীটা নিয়ে রীতিমতো অবাধ হয়ে গেল পিকোয়ান্‌। বললে, এটা কি কারিয়া ব্লুজ-এর অরিজিনাল ?

অগুস্ত্ বলে, দেখেও যদি না বোঝেন তবে স্বাক্ষর দেখে চিনবেন।

পিকোয়ান্‌ বলে, স্বাক্ষর তারই, কিন্তু স্টাইলটা যে আদৌ তার নয়।

অগুস্ত্ জবাব দেয় না। পিকোয়ান্‌ একটা চোখ বন্ধ করে বলে, মসুয়ে রোদ্যা, মূর্তি বেচে আমি চুল-দাড়ি পাকিয়েছি। এ শৈলীতে ব্লুজ কোন দিনই কোন ন্যুড বানায়নি, বানাতে পারবে না। এ তো পুতুল নয়, এ যে জ্যাস্ত! এই বুড়ো বয়সেও আমার মনে এ কামনা বাসনার ঝড় তুলেছে...

অগুস্ত্ বললে, কী বলতে চাইছেন? কে বানিয়েছে মূর্তীটা?

—তুমি! তোমার হাতের কাজ আমি দেখেছি। মূর্তীটা তুমি বানিয়েছ, আর কারিয়া ব্লুজ শুধু সইটা খোদাই করেছে। তাই নয়?

অগুস্ত্ মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, মসুয়ে ব্লুজ আমাকে মূর্তীটা দিয়ে বলেছেন আপনাকে দিতে এবং এক শ ফ্রাঁ অগ্রিম নিয়ে যেতে। আপনি কী সব অবাস্তব কথা বলে—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এক শ ফ্রাঁ আমি দিচ্ছি। রসিদে সই করে দিন। কিন্তু এ-কথাও বলি মসুয়ে রোদ্যা, আপনি শিল্পের বেশ্যাবৃত্তি করছেন! ব্লুজকে ছেড়ে নিজের স্টুডিও খুলুন। আমি কিনব। এ জাতের মাল হু-হু করে কাটবে।

অগুস্ত্ জবাব দেয় না। রসিদে সই দিয়ে, নোটের বাণ্ডল গুটিয়ে রওনা হয়। তখনও তার প্রাতঃকৃত্যাদি সারা হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে একটা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির ডিপোতে। অফিস সব খুলছে। অগুস্ত্ই প্রথম খন্দের। মারী-রোজ ব্যুরের নামে একশ ফ্রাঁ হুণ্ডি কেটে সে ফিরে এল বাড়িতে। মুখ হাত ধুয়ে এবার তাকে কারখানায় কাজে যেতে হবে।

দিন তিন-চার সে কাজে মন দিতে পারল না। বিবেকের দংশন। মার্বেলটা সে চুরি করেনি; কারণ পিকোয়ান্‌র স্টকে সেটা কারিয়া ব্লুজ-এর এ্যাকাউন্টেই জমা আছে। এক শ ফ্রাঁও সে চুরি করেনি; কারণ সে যা পেয়েছে তা তারই বিনিদ্র রজনীর শ্রমের দাম।

কিন্তু সইটা সে জাল করেছে।

করেছে কি? প্যারীতে থাকতে অসংখ্যবার সে মূর্তি গড়েছে এবং তার সেই পুতুল মূর্তির তলায় কারিয়া ব্ল্যুজ স্বাক্ষর করেছে। কারখানার মালিকের অধিকারে। তাহলে চুরি করল কে? অপরের ভাস্কর্যে নিজের নাম খোদাই করা আর নিজের ভাস্কর্যে অপরের নাম খোদাই করা—এর মধ্যে কোনটা বড় জাতের অপরাধ?

দিনসাতেক পরে মালিকের ঘরে ডাক পড়ল ওর।

অগুস্ত্ উপস্থিত হয়ে দেখে ব্ল্যুজ-এর সামনের চেয়ারে বসে আছেন মস্যুয়ে পিকোয়ঁ। আর টেবিলের উপর মার্বেলে রূপান্তরিত হয়ে মারী রোজ ব্যুরে এখনও হাঁসছে।

ব্ল্যুজ অগ্নিগর্ভ। বললে, রোদ্যাঁ, তোমার কী অভিরুচি বল? পুলিশ ডাকব, না তুমি টাকাটা ফিরিয়ে দেবে?

—টাকাটা মানে?

—এক শ ফ্রাঁ!

—সে তো আমার মজুরি! আমিই তো নিজে হাতে খোদাই করেছি।

—কিন্তু মার্বেলটা আমার ছিল।

—এখনও তাই আছে। সেটা আমি বাড়ি নিয়ে যাইনি।

গর্জে ওঠে ব্ল্যুজ: ল্যাক্ হিয়ার মস্যুয়ে! তুমি আমার সই জাল করেছ! এ জন্য ছয়মাস পর্যন্ত জেল হয়, তা জানো?

অগুস্ত্ পিকোয়ঁর দিকে ফিরে বলে, মূর্তিটা নিয়ে আপনি নিজে যখন এসেছেন তখন বুঝতে পারছি বেশ ভালো দর উঠেছে ওটার। কত? মস্যুয়ে ব্ল্যুজকে মার্বেলের দাম এবং আপনার কমিশন বাদে আমার কত পাওনা হয়?

ব্ল্যুজ চীৎকার করে ওঠে: মস্যুয়ে ইম্পস্টার্! আপনি ভুলে যাচ্ছেন ওটার অত দাম উঠেছে শুধু আমার সইয়ের জেরে! আপনার সই থাকলে ওটা পাঁচ ফ্রাঁতেও বিকাতো না।

অগুস্ত্-এর নজর হয়, ঘরের সামনে, পর্দার ওপাশে রীতিমতো একটা জটলা। অন্যান্য সবাই কাজ ফেলে ছুটে এসে জুটেছে চিংকার চেষ্টামোচ শূনে। অগুস্ত্ চীৎকার করে না। শান্ত কণ্ঠে বলে, মস্যুয়ে পিকোয়ঁ, এবার আপনি আপনার খদ্দেরকে বরণ বলুন, পাদপীঠের ঐ সইটা ভুল করে লেখা। মস্যুয়ে কারিয়া-ব্ল্যুজ-এর ন্যুড নারী নয়; নপুংসক! এটা মস্যুয়ে রোদ্যঁর ভাস্কর্য। তা সত্ত্বেও কি তিনি ঐ দামে—বাই দ্য ওয়ে, দামটা কত?

ব্ল্যুজ-এর ধৈর্যের বাঁধন ছিঁড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, রোদ্যাঁ! আমার প্রথম প্রশ্নটার জবাব মূলতুবি আছে এখনও! এক শ ফ্রাঁ ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুমি চাকরিতে ইস্তফা দেবে, না আমি পুলিশ ডাকব?

অগুস্ত্ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে। এক গাল হেসে বলে, আমি অনেক বিবেচনা করে আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটাই গ্রহণ করলাম মস্যুয়ে ব্ল্যুজ। আপনি আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলুন। সমস্ত ঘটনাটা খবরের কাগজে ছাপা হ'ক। আদালতে শপথ নিয়ে মস্যুয়ে পিকোয়ঁ জানান—আমার ঐ ন্যুড-এর কত দাম উঠেছে; এবং মস্যুয়ে ব্ল্যুজ-এর কোনও ন্যাংটো নপুংসক সে দামে কখনও বিকিয়েছে কিনা।

—নিকালো হিয়ার্সে! ফরাসী ছেড়ে এবার জার্মান ব্ল্যুজ, তাই হিন্দিতে অনুবাদ করলুম। ফরাসী ভাষা বড় মিনিমিনে, 'গর্দানা পাকাড়কে নিকাল দেনা'-র আদেশ জার্মান ভাষাতেই সুগ্রাব্য।

অগুস্ত্ উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমার দশ দিনের মাহিনা? কাঁপতে কাঁপতে ড্রয়ার খুলে টাকাটা বার করে আনল কারিয়া ব্ল্যুজ, বললে, অব্ নিকালো!

অগুস্ত্ আবার একগাল হেসে বললে, চিল্লাচিল্লিটা না-করলেই পারতেন। টাকা দিয়ে মামলাটা চাপা দিচ্ছেন, এই তো ব্যাপার? কিন্তু কারখানার কুকুরটা পর্যন্ত জেনে গেল আপনি কতবড় শিল্পী। ঐ দেখুন!

পর্দার দিকে আঙুল তুলে সে দেখালো।

গোটা দশবারো মুণ্ড তৎক্ষণাৎ সরে গেল দরজার আড়ালে।

অগুস্ত্ হারের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ পিছন থেকে শোনে একটি আহ্বান, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, নতুন স্টুডিও খুললে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

পাকা জহুরী পিকোয়ঁও উঠে দাঁড়িয়েছে।

ব্ল্যুজ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

যেন মরা পাবদা মাছ!

দশ দিনের মাহিনায় সাতটা দিনও যাবে না। কারণ বাড়ি-ভাড়া বাকি আছে। পরের সপ্তাহে আবার মেরী রোজ-এর চিঠি এল। টাকাটা পেয়েছে। প্রায় অনাহার-মৃত্যুর মুখ থেকে গোটা সংসারটাই ফিরে এসেছে। মেরী কোনও কাজ এখনও

জেটেতে পারেনি। পাপা রোদ্যা অবসর নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে অর্থাভাব সমান তালেই আছে। বাজার এখনও অগ্নিমূল্য!

অগুস্ত্ সারাদিন পথে পথে ঘুরল। বিদেশ-বিভূই জায়গা। কাউকে চেনে না। কে ওকে চাকরি দেবে? একমাত্র একজনকেই চিনত—কারিয়া ব্ল্যুজ—তার ভরসাতেই ব্রাসেল্‌স্-এ আসা। চোখে অন্ধকার দেখল অগুস্ত্।

আরও তিনদিন পরে। সকালে উঠে মানিব্যাগ উবুড় করে গুণে দেখল বাকি আছে সাড়ে সাত ফ্রাঁ। অর্থাৎ সারাদিন উপোস না দিলে কাল ব্যাগটা শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে! পথে বার হল না। চাকরি খোঁজা বৃথা। বরং হাঁটাইটি করলে খিদেটা বাড়ে।

সন্ধ্যাবেলা কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল। নিশ্চয়ই বাড়ি-ওয়ালা। আবার এসেছে ভাড়ার তগাদায়। অভুক্ত অবসন্ন দেহে উঠে গিয়ে দ্বার খুলে দিল। না, বাড়িওয়ালা নয়। ভ্যাঁ রাশবুর্গ। কারিয়া-ব্ল্যুজ-এর কারখানার সহকর্মী।

—শুভ সন্ধ্যা। কী ব্যাপার রাশবুর্গ? হঠাৎ এ গরীবখানায়? রাশবুর্গ গুঁছিয়ে নিয়ে বসল। বললে, রোদ্যা, আমরা সবাই ব্যাপারটা জেনেছি। ব্ল্যুজ-এর সঙ্গে এ নিয়ে আমার কিছু কথা-কাটাকাটিও হয়েছে। মোট কথা, রাগের মাথায় আমিও চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি।

—আমার জন্য?

—না। শুধু তোমার জন্য নয়। আমার নিজের জন্য। আর বেশ্যাবৃত্তি করব না বলে।

—নতুন চাকরি জুটিয়েছে?

—না। চাকরি আমি আর করব না। নিজেই স্টুডিও খুলব স্থির করেছি। সত্যি কথা বলতে কি, স্টুডিও ভাড়াও করে ফেলেছি। তুমি আমার সঙ্গে যোগ দেবে?

—তোমার অধীন কর্মচারী হিসাবে?

—না। পার্টনার হিসাবে।

—আমার তো এক কপর্দকও নেই। মূলধন পাব কোথায়?

—মূলধন তোমার কজিতে! তোমার হাতের কাজ আমরা সবাই দেখেছি।

—কী সর্তে?

—মূলধন আমার। অর্ডার জোগাড় করা, মাল বেচা, সব দৌঁদোঁদোঁড়ি করার পর যেটুকু সময় পাব তাতে আমিও মূর্তি

রোদ্যা—৮

গড়ব। তুমি হোলটাইম স্টুডিওতে থাকবে। মূলধন তুমি দেবে না। বখরা আধা-আধি।

আগুস্ত্ স্তম্ভিত। আধা-আধি? সন্দ্বিগ্ন হয়ে ওঠে সে। বলে, মূর্তিতে কার নাম খোদাই হবে?

—দেখ রোদ্যা, আমি বেলজিয়ান, তুমি ফরাসী। আমি আমার স্বদেশে প্রতিষ্ঠা চাই, তুমি যেমন চাও ফ্রান্সে। সুতরাং সর্ত হবে—মূর্তিতে নাম খোদাই-এর আগে আমরা দেখব খন্দের কোন দেশের। যদি বেলজিয়ান হয়, তবে আমি সই করব—মূর্তিটা যেই বানাক। যদি ফরাসী হয়, তুমি সই করবে, মূর্তিটা যেই বানাক।

—আর খন্দের যদি ব্রিটিশ, আমেরিকান বা অন্য কিছু হয়?

—তাহলে যে বানিয়েছে সেই নাম সই করবে। তোমার মূর্তিতে তুমি, আমার মূর্তিতে আমি।

অগুস্ত্ বলে, আমি রাজি। কিন্তু একটা কথা—

মানিব্যাগ উবুড় করে সে দেখায় তার পুঁজি। বলে, আমাকে কিছু আগাম দিতে হবে। আমি পশু থেকে অনাহারে আছি। রাশবুর্গ বলে, স্টুডিও ভাড়া করতে, এবং অফিস সাজাতে আমার জেবও এখন খালি। তা হোক, আপাতত তোমাকে কিছু অগ্রিম দিচ্ছি। কষ্ট করে চালিয়ে নাও।

পঞ্চাশ ফ্রাঁ অগ্রিম দিল সে বিনা রিসদে।

অগুস্ত্ বললে, তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেব—

—ধন্যবাদ দেবে না। তার বদলে ঐ জাতীয় মূর্তি বানিয়ে দেবে। ব্যাক্যান্ডি।

ভ্যাঁ রাশবুর্গের সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজে যোগ দেওয়ার কিছু পরে ওর মা মারিয়ার মৃত্যু সংবাদ এল। 1871-র শেষার্শে। অগুস্ত্ দারুণ আঘাত পেল। মাকে যে সে এত ভালবাসত তা অনুভব করল মার্ভিয়োগের পর। দু-তিন মাস বাদে আর নির্জনতাকে সহ্য করতে পারছিল না যেন। মেরী-রোজকে সে চিঠি লিখল ব্রাসেল্‌স্-এ চলে আসতে। মারিয়া মারা যাবার পর থেরেস্-পিসি এখন পাপা রোদ্যার সংসারে চলে এসেছে। সুতরাং ‘পেঁতি অগুস্ত্’ অর্থাৎ ওর পাঁচ বছরের ছেলেকে থেরেস্-এর জিম্মায় রেখে মেরী-রোজ যেন চলে আসে। পাথেরও পাঠিয়ে দিল সে!

1872-এর ফেব্রুয়ারী মাসে মেরী-রোজ চলে এল ব্রাসেল্‌স্-এ। কটা দিন বেশ আনন্দে কাটল। মেরী ওর সংসারের দায়-

ঝাঁকি কাঁধে তুলে নিয়েছে। সংসারে কখন কোন্টা 'বাড়ন্ত' হয়ে পড়ছে আর নজর রাখতে হচ্ছে না। মেরীর মনে অবশ্য একটা কাঁটা বিঁধে আছে। অগুস্ত্-এর সংগ্রহে একজোড়া শিশুমূর্তি ছাড়াও দুটি 'ফর্মি-হেড' যুক্ত হয়েছে—'সুজ' আর 'ডোজিয়া' (872)। মেরীর কৌতূহল হয় জানতে—ও দুটি কি একই মেয়েকে মডেল করে বানানো? না; তা তো নয়। বেশ তফাৎ আছে দুটি চেহারায়। কোন্ মেয়েটির মূর্তি আগে গড়েছে অগুস্ত্? তাকে ত্যাগ করে দ্বিতীয় মেয়েটিকে ও বেছে নিল কেন? দুজনেই তো সুন্দরী! প্রথমা কি 'ন্যুড'-মডেল হতে রাজি হয়নি বলেই দ্বিতীয়াকে আমদানি করতে হল? তারা কোথায়? কতদূর ঘনিষ্ঠ হয়েছে তারা অগুস্ত্-এর সঙ্গে? প্রশ্নের পাহাড় জমে ওঠে ওর



চিত্র—15 : বেলজিয়ামে গড়া শিশুমূর্তি (1872)

মনে। সাহস করে প্রশ্ন করতে পারে না—কী জানি, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে! ও তো জানেই—সুয়োরানী যে কোন্দিন এসে হাজির হতে পারে। তখন তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে মেরী রোজকে সরে যেতে হবে। আলাপ হল ভঁা রাশবুর্গের সঙ্গে। অমায়িক মানুষ। ওকে 'মাদাম' বলে ডাকতেন। একদিন অগুস্ত্-এর অনুপস্থিতিতে ও প্রশ্ন করে বসল তাঁকে—অগুস্ত্ ইতিমধ্যে আর ন্যুড গড়েন? —না! একটাই গড়েছিল। স্মৃতিনির্ভর। যেটার জন্যে ব্লুজ-এর সঙ্গে ওর... —সেটার কথা জানি। না, আমি বলছিলাম, এই 'সুজ' আর 'ডোজিয়া'র ন্যুড—

হো-হো করে হেসে ওঠে রাশবুর্গ। বলে, ভয় নেই মাদাম! ও দুটোই কাম্পানিক নাম। মন-গড়া ভাস্কর্য! মডেল পুষবার মতো আর্থিক সঙ্গতি ওর এখনও হয়নি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে মেরী-রোজ-এর। বলে, কিছু মনে করবেন না মস্যুয়ে রাশবুর্গ!... মানে, আমি যে একথা জানতে চেয়েছি তা যেন ওকে...

আবার অটুহাস্য করে ওঠে রাশবুর্গ। বলে, বুঝোছি, বুঝোছি! সে রাতে মেরী-রোজ হঠাৎ কেন যে অমন উদ্দাম হয়ে উঠল ঠাণ্ড হ'ল না অগুস্ত্-এর।

এবার যে সমস্যা দেখা দিল তা অপ্রত্যাশিত। রাশবুর্গ লোক ভাল, ব্যবসায় বোঝে; অনতিবিলম্বেই তার স্টুডিও সুনাম অর্জন করল। রোজগারপাতিও হচ্ছে। অগুস্ত্ সম্পূর্ণ নিজের মনোমত ভাস্কর্য গড়ছে, কোন খবরদারী নেই রাশবুর্গের। তবু সমস্যা দেখা দিল।

মূর্তি যারা কেনে তারা শতকরা শতভাগই বেলজিয়ান! ফলে সব মূর্তিতেই পড়তে থাকে রাশবুর্গের স্বাক্ষর! চুক্তিনামা হয়েছে সেই মর্মে! দোষ দেবে কাকে? কিছুদিনের মধ্যেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। শিল্পী অর্থ চায়, প্রতিপত্তি চায়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে চায় স্বীকৃতি। ফলে অগুস্ত্ দুর্মনস্যতার শিকার হয়ে পড়ে।

রাশবুর্গ বলে, তোমার মনে ক্ষুধা নেই। এক কাজ কর। কিছুদিন কোথা থেকে ঘুরে এস। দিন পনের ছুটি নাও। খরচ কোম্পানির।

অগুস্ত্ প্রথমে গেল আমস্টার্ডামে। রেমব্রাণ্টকে দেখতে। আমস্টার্ডাম অপূর্ব শহর, কিন্তু অগুস্ত্ কিছুই প্রায় দেখেনি! যে-কোনদিন ছিল সকালসন্ধ্যা কাটিয়ে এল রিৎজমুখ্ ম্যুজিয়ামে—রেমব্রাণ্টের শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালায়!

রেমব্রাণ্ট (1606-63) ওলন্দাজ শিল্পী। অসাধারণ তাঁর দক্ষতা। প্রকৃতি ও মানুষ দুদিকেই তাঁর সমান দরদ। তাঁর মতো আলো-ছায়ার খেলা—chiaroscuro—আজও কেউ দেখাতে পারেনি ক্যানভাসে। তাতেই তাঁর খ্যাতি, তাতেই তাঁর পতন; তাতেই তাঁর আলো, তাতেই তাঁর ছায়া। আমস্টার্ডামের অফিসার্স গিল্ড তাঁকে বায়না দিল স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের একটা প্রকাণ্ড ক্যানভাস আঁকতে। রেমব্রাণ্ট আঁকলেন Night Watch—'রাতের প্রহরা'। সংগ্রামীরা সবাই

আছেন—চুক্তিনামার সর্তানুযায়ী—কিন্তু মাত্র দুজনের মুখে পড়েছে আলো, বাদবাকি জনাপগুশ রাতের অন্ধকারে ! ‘মোনালিজা’ বাদে সেটাই বোধকরি আজকের পৃথিবীতে সবচেয়ে মহার্ঘ তৈলচিত্র ! কিন্তু যোদিন সেই প্রকাণ্ড চিত্রটি শেষ হল সেদিন গিল্ড কতৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করলেন ! সবাই চাঁদা দিয়ে ছবি আঁকাচ্ছেন – তাঁরা সমান মাপের আলোর অধিকারী হবেন না কেন ? ঐ চিত্রটি অঙ্কনের পরেই শিম্পীর অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে ওঠে । শেষ জীবনে সৌখীন, রাজা-রাজড়ার ছবি আঁকা ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায় । আঁকতেন সাধারণ মানুষকে ! কিছু বা বাইবেলের কাহিনী ; কিছু নিসর্গ চিত্র ।

অগুস্ত্ মোহিত হয়ে গেল । মুগ্ধ হয়ে গেল । আম্‌স্টার্ডাম থেকে সে ফিরে এল নতুন উৎসাহ নিয়ে । সমকালীন সমালোচকদের বিবৃপতা কী-ভাবে অগ্রাহ্য করতে হয়, এটাই তার মৌলশিক্ষা রেমব্রান্টের কাছে । প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসার শিক্ষাও কম নয় ; এবং আলোর প্রয়োগ ! ফিরে এলে মেরী-রোজ জানতে চায়—আম্‌স্টার্ডামে আর কি দেখলে ?

—আবার কী দেখব ? রেমব্রান্টকে দেখতেই তো পনের দিন লাগল ! ‘রাতের প্রহরা’ তুলনাহীন, ওঁর সেল্ফ্‌ পোর্ট্রেট, আর মাদাম স্টোফেল্‌স্-এর পোর্ট্রেট অনবদ্য ।

—মাদাম স্টোফেল্‌স্‌ কে ?

—ওঁর সঙ্গিনী । সাতাশ বছর তাঁর সঙ্গে বাস করেছেন শিম্পী ।

—সাতাশ বছর ? তবু বিয়ে করেননি ?

অগুস্ত্‌ থেমে যায় । এর সঙ্গে শিম্পের আলোচনা বৃথা । ও যা বুঝবে তাই এবার বার করে পকেট থেকে—এক জোড়া বুটো-পাথরের দুল ।

মেরী রোজ খুশি হল । শুধু দুলজোড়া পেয়ে নয়, পনের দিন পর অগুস্ত্‌কে ফিরে পেয়ে । তবু ওর মনে একটা কথা কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে । কেমন দেখতে ছিলেন মাদাম স্টোফেল্‌স্‌ ? তিনি কি লেখাপড়া জানতেন ? ঐ ডাচ্‌ শিম্পীর—কী নাম যেন—তাঁর সঙ্গে শিম্পি বিষয়ে আলোচনা করতে পারতেন ? তা সত্ত্বেও...! ও লর্ড যীসাস্‌ ! সাতাশ বছর ! মৃত্যুর পর তাঁর সমাধি কি রচিত হয়েছিল সেই কী-নাম-যেন ওলন্দাজ শিম্পীর পাশে ? অগুস্ত্‌কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে ? থাক্‌ ! ও যদি চটে যায় !

রেমব্রান্টকে দেখে দেখার ক্ষিদে বেড়ে গেল যেন । আজন্ম

যাঁর স্বপ্ন দেখে এসেছে—ওর মানস গুরু—মিকেলাঞ্জেলোকে দেখতে হবে এবার । দোনাতেল্লো—ঘিবার্টি—মিকেলাঞ্জেলো । রাশবুর্গ রাজি হল । সাতাশ ফ্রাঁ অগ্রিম দিল পথের রাহা খরচ ।

মুখভার হল মেরী রোজের । বলে এবার কতদিনের মতো ?

—চার-পাঁচ সপ্তাহ ।

—অত দিন ? আমি এখানে একা-একা কি করব ? আমাকেও সঙ্গে নিয়ে...

—পাগল ! সাতাশ ফ্রাঁতে একাই ঘোরা অসম্ভব । দোকা যাব কেমন করে ?

মেরী রোজ বোঝে, বাধাটা শুধু অর্থের নয় । যে যদি ওর...! তাছাড়া ও যে শিম্পের কিছুই বোঝে না ! অগুস্ত্‌ তো ফুর্তি করতে যাচ্ছে না, মূর্তি গড়তে যাচ্ছে । মনে মনে ।



চিত্র—16 : ডোজিয়া (1872)

তিন সপ্তাহের মাথায় ফিরে এল অগুস্ত্‌ । টাকা ফুরিয়ে গেছে বলে নয় । সে ফিরে এল প্রাণের তাগিদে ! ডোঁভড্‌, পীতা, মোজেস্‌ ! ঘিবার্টির ‘স্বর্গীয় দ্বার’ ! ওর হাত নিশ্চিপশ্‌ করছিল বলে । মনে যে ভাবের আম্পস্‌ গড়ে উঠেছে তার ভার আর বইতে পারছে না । ছোঁন-হাতুড়ির একজস্ট-পাইপ দিয়ে কিছুটা উন্মাদনা বার না হয়ে গেলে ও পাগল হয়ে যাবে ! ওকে গড়তে হবে । এখনই ! এই মুহূর্তেই ।

সময়ের আগে ফিরে আসায় মেরী রোজ ঘাবড়ে গেল : শরীর ভাল আছে তো ?

—শরীর ভাল থাকবে না কেন ? ভালই আছে ।

—তাহলে এমন তাড়াহুড়ো করে ফিরে এলে যে ? দূর থেকে

মিকেলাঞ্জেলোকে যতটা মহান মনে হয়েছিল ততটা বাস্তবে নয় ? এই তো ? তুমি হতাশ হয়েছ ?
অগুস্ত্-এর ইচ্ছে হল নিজের চুলদাড়ি ছিঁড়তে থাকে ! এই ওর জীবনসঙ্গিনী !

—বল না গো ? মিকেলাঞ্জেলোকে কেমন লাগল !

দাঁতে দাঁত চেপে অগুস্ত্ বললে, সে বোঝানো যায় না । একটা জীবনে একজন মানুষ যে এত কাজ করতে পারে তা বিশ্বাসই হয় না ! আর কী সব কাজ ! এর একটাই একজন শিল্পীকে অমরত্ব দিতে পারে । মিকেলাঞ্জেলো তুলনাহীন !

—ওঁর জীবনসঙ্গিনী ছিল ? মডেল ?

অগুস্ত্-এর উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ে । সংক্ষেপে বলে না ।

—উনি ফেমি-ন্যুড গড়েন নি ?

—গড়েছেন । ভাড়া করা মডেল । ‘ফেমি-ন্যুড’-এর জন্য তিনি বিখ্যাত নন ।

মেরী ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা পেশ করে বসে, উনি বিয়ে করেছিলেন ?

অগুস্ত্ এক মুহূর্ত ওর দিকে জলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে । তারপর বলে, মিকেলাঞ্জেলো বিয়ে করেননি, লঅনার্দো বিয়ে করেননি, রাফায়েল সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান, বোধহয় বিয়ে করেননি । আর কার কার বিয়ের কথা জানতে চাও বল ?

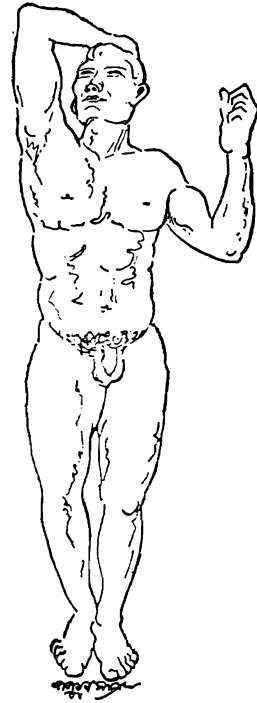
মেরী রোজ মরমে মরে যায় ।

মিকেলাঞ্জেলো যেন ওকে নতুন পথের সন্ধান দিলেন । ‘ডেভিড’ ওকে উদ্ধুদ্ধ করেছে । মানব দেহ সুন্দর । রেখে-ঢেকে, শিল্পের দোহাই দিয়ে তাকে বিচিত্র চঙে বিকৃত করা নিষ্প্রয়োজন । এই সময় ব্রাসেল্‌স্-এ একজন সৈনিকের সঙ্গে আলাপ হল—নীস্ট্—লোকটা ছুটিতে আছে । কদিন ব্রাসেল্‌স্-এ থাকবে । তাকে দেখে মুগ্ধ হল অগুস্ত্ । না, ডেভিড-এর মতো অনিন্দ্যকান্তি নয়, তা হোক, সে—সে । মডেল হতে রাজি হয়ে গেল লোকটা । প্রতিদিন সে আসত ওর স্টুডিওতে । তাকে মডেল করে অগুস্ত্ একটা প্রমাণ মাপের ভাস্কর্য বানাবে । কী গড়বে ? ‘ডেভিড’ ওকে উদ্ধুদ্ধ করেছে ; কিন্তু ‘ডেভিড’-এরও বিবর্তন হয় । দোনাতেল্লোর ডেভিড, মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিডে আছে তারুণ্যের জয় যাত্রা । গোলিয়াথ দৈত্যকে বধ করবার জন্য ‘ডেভিড’ প্রস্তুত । কিন্তু

বাইবেল যুগের ধ্বংসসমর এখন অতীত ইতিহাস । লড়াই আজও হয়—তবে ডেভিড-এর সঙ্গে গোলিয়াথ দৈত্যের নয় ; এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের । এক সেনাবাহিনীর সঙ্গে অন্য সেনাবাহিনীর । একদল হা-ভাত মানুষের রাষ্ট্রীয় কণ্ঠধারের সঙ্গে আর একদল হা-ভাত মানুষের ভাগ্যান্বিতার । যুদ্ধটা যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা পা-হড়কালে তোমার সমস্ত তারুণ্য, সমস্ত বীরত্ব সত্ত্বেও তুমি ডুবে যাবে চোরাবালির অতলে । নেপলিয়ন্ বোনাপার্ট ওয়াটার্লু বা ট্রাফালগারে পরাজিত হন নি, হয়েছিলেন শিবিরের পিছন দ্বারে—স্বজাতীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় । এই যে অগুস্ত্-এর চোখের সামনে হাজারে হাজারে ফরাসী তরতাজা তরুণ প্রুশিয়ান বাহিনীর আক্রমণে রক্তের বন্যায় ভেসে গেল এজন্য ঐ হাজার হাজার ‘ডেভিড’ দায়ী নয় । দায়ী ঐ যুদ্ধবাজেরা, যারা থাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শত শত কিলোমিটার দূরে !

হ্যাঁ ! বিষয়বস্তু খুঁজে পেয়েছে অগুস্ত্ । সে গড়বে ‘তারুণ্যের অবক্ষয়’ : Vanquished !

দণ্ডায়মান একটি তরুণ । ডান হাত মাথায়, যেন ক্ষোভে দুগ্ধে অপমানে পরমুহূর্তেই ও মাথার চুল ছিঁড়তে শূণ্য করবে ! সে



চিত্র—17 : Vanquished, পরাজিত/রোজযুগ (1876)

হাতটা যেন বলছে—হে আমার নেতার দল ! গদীর মোহে এ তোমরা কী করলে ! বাঁ-হাতে একটি যশ্টি । তাতে ভর দিয়েছে । সে হাতটা যেন বলছে, তবু ভেঙে পড়লে তো চলবে না !

পারীতে যেমন বার্ষিক সালোঁ প্রদর্শনী হয়, তেমনি রাসেলস্ এও হয় একটা বার্ষিক সালোঁ । অগুস্ত্ সেই রাসেলস্ সালোঁতে এই মূর্তিটা প্রদর্শনের জন্য দাখিল করল । বারণ করেছিল ওর পার্টনার, ভ্যা রাশবুর্গ । বলেছিল, অগুস্ত্, এ মূর্তি প্রচলিত ধারার ধারে কাছে নেই ! এটা এত বাস্তব, এত বিপ্লবাত্মক যে, দর্শকরা এটা গ্রহণ করবে না ! অন্ততঃ একটা অলিভ পাতায় ওর নগ্নতাকে তুমি ঢেকে দাও !

অগুস্ত্ বুখে ওঠে, অলিভ পাতা ! ওটা কি রোমান শিম্প ? এই উনিবিংশ শতাব্দীতে অলিভ পাতা কোথায় পাব ?

—তবে একটা ল্যাণ্ডট পরিয়ে দাও !

—ছিছিছি ! সে তো অগ্নীল !

—না । ঐ পরিদৃশ্যমান যোনাঙ্গটাই অগ্নীল !

অগুস্ত্ তর্ক করে, কেন ? ‘ডেভিড’কে কি মিকেলাঞ্জেলো নগ্ন করে গড়েদেন ?

—মিকেলাঞ্জেলো একজন ব্যতিক্রম । সহস্রাব্দীতে এমন শিম্পী একবারই জন্মায় ।

—মানছি । কিন্তু তাঁর ডেভিডকে যারা মেনে নিয়েছিল তারা সাধারণ মানুষ । তারা বছর বছর জন্মায় ।

—তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা ।

—তবে বৃথা-তর্ক কর কেন ?

রাসেলস্-সালোঁর কর্তৃপক্ষ বিদেশী শিম্পীর মূর্তিট নিৰ্বাচন করলেন ।

প্রদর্শনী যদিও শুরু হল সেদিন মেরী রোজ আর রাশবুর্গকে নিয়ে অগুস্ত্ গেল শিম্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে । সব চেয়ে ভিড় জমেছে ওর ঐ মূর্তিটার সামনে । জনতা উত্তেজিত, চীৎকার চোঁচোমোঁচ । কী ব্যাপার ? কাছে গিয়ে দেখে কোন অবাচীন একটা পোস্টার লিখে মূর্তিটার বাঁ-হাতে লটকিয়ে দিয়েছে । বিজ্ঞাপ্তিতে লেখা আছে : “যে জ্যাস্ত মডেলের দেহে মোম গলিয়ে আমার ছাঁচ নেওয়া হয়েছে সেই মডেলটি এখন কবরের নিচে । মাদাম ! আমার নগ্নতায় কামার্ত হন ক্ষতি নেই—কিন্তু সেই হতভাগ্যের জন্য দু-ফোঁটা চোখের জলও ফেলবেন !”

জনতা চীৎকার করছে : কে সেই বিদেশী শিম্পী ! তাকে আমরা দেখতে চাই । বিচার চাই !

রাশবুর্গ ওর কানে কানে বলে, আত্মপ্রকাশ কর না যেন । জনতা ক্ষেপে আছে । চিনতে পারলে তুলো ধুনো করে ছাড়বে । চল, মানে মানে কেটে পড়ি ।

—কেটে পড়ব ! এমন মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে ? কর্তৃপক্ষের একজন ওদের চিনতে পারেন । ছুটে এসে তিনি চেপে ধরেন অগুস্ত্-এর বাহুমূল । টানতে টানতে একটু দূরে সরে এসে বলেন, মসুয়ে রোঁদ্যা আমরা জানি, এ মিথ্যা । কিন্তু জনতা এখন ক্ষিপ্ত । প্লীজ ! আপনি বাড়ি ফিরে যান !

অগুস্ত্ স্তম্ভিত । তার মনে পড়ে গেল—‘ডেভিড’-এর যদিও উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছিল সেদিন ফ্লোরেন্সবাসীরাও লাঠি সোঁটা নিয়ে মূর্তিটাকে ভাঙতে গিয়েছিল ! যেহেতু ডেভিড নগ্ন । সে এখন কী করবে ? রেম্ব্রাণ্ট হলে এ সময়ে তিনি কী করতেন ?

কোথাও কিছু নেই ভীড় ঠেলে চিতাবাঘিনীর মতো মেরী-রোজ ছুটে যায় মূর্তিটার কাছে । একটানে কেড়ে নেয় নগ্নমূর্তিটার হাতের লাঠি । জনতার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, মিথ্যে ! মিথ্যে !

—কী মিথ্যা ?

—এ মূর্তির মডেলের নাম—‘নীস্ট’ । সে একজন বেলজিয়ান সৈনিক ! সে বেঁচে আছে ।

—বেলজিয়ান সৈনিক । Vanquished ! কোন শুরারের বাচ্ছা ফরাসী শিম্পী বলে !

মেরী রোজ চীৎকার করে ওঠে, সে কথা বলছি না আমি ! আমি বলছি—নীস্ট বেঁচে আছে ! তার ছাঁচ আদৌ নেওয়া হয়নি !

—আপনি কেমন করে জানলেন ?

—আমি এ মূর্তি তৈরী হতে স্বচক্ষে দেখেছি । দিনের পর দিন !

—অসম্ভব ! কোন বেলজিয়ান তরুণ কোন ফরাসী মহিলার সমুখে ওভাবে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়াতেই পারে না । আপনি কে ? মোড়াল করতে আপনাকে কে ডেকেছে ?

—আমি যেই হই ! শুধু জেনে রাখুন : আমি জোন-অফ-আর্কের দেশের মেয়ে ।

অগুস্ত্ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকে । মেরী রোজ-এর এ মূর্তি

তো কম্পনার বাইরে ! আশ্চর্য ! সে ভুলে গেলেও মেরী-রোজ তো ভোলেনি—তার ধমনীতে বইছে জোন-অফ-আর্ক-এর দেশের রক্ত । তার এদিকটা তো জানা ছিল না । সে এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু রাশবুর্গ তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে । জনতা ক্ষিপ্ত । নানান কটুকাটব্য । কেউ বলে, ও হচ্ছে সেই ফরাসী ভাস্করের পোষা-ময়না ! কেউ বলে, মেল-ন্যুডের পাশে মাগীটাকে 'ফেমি-ন্যুড' করে ছেড়ে দাও । ভালো মানাবে !

পুলিশ এতক্ষণে এগিয়ে আসে ! শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । মেরী রোজকে বলে, আপনি সরে আসুন । আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আমরা !

মেরী রোজ তার সোনালী চুলে ভর্তি মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, যতক্ষণ না ঐ প্ল্যাকার্ডটা সরানো হচ্ছে ততক্ষণ আমি কোথাও যাব না ।

একজন সার্জেন্ট মূর্তিটার হাত থেকে প্ল্যাকার্ডটা খুলে নেয় । অগুস্ত্ সদলবলে ফিরে যায় ।

পরদিন সংবাদপত্রে কলা-সমালোচকরা ফলাও করে ঘটনাটি ছাপলেন । কোনও পত্রিকায় অভিযোগটা সমর্থন করা হয়েছে ; কোথাও বা নল্চের আড়াল দিয়ে বলা হয়েছে : মূর্তিটির বাস্তবতা ঐ রকম একটা সম্ভাবনার দিকেই ইঙ্গিত দেয় । যদিচ, ছাঁচ নিতে গিয়ে মডেলকে হত্যা করা হয়েছে এতটা আমরা বিশ্বাস করি না । কিন্তু আমরা আশা রাখি, বিদেশী শিল্পীটি নিজেও স্বীকার করবেন, ছাঁচ নিয়ে মূর্তি গড়া একটা 'ক্রাফ্ট' হতে পারে 'আর্ট' নয় ।

অগুস্ত্ তৎক্ষণাৎ কাগজে প্রতিবাদ পাঠালো । সেটা ছাপাও হল, কিন্তু তাতে কাজ হল না কিছু ।

পরদিন কতৃপক্ষ মূর্তিটিকে ওর স্টুডিওতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন । অহেতুক শিল্পপ্রদর্শনীতে শান্তিভঙ্গ হতে দেওয়া চলে না । রাশবুর্গ বলে, নীস্টকে জলজ্যান্ত হাজির করলে, তার জবানবন্দি কাগজে ছাপা হলে কাজ হতে পারে । কিন্তু নীস্ট ছুটি অস্ত্রে কাজে যোগদান করেছে । ব্রাসেল্‌স্-এ সে যে বাড়িতে থাকত তারা ওর নতুন ঠিকানা বলতে পারল না । ফলে ঐ জলজ্যান্ত প্রমাণটাও দাখিল করা গেল না ।

মডেল যে বেলজিয়ান এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল । তাতে দু জাতের ক্ষতি হয়েছে । স্থলজাতের দর্শকেরা বলছে, ফরাসী শিল্পী একজন বেলজিয়ানের দেহে মোমের ছাঁচ তুলতে গিয়ে

তাকে মেরে ফেলেছে । আমরা সেই বিদেশীর বিচার চাই ! আর সূক্ষ্মদৃষ্টির সমালোচকেরা বলছেন, ছাঁচ তোলা হ'ক বা না হ'ক, ফরাসী শিল্পী 'পরাজিত সৈনিক' গড়তে বেলজিয়ান সৈন্যকে বেছে নিয়ে সুরুচির পরিচয় দেন নি । প্রুশিয়ার কাছে থাপ্পর-খাওয়া ফরাসী সৈনিকের তো আকাল পড়েনি ! কিছু লোক খুঁজে খুঁজে ভঁা রাশবুর্গের স্টুডিওতে এসে হানা দিল সেই বিদেশী শিল্পীর সন্ধানে ।

পরদিন সন্ধ্যায় মেরী রোজ বলে, এখন কী করবে ?

—ব্রাসেল্‌স্-এ আর মুখ দেখানো যাবে না । কিন্তু যাবই বা কোথায় ?

—কেন পারীতে । সেখানে পাপা আছেন, থেরেস্ পিসি, খোকন আছে !

অগুস্ত্ জবাব দেয় না । গোঁজ হয়ে বসে থাকে । মেরী রোজ তাই যোগ করে, পারীর মানুষ এমন বর্বর নয় ; তারা তোমার মূর্তির কদর বুঝবে ।

এই নির্বোধের সঙ্গে বাক্যালাপে মাঝে মাঝে আজকাল ক্লান্ত বোধ করে অগুস্ত্ ! যাব বললেই কি যাওয়া যায় ? সব কিছু গুটিয়ে পারী যেতে কত খরচ ! ওর হাতে তো এখন এক কপর্দকও নেই । তাছাড়া পারীতে ফিরে করবেটা কি ? এখানে রাশবুর্গের কারখানায় তবু দুবেলা অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা আছে ।

মেরী বায়না ধরে, চল না গো ! আমরা পারীতে ফিরে যাই । এবার প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠে, থাম তুমি ! পারীতে ফিরে যেতে কত খরচ পড়বে জান ? অন্তত পাঁচ শ ফ্রাঁ ! সেটা আছে আমার ?

মেরী রোজ জবাব দেয় না । নিঃশব্দে উঠে যায় । একটু পরে ফিরে আসে একটা থলি হাতে । সেটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে, এতে সাড়ে ছয় শ ফ্রাঁ আছে । চল, কালই আমরা ফিরে যাই ।

অগুস্ত্ স্তম্ভিত । বিশ্বাস হয় না তার । থলিটা উবুড় করে দিতেই মেজেতে ছাঁড়িয়ে পড়ল নোটের বাঁগল । সুতো দিয়ে শয়ে শয়ে বাঁধা । অবাক বিস্ময়ে অগুস্ত্ বলে, সাড়ে ছ-শ ফ্রাঁ ! তুমি কোথায় পেল !

'মিস্ট' হাসল মেরী । অনেকদিন এমন হাসি হাসে না সে । বলে, তুমি যখন কারখানায় যেতে তখন আমি ঘরে বসে সেলাই করতুম । ঐ বাজারের কাছে এক দরজির সঙ্গে

বন্দোবস্ত করেছিলুম। তিল তিল করে জমিয়েছি। তোমাকে চিন্তে তো বাকি নেই। জানি, দুর্দিনে প্রয়োজন হবেই।

অগুস্ত্ কী বলবে, কী করবে ভেবে পায় না। এই তার জীবনসঙ্গিনী! যে জানে না—মোনালিজা কার আঁকা, জানে না সিস্টিন চ্যাপেলে কী আছে, জানে না নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে! অথচ জানে—সে জোন-অব্-আর্কের দেশের মেয়ে, জানে দুর্দিনে টাকার প্রয়োজন হয়। জানে, তার মরদ আত্মভোলা শিম্পী!

মেরী রোজ ঘনিয়ে এসে বলে, হ্যাঁ গো! তোমাকে লুকিয়ে টাকা জমিয়েছি বলে রাগ করলে?

অগুস্ত্ মাথা নিচু করে বললে, সেজন্য নয়। কিন্তু তিল তিল করে জমানো তোমার এ-টাকা আমি হাত পেতে নেব কেমন করে?

—এই এমনি করে—ওর হাতটা টেনে এনে থলিটা গুঁজে দেয়। বলে, তুমি আর আমি কি আলাদা? তোমার রোজগারে আমি খেয়ে পরে বেঁচে আছি না?

—সে হয় না! এ দান আমি—

চোখ দুটি ছল ছল করে ওঠে। বিস্মৃতপ্রায় একটি কথোপকথনের পুনরুজ্জীবিত করে মেরী-রোজ: চেরী! এ তো ভিক্ষা নয়! ধার দিচ্ছ শুধু তোমাকে। তোমার প্রতিভার ব্যাঙ্ক-এ আমার একটা দীর্ঘমেয়াদী আমানত।



পারীতে ফিরে এসে মূর্তিটা দাখিল করল পারীর সালোঁতে। সেটা গৃহীত হল। না হলেই বোধ করি ভাল ছিল। কারণ পারীতে একই নাটকের হল পুনরাভিনয়। সমস্ত পারীর দর্শক ক্ষিপ্ত হয়ে গেল ঐ নগ্নমূর্তিটা দেখে। এখানেও একদল অভিযোগ আনল—মূর্তিটা জ্যান্ত-মানুষের গায়ে গলানো মোম ঢেলে ছাঁচে বানানো; অপরদল বললে, সে-কথা সত্যি হোক না হ'ক—এ মূর্তি অশ্লীল। সালোঁতে প্রদর্শনের অযোগ্য।

ফরাসী সংবাদপত্রের কলা-সমালোচকেরাও কঠোর সমালোচনা করলেন। এত বাস্তবতা অসহ্য!

এবারেও সংবাদপত্রে প্রতিবাদপত্র পাঠালো অগুস্ত্। সেটা ছাপা হল, তার সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য: শিম্পী দাবী করেছেন তাঁর মডেল জীবিত আছে। যদিও তিনি মডেলকে

সশরীরে উপস্থিত করতে অক্ষম। লোকটার নাম নীস্ট, সে নার্কি বেলজিয়ান। তার বর্তমান ঠিকানা জানা না থাকায় তাকে নার্কি উপস্থিত করা যাচ্ছে না। এখানে একটু সমীক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে। বেলজিয়ান-বাহিনীতে লোকটি যদি চাকরি করে তবে সে নিশ্চয়ই রাসেল্‌স্ সালোঁর ব্যাপারটা খবরের কাগজে দেখেছে। কাগজে তার ছবিও ছাপা হয়েছে, নামও ছাপা হয়েছে। ফলে সে নিরক্ষর হলেও তার বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চয় ব্যাপারটা তাকে জানিয়েছে। এ-ক্ষেত্রে স্বতই আশা করা যায়—সেই গড়-ঠিকানার মানুষটা সংবাদ-পত্র অফিসকে জানাবে যে, সে বেঁচে আছে! তা সে জানারিনি। কেন? যুক্তিনির্ভর তিনটি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে। হয়, সে বেঁচে নেই, কবরের তলায়। অথবা শিম্পী যেটা দাবী করছেন সেটা ধোপে টেকে না—‘নীস্ট’ একটি কল্পিত নাম। আসল মডেল ছাঁচ নেবার সময় মারা গেছে। তৃতীয় বিকল্প সম্ভাবনা: মসুয়ে রোদ্যাঁ তার যৌনাঙ্গটা নিখুঁতভাবে গড়তে পারেন নি। বেচারি ভয় পাচ্ছে, তাকে সর্বসমক্ষে উলঙ্গ হতে বলা হলে সে বিপদে পড়বে! সে যাই হোক, মূর্তিটি যে চূড়ান্তভাবে অশ্লীল এ অভিযোগের বিরুদ্ধে আশাকরি শিম্পীর কোনও বক্তব্য নেই!

পরদিন সালোঁর কর্তৃপক্ষ ওকে সংবাদ পাঠালেন, জনগণের ইচ্ছার মূর্তিটি ওঁরা অপসারিত করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিম্পী যেন পরদিন সন্ধ্যায় এসে ওটাকে স্থানান্তরিত করায় সাহায্য করেন। সংবাদপত্রেও সালোঁ এ খবরটি জানালেন, যাতে প্রদর্শনী যাঁরা বর্জন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সন্তুষ্ট হতে পারেন।

পরদিন প্রদর্শনী শুরু হবার আধঘণ্টা আগে ও হাজির হল। সালোঁর প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে দেখা করল। ঘরে, গণ্যমান্য আরও কয়েকজন রয়েছেন। সকলেই তা-বড় তা-বড় কলা-সমালোচক। একোয় দ্য বোয়া তাৎ, এবং সালোঁর কর্তব্যাক্তিরা।

অগুস্ত্ চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। প্রেসিডেন্ট সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন, আমরা অত্যন্ত দুর্গন্ধিত মসুয়ে রোদ্যাঁ। কিন্তু ঐ মূর্তিটি নিয়ে গোটা পারীতে যে কালবৈশাখী ঘনিয়ে উঠেছে তারপর ওটাকে রাখতে পারছি না।

অগুস্ত্ দেখে ইতিমধ্যেই মূর্তিটাকে ক্রেটের কফিনে শোয়ানো হয়েছে। ঠেলাগাড়ি সমেত কুলিমজুরের দল হাজির।

প্রেসিডেন্ট বলেন, কোথায় আপনার স্টুডিও বলুন।
 আমাদের ব্যয়ে আমরা সেখানে ওটাকে পৌঁছে দেব।
 অগুস্ত্ বলে, আমার কোনও স্টুডিও বর্তমানে নেই, মসুয়ে
 ল্যো প্রেসিডেন্ট। অর্থাভাবে সেটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।
 সমবেত পণ্ডিতেরা সহানুভূতি দেখিয়ে মাথা নাড়লেন।
 —তাহলে ওটাকে কি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবে ?
 —বাড়িতে তো তিল ধারণের ঠাই নেই। স্টুডিও-র যাবতীয়
 মূর্তি ঐ দেড়-কামরার বাড়িতেই নিয়ে আসতে হয়েছে তো—
 —বুঝলাম। কিন্তু তাহলে কোথায় মূর্তিটা ফেরত দেব !
 —জানি না। বিশ্বাস করুন, আমি জানি না। সেন-এর
 জলে ওটাকে ফেলে দিতে বলুন না হয়।
 প্রেসিডেন্টকে মদৎ দিতে তাঁর পাশ থেকে আর একজন
 পণ্ডিত বলে ওঠেন, এটা আপনার রাগের কথা হল মসুয়ে
 রোদা। ভেবোঁচন্তে কিছু বলুন ?
 —আপনারা যে-কেউ ওটাকে কিনে নিতে পারেন।
 এবার গম্ভীর হলেন প্রেসিডেন্ট। বললেন, কটু কথা
 বলতে আপনি বাধ্য করলেন মসুয়ে রোদা। এমন একটা
 অশ্লীল মূর্তি কে কিনবে ? গোটা পারী যার বিরুদ্ধে
 সোচ্চার এমন একটা ‘অবসী’ মূর্তি কিনে নিজের বাড়িতে
 রাখবার মতো মানসিকতা অথবা হিম্মৎ আছে কোন্ দুঃসাহসী
 তরুণের !
 সালোর মতে ওটা যে ‘অশ্লীল’ এতক্ষণে সেকথা স্পষ্টভাবে
 স্বীকার করলেন প্রেসিডেন্ট।
 অগুস্ত্ জবাব দেবার সুযোগ পেল না। কারণ তার পূর্বেই দ্বার-
 প্রান্তে ধ্বনিত হল এ-প্রশ্নের প্রত্যুত্তর, ভুল বললেন, মসুয়ে
 ল্যো প্রেসিডেন্ট। তরুণ নেই, কিন্তু দুঃসাহসী বৃদ্ধ দু-একজন
 এখনও বেঁচে আছে ! ওটা আমার স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিন।
 অগুস্ত্ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। পিছন ফিরে দেখে
 দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন ছিন্নাত্তর বছরের এক বৃদ্ধ।
 —মেংর ! আপনি ?
 —হ্যাঁ, আমিই। শুনলাম, মূর্তিটা আজ অপসারিত হবে।
 তাই সংগ্রহ করতে এসেছি। তুই ওটার নাম দিয়েছিস্
 ‘পরাজিত’—
 —না মেংর। এখন ওর নাম : ‘ব্রোজযুগ’।
 —সেটাও সুপ্রযুক্ত নয়। ওর নাম : ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’ ! ‘ব্রোজযুগ’-এ
 হতাশা আসবে কেন ? সে তো অগ্রগতির প্রতীক !

অগুস্ত্ বলে, ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী’-তেই বা হতাশা আসবে কেন ?
 —যেহেতু ও লড়াই করার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাচ্ছে না।
 গোলিয়াথ্ ভয়ে পালিয়ে গেছে জানলে মিকেলাঞ্জেলোর
 ‘ডেভিড’ও অমনি মাথায় হাত দিয়ে হতাশার ভঙ্গি করত।
 আজকের পারীতে এই মূর্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো মূর্তি
 নেই দেখেই ও যেমন হতাশ হয়ে পড়েছে !
 প্রেসিডেন্ট বলেন, সত্যিই কি মূর্তিটাকে আপনার স্টুডিওতে
 পাঠিয়ে দেব মসুয়ে লেকক ? পোঁত একেলে ?
 —নিশ্চয়ই। না হলে এই বুড়ো বয়সে নিজে আসব কেন
 বলুন ?
 তারপর অগুস্ত্-এর দিকে ফিরে বলেন, ঠেলাগাড়ির সঙ্গে
 সমানতালে হাঁটতে পারব না রে। বুড়ো হয়ে গেছি। তুই
 বরং জোর কদমে ওদের সঙ্গে সঙ্গে যা। এই নে, চাবিটা রাখ !
 অগুস্ত্-এর দুচোখ তখন ঝাপসা হয়ে গেছে। বুঝতে পারে,
 দীর্ঘ এক দশক লেকক্ বৃথাই পরশপাথর খুঁজেছেন। তারপর
 ফিরে এসেছেন তাঁর ‘ওল্ড-গোল্ড’-এর কাছে। রাম-শ্যাম-যদু
 নয়—অগুস্ত্ রেনে রোদা।
 হাত বাড়িয়ে স্টুডিওর ডুর্বালকেট্ চাবিটা গ্রহণ করে।
 জীবনে ক’বার ?



লেকক্ এবার উঠে পড়ে লাগলেন। যুগ এগিয়ে
 চলেছে। নবাগত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে পূর্ব-
 যুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সমাজ-ব্যবস্থা
 জীবনের মূল্যবোধ, সব কিছুই পালটে যাচ্ছে।
 সাধারণ মানুষের স্বাধিকারচিন্তা, আত্মসম্মানের
 ধারণা নতুন আগমনী গাইতে শুরু করেছে।
 তারই প্রতিফলন দেখা দিচ্ছে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নাটকে, চিত্র-
 শিল্পে। ভিক্টর যুগো, আলেকজান্ডার দুমা এখনও দোঁদগু
 প্রতাপে জীবিত—কিন্তু প্রগতিশীল মানুষ নতুন পথের সন্ধান
 খুঁজছে ব্যালজাকে, এমিল জোলায়। কার্ল ফ্লবার্ট, দ্যোলে,
 ম্যালার্মে এবং বোন্সল্যের আনলেন নতুন মূল্যবোধ ;
 পূর্বাকাশে উদিত হচ্ছেন মোপাসাঁ। চিত্রজগতে ফরাসীদেশে
 দেলাক্রুয়ে-আঙরেকে অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন
 ইম্প্রেশনিষ্ট শৈলীর তরুণ শিল্পীরা—মানে, মনে, সিস্লে,
 রেনোয়ঁ, এমনকি তাঁদের সে শিল্পচিন্তা আরও নতুন
 নতুন ঢঙে বিকশিত হতে চাইছে তরুণের মতিস্, সেজান,

দেগা, তুলোস্-লুট্রেক্, ভ্যাঁস ভ্যাঁ গথ্-এ। শুধু ভাস্কর্যই পিছিয়ে পড়ে থাকবে ?

অগুস্ত্-এর সমর্থনে এগিয়ে এলেন এমিল জোলা, বদলের, ম্যালার্মে প্রভৃতি।

সালোঁ এ আন্দোলনকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারল না। বাধ্য হয়ে তিনজনের এক কর্মিটিকে পাঠালো অগুস্ত্-এর কাছে—তার শিল্পসম্বন্ধে ধারণা, শিল্পবোধ এবং বক্তব্যটা যাচাই করতে। তিনজনই নবীন যুগের—কবি স্ত্রিফেন ম্যালার্মে ; চিত্রশিল্পী অয়জেন কারিয়ে এবং ভাস্কর আলফ্রেড বুশে। অগুস্ত্ প্রথমটা স্বীকৃত হয়নি ; পরে যখন শুনল এই ডেপুটেশন পাঠিয়েছেন স্বয়ং অয়জেন গ্যাওম্, বো-আর্ৎ-এর তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক, তখন সে স্বীকৃত হল। ওঁরা তিনজনে একদিন ওর স্টুডিওতে এলেন—ইতিমধ্যে সে আবার একটা স্টুডিও ঘর ভাড়া করেছে। মেরী-রোজ সাধ্যমতো সেটাকে সাজিয়েছে। কিছু টাটকা ফুলের তোড়াও বেঁধেছে অতিথিদের আগমন সংবাদে। ওঁরা তিনজনে এলেন। দীর্ঘসময় অগুস্ত্-এর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। এমনকি ওঁদের উপস্থিতিতে অগুস্ত্ একটি টর্সো বানিয়ে তার নির্মাণ-পদ্ধতিও হাতে-কলমে দেখালো।

তিনজনই সন্তুষ্ট। বললেন, মসুয়ে রোদ্যাঁ, ‘রোজ্যুগ’ নিয়ে আপনাকে অন্যায্য আক্রমণ করা হয়েছিল, রাসেল্‌স্-এ এবং পারীতে। এতে একপক্ষে কিন্তু আপনার মঙ্গলই হয়েছে। আপনার শিল্পের বাস্তবতা যে কতদূর বাস্তব তার একটা অকাটা প্রমাণ রয়ে গেল শিল্প-ইতিহাসে ! আপনি আরও মূর্তি গড়ুন। পরের বছর যে মূর্তিটি আপনি সালোঁতে পাঠাবেন—কথা দিচ্ছি—তা বিনা প্রাথমিক বিচারে প্রদর্শিত হবে।

—পরের বছরের কথা পরের বছর। আপাতত আমরা ‘রোজ্যুগ’ ?

—সেটাও আপনি ঐ সঙ্গে দাখিল করবেন। একই সঙ্গে যাতে সেটাও প্রদর্শিত হয় সে বিষয়ে আমরা সুপারিশ করব।

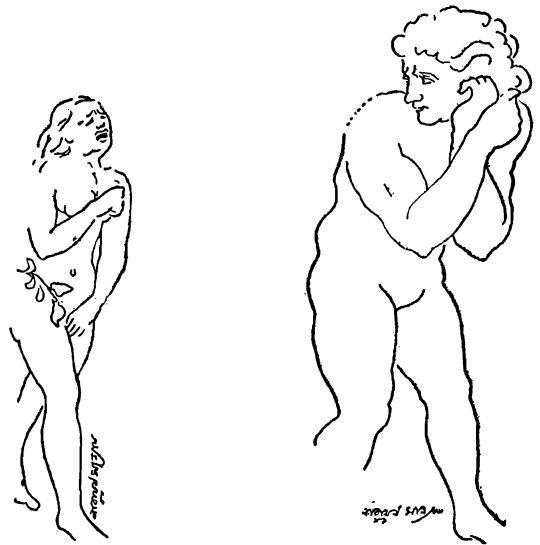
—ধন্যবাদ।

অগুস্ত্ এর পর যে ন্যুডটি গড়ে তার নাম ‘ঈভ’ (1881)। জ্ঞানবৃক্ষের ফলের রসাস্বাদনের পরের মুহূর্তটি। যে-কথা বার-বারে বলছি আবার সে-কথাই বলতে হচ্ছে। একটি

রোদ্যাঁ—৯

ক্লাসিকাল অনুভাবনা—বাইবেল বর্ণিত উপকথা—তিনি পরিবেশন করলেন ; কিন্তু উনবিংশ শতকের নূতন শিল্পদৃষ্টির দীপালোকে। এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির আইপীস্টাকে ঠিক মতো ‘ফোকস্’ করে নিতে হবে ; না হলে ভুল স্থানে ভুল মূল্য দিয়ে যাব ক্রমাগত। রোদ্যাঁ ভাস্করের অন্তর্লীন ব্যক্তিনাট অধরাই থেকে যাবে ; অহেতুক উজ্জ্বলপ্রবণ হয়ে তাঁর রিয়্যালিজম্-এ মুগ্ধ হব—তাঁর নারীমূর্তির পেলবতায়, রমণীয়তায় এবং পুরুষমূর্তিতে মাংসপেশীর বাস্তবতায় বিভ্রান্ত হয়ে বলব : ‘আহা, যেন অমর্ত !’

‘ঈভ’-অনুভাবনাটি ক্লাসিকাল—সহস্রাব্দির ঐতিহ্য মণ্ডিত। মাসাচ্চিও তাকে এঁকেছেন ফ্লোরেন্সের গীর্জায়, হাই-রেনেসাঁর



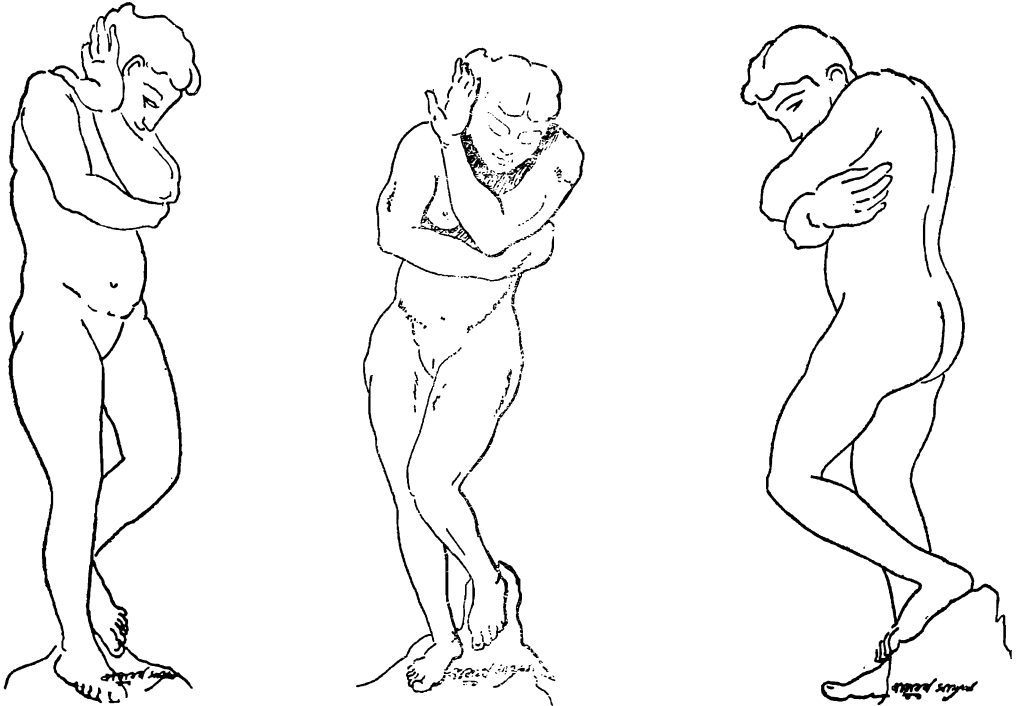
চিত্র—18 : ঈভ,
মাসাচ্চিও

চিত্র—19 : ঈভ,
মিকেলান্জেলো

উষাকালে। সেখানে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ‘ঈভ’ অনুশোচনায় আত্ননাদ করছে। পাপবোধের তাড়নায় সে মর্মান্বিত। এঁকেছেন মিকেলান্জেলো সিস্তিন চ্যাপেলের সিলিঙ-এ। লক্ষ্য করে দেখুন, মিকেলান্জেলোর ঈভ্ লগুড়াহতা কুকুরীর মতো পলায়নপর ! অর্থাৎ জ্ঞানবৃক্ষের ফল আশ্বাদনের পর ঈভের অনুশোচনা জেগেছে। সে নিঃস্ব। কাঙ্গাল। পথের ভিখারিণী। এটাই ছিল এতদিন ক্লাসিকাল ঈভ-এর বক্তব্য। ঈভ-এর অনুশোচনা, তার পাপবোধ, তার চরম হতাশাই এতদিন ছিল ‘ঈভ’ অনুভাবনার অনুষঙ্গ।

অগুস্তের ঈভ সে পথে যায়নি। সে অন্য কথা বলতে চেয়েছে। তার অনুশোচনাটুকুই এখানে বড় হয়ে ওঠেনি; পাপবোধ বা হতাশার কোনও লক্ষণই নজরে পড়ে না। নিঃসন্দেহে অগুস্তী-ঈভ লজ্জা পেয়েছে; কিন্তু 'লজ্জা পেয়েছে বলে' লজ্জা পায়নি। সে পলায়নপর নয়; থমকে দাঁড়িয়েছে মাত্র। নিজের যোনাঙ্গ বিষয়ে সদ্য-আহরিত জ্ঞানে সে সচেতন। দুটি হাতের বেষ্টনীতে সে স্তনযুগলকে আবৃত করেছে। দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করেছে তার বাম স্তন।

তাই বিড়লা আকাদেমিতে আমরা বারে বারে শিল্পস্বাদ পাইনি। দেখেছি, বুঝিনি। হতাশ হয়েছি। পাদপূরণের দায় যে আমারই তা কেউ বলে দেয়নি। আমার তো মনে হয়েছে ঐ বাঁ হাতের মুদ্রাটির পুরো বক্তব্য 'না না, ও কথা বল না। স্বর্গ হারিয়েছি বটে, কিন্তু তাতে দুঃখ করব কেন? বিতাড়িত হয়েছি? বেশ, চলে যাব। কিন্তু শুধু অনুশোচনা নিয়ে কেন? সুখস্মৃতিটুকুকেও নিয়ে যাব। তাছাড়া নতুন এক স্বর্গও তো পেলুম! সেটাই বা



চিত্র—২০ : ঈভ, রোদ্যাঁ (১৮৮১)

কিন্তু এ মূর্তির সার্থকতা তার বাঁ-হাতের মুদ্রায়। সে হাত যেন বলছে : না না, ছিঁছি, ও-কথা বল না ! কী কথা? কী বলব না? সেটা শিল্পী বলেননি। বলব তুমি-আমি। আগেই বলেছি, রোদ্যাঁ দ্বৈতবাদী। শিল্পী তৈরী চায়ের পেয়ালাটি বাড়িয়ে ধরবেন আর তুমি পাঁচকথা ভারতে-ভারতে আনমনে 'সিপ্' দেবে—সেটি হবে না। উনি ট্রে-তে দুধ-চিনি-লীকার সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে বাড়িয়ে ধরবেন; তুমি ইচ্ছামতো মেশাবে। তিক্ত-কষায় স্বাদ যদি হয় তার দায়ভাগ তোমাতেও বর্তাবে। ওঁর শিল্পের এই দ্বৈতবাদিতার কথাটা আমাদের আগেভাগে জানানো হয়নি।

কম কী ! কী সেই নতুন স্বর্গ? ওর সদ্য-আহরিত জ্ঞানের ফলশ্রুতি : এই জন্ম-মৃত্যু, হারিস-কান্না ভরা মর দুনিয়া। স্বর্গে আলো আছে, ছায়া নেই; কিন্তু ছায়াই তো আলোকে ফুটিয়ে তোলে ! স্বর্গে মিলন আছে, বিরহ নেই; কিন্তু বিরহই তো মিলনকে সার্থক করে তোলে। স্বর্গে সন্তানের মঙ্গল কামনায় 'নীলের-কোলে-বাতি-দেবার' প্রয়োজন হয় না, সেখানে তুলসীমণ্ডে প্রদীপ জ্বালতে হয় না, ঘরে-ফেরা মরদের রাত হলে উৎকণ্ঠায় অধীর হতে হয় না; অভুক্ত স্বামী-পুত্রের পাতে হাঁড়ির শেষকটা দানা পরিবেশন করে মিথ্যা বলার তৃপ্তি নেই; আমার ভাত

আলাদা সরানো আছে !

এই বেদনাময় আনন্দকে স্বর্গ চেনে না, জানে মর্ত্য।

ঐ আভঙ্গ-ঠামে দাঁড়ানো মেয়েটি, যার দক্ষিণপদে সংসারের যাবতীয় দায়বাক্তি বইবার গৃহিণী-প্রতিম দৃঢ়তা, যার বামপদ অভিসারিকার মতো চণ্ডল, সে স্বর্গ হারিয়ে নতুন স্বর্গ রচনার অধিকার পেয়েছে ! এ মূর্তিটি—শুধু এটিই নয়, সব ভাস্কর্যই ঘুরে ফিরে দেখার। স্বয়ং রোদাঁই একবার তাঁর বন্ধু এড্‌গার দেগাকে লিখেছিলেন, “আলোকচিত্রের মাধ্যমে কোনও ফটোগ্রাফার কোনদিন মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড’-কে ধরতে পারবে না। পূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য ডেভিডকে প্রদক্ষিণ করা প্রয়োজন।”—কিন্তু দ্বিমাত্রিক কাগজে কেমন করে আপনাদের হাত ধরে ঈভকে প্রদক্ষিণ করি ? তাই দুধের স্বাদ আপাতত পিটুলি-গোলাতেই পরিবেশন করি। তিন-তিনটি স্কেচে ঈভকে ধরবার চেষ্টা করেছি—তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে।

ঈভ-এর মডেলের গম্প বালি এবার। কীভাবে এই ভাস্কর্যের অনুপ্রেরণা পেলেন উনি। ঈভ-এর মডেল মেরী-রোজ ব্যুরে নয়, লীজা ! না, ওর কৈশোর কালের সেই ডেমি-মন্ডেন মাদমোয়াজেল লীজা নয় ; এ অন্য একটি মেয়ে।

অগুস্ত্‌ যখন ইতালী প্রদক্ষিণ করছিল—তুরিন, জেনোয়া, পীসা, ফ্লোরেন্স এবং রোম, তখনই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পাঁপিনোর। লোকটা বিদেশী টুরিস্ট পাকড়াও করে গাইড-এর কাজ করত। ইতালিয়ান কিন্তু ইংরাজী ও ফ্রেঞ্চ ভাড়াভাড়া বলতে পারে। তার দেহাকর্ষিততে আকৃষ্ট হয়েছিল অগুস্ত্‌। বলেছিল, কখনও পারীতে এলে আমার সঙ্গে দেখা কর। তোমাকে মডেল করে একটা মূর্তি গড়বার ইচ্ছা রইল। সেই কথা স্মরণে রেখে বছর তিনেক পরে ঘুরতে ঘুরতে পাঁপিনো একদিন পারীতে ওর স্টুডিওতে এসে হাজির। অগুস্ত্‌ তাকে বহাল করে দৈনিক পাঁচ ফ্রাঁতে। ওকে মডেল করেই বানিয়েছিল ‘জন দ্য ব্যাপতিস্ট্‌’।

কিছুদিন পরে লোকটা আবার এসে হাজির। বলে, কাজ কাম আছে স্যার ?

অগুস্ত্‌ দেখে লোকটা এবার একা আসিনি ! তার সঙ্গে একটি যুবতী। বছর চরিশ-পঁচিশ। স্বাস্থ্য ভালো। অগুস্ত্‌ জানতে চায়, ও কে ? তোমার বউ ?

—না না মেথর ! বউ হবে কেন ? ও লীজা ; সম্পর্কে আমার বোন হয়। ও রোম থেকে চলে এসেছে বুজিরোজগারের

ধান্দায় !

অগুস্ত্‌ জানালো, পাঁপিনোকে মডেল করে কিছু বানানোর বাসনা তার আপাতত নেই, কিন্তু লীজা রাজি হলে তাকে মডেল করে সে কিছু গড়তে পারে।

লীজা এতক্ষণে আলোচনায় অংশ নেয়, কত করে মজুরী দেবেন, বাবু ?

—দৈনিক পাঁচ ফ্রাঁ। যা সবাইকে দিই।

—কী বানাবেন আমাকে নিয়ে ?

—তা এখনই কেমন করে কবুল করি ? আর তা নিয়ে তোমার কেন মাথাব্যথা ?

—না, আমি জানতে চাইছি, আমাকে কি ‘ইয়ে’ হতে হবে ?

—হ্যাঁ হবে। ‘ইয়ে’ না হলে পয়সা দিয়ে মডেল পুষব কেন ?

লীজা মাথা ঝাঁকায়, তাহলে পাঁচ ফ্রাঁ হবে না। পোষাক খুলতে হলে দশ ফ্রাঁ দৈনিক চাই।

অগুস্ত্‌ বলে, তাহলে পথ দেখ বাছ। এখানে সুবিধা হবে না।

অনেক দরাদরির পর দৈনিক সাত ফ্রাঁতে লীজা রাজি হল।

তাও সর্বসাপেক্ষে। প্রথম সর্ব, মজুরি তাকে দৈনিক মিটিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় সর্ব, সে যখন বিবস্ত্রা অবস্থায় মডেল-স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়াবে তখন স্টুডিওতে অন্য কোনও পুরুষ-মানুষকে ঢুকতে দেওয়া চলবে না।

অগুস্ত্‌ বলে, অচেনা-অজানা কেউ আসবে না ; কিন্তু

পাঁপিনোকে আমার দরকার হতে পারে। হয়তো একই সঙ্গে

তারও কোন মূর্তি গড়ব আমি।

প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে লীজা, না না ; সে কিছুতেই হবে না। ও আমার দাদা !

পাঁপিনোও হাঁ-হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটা কী বলছেন মেথর ? লীজা আমার ছোট বোন, সে যখন ‘ইয়ে’ হয়ে স্টুডিওতে...ছিঃ ছিঃ ! তা হতেই পারে না।

অগত্যা তাই স্থির হল।

প্রথম দিনসাতক অগুস্ত্‌ মনস্ত্রির করতে পারছিল না—সে

কী গড়বে। বিবস্ত্রা অবস্থায় লীজাকে ক্রমাগত পদচারণা

করতে হয়েছে, আর দূর থেকে ও স্কেচ করে গেছে। সামনে

থেকে, পাশ থেকে, পিছন থেকে। লীজা বারে বারে জানতে

চেয়েছে—কেন মূর্তি গড়ার কাজে হাত দিচ্ছেন না ভাস্কর !

অগুস্ত্‌ ধমক দিয়েছে, তাতে তোমার কোন্‌ পাকাধানে মই

দেওয়া হচ্ছে ? মজুরি তো তুমি পাচ্ছই !

তা পাচ্ছে। পাপিনো ওকে পৌঁছে দিয়ে যায়। আবার দিনান্তে এসে বোনকে বাড়ী নিয়ে যায়, টাকা গুণে নিয়ে। তারপর একদিন অগুস্ত-এর আদেশে লীজা উঠে দাঁড়িয়েছে মডেল-স্ট্যাণ্ডে। অগুস্ত তার অভ্যস্ত 'অন্ধের হস্তদর্শনের' ভঙ্গিমায়ে এগিয়ে আসে। লীজা প্রথমটা আপত্তি করেছিল; পরে ধমক খেয়ে চুপ করল। নির্মীলিত নেত্রে ভাস্কর স্থাপন করল তার দুহাত ওর মাথায়। নেমে এল কাঁধ বেয়ে বাহুমূলে, ক্রমে আঙুলের ডগায়। তারপর কণ্ঠদেশ থেকে স্তন্যগ্রচূড়ায়। লীজা একটু উসখুশ করল, কিন্তু আপত্তি করল না আর। এবার বক্ষদেশ থেকে দশটি আঙুল নামতে নামতে এল ওর তলপেটে। এসেই থমকে গেল। শিউরে উঠল লীজা। এবং অগুস্ত। এক পা পিছিয়ে গিয়ে অগুস্ত বলল, এ কী! এ কথা বলনি কেন?

—কী কথা?

দৃষ্টি যা বোঝানি এতদিন, শিম্পীর আঙুল তা বুঝে ফেলেছে। বলে, ক' মাস?

লীজা নিবুত্তর। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়। যেন এইমাত্র জ্ঞানবৃক্ষের ফলাস্বাদ হল ওর।

—তুমি যে মা হতে চলেছ সে কথা বলনি কেন?

নির্বাক লীজা সহসা দুটি হাতে আবৃত করে তার স্তনদ্বয়।

—পেটে যেটা এসেছে তার বাপ কে? পাপিনো?

লীজা শিউরে ওঠে। জবাব দিতে পারে না। মাথাটা আরও নেমে আসে। বাঁ-হাতটা তুলে যেন বলতে চাইল: হি হি! ও-কথা বল না।

আর সেই খণ্ড-মুহূর্তেই শিম্পী খুঁজে পেল তার বিষয়বস্তু: ঈভ্!

বললে, তুমি না বলেছিলে, ও তোমার দাদা?

—কাজিন!

—তোমাকে এতদিন যে মজুরী দিয়েছি তা ফেরত দিতে হবে। তোমাকে নিয়ে কী গড়ব আমি?

হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালো লীজা। অনাবৃত এখন নিঃসঙ্কেচ। বললে, কেন? মা হওয়া কি অপরাধ? পাপ?

না! মাতৃত্ব কোন অপরাধ নয়। পাপ নয়। স্বর্গ থেকে বিদায়-মুহূর্তে ঈভ্ যদি একই রকম দৃষ্টভঙ্গিতে স্বয়ং জগদীশ্বরকে ঐ প্রশ্নটা পেশ করত তাহলে তিনি কী জবাব দিতেন?



কিছুদিন পর একটা চিরকুট পেল ফাদার এই-মার্ড-এর কাছ থেকে। উর্ন লিখেছেন, 'তুমি আমার যে হেড-স্টাডিটা করেছিলে ইতিমধ্যে তার একটা ব্রোণ্ড রেন্সিকা ঢালাই করা হয়েছে। একদিন যদি চার্চে আস,

তাহলে তোমাকে দেখাতে পারি। অনেকদিন দেখিনি—যদিও খবর রাখি, কাঁটার মুকুটটার সন্ধান তোমার অভিযাত্রা অব্যাহত আছে। জেনেছি—ব্রাসেল্‌স্ এবং পারী—দুটো সালোঁই তোমার মাথায় সেই কাঁটার রাজমুকুট পরিয়েছে!'

অনেক-অনেকদিন পরে ফাদার এইমার্ড-এর চিঠিটা পেয়ে ওর ভালো লাগল। তাঁকে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। অথচ ফাদার তাকে ভোলে ননি। এটাই বোধহয় দুনিয়ার নিয়ম। নৌকা এগিয়ে চলে নতুন-নতুন দেশে; পিছনের কথা সে ভুলতে ভুলতে চলে। তার দৃষ্টি সমুখ পানে। নূতন দিগন্তের দিকে। কিন্তু পিছল ঘাট থেকে ঐ তরীকে যে প্রথম ঠেলে দিয়েছিল মাঝ-গাঙের দিকে, সে স্থাবর। দুটি চোখ মেলে সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিলীয়মান জলযানের দিকে—যতক্ষণ না নৌকাটা ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যায়, অথবা নদীর বাঁকে যায় হারিয়ে।

অগুস্ত চার্চে এসে ফাদার এইমার্ড-এর সঙ্গে দেখা করল। কৈশোরের পরিবেশটা ভালই লাগল তার। অনেক কিছু বদলে গেছে। নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। প্রার্থনাকক্ষটা সম্প্রসারিত হয়েছে। ফটকের বাঁয়ে যে চেস্টনাট্ গাছটা ছিল সেটা নেই। সিমেন্টারিটা ঘিরে একটা রৌলিং গড়ে উঠেছে। বদল হয়নি শুধু চূড়ার ঐ কুশটার; আর বদল হয়নি ফুলের কেয়ারিগুলোর। কুশটা স্থির, লাইট-হাউস্-এর মতো মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে ঠায়। আর স্থাবর ঐ ফ্লাওয়ার-বেড-এর জেরিনিয়াম-এ্যাস্টর-পপি-ডায়ান্থাস্-ফ্লক্‌স্। বিদায়ের দিনে যে ফুলটি যেখানে হাসছিল আজও তারা সেখানেই হাসিমুখে হাজির। অগুস্তকে দেখে সবাই যেন সম্মুখে বলে ওঠে: আরে এই তো! এ্যাণ্ডিন কোথায় ছিলে হে?

ফাদার ওকে সমাদর করে নিয়ে এসে বসাতে চাইলেন তাঁর ড্রইংরুমে। সেলায়ের পাঞ্জাটা খুলে দুটি গ্লাস বার করে আনলেন। বলেন, কী পান করবে বল?

অগুস্ত বললে, ফাদার, কিছু যদি না মনে করেন, আমি প্রথমেই একবার চার্চে যেতে চাই। আপনার সঙ্গে। দুটি মোমবাতি

জ্বলে দিয়ে আসি।

ফাদার এইমার্ড অটহাস্য করে ওঠেন, কী পাগল হে তুমি! তুমি চার্চে যেতে চাইছ, তাতে আমি 'কিছু মনে করব'? কেন? তোমাকে একদিন আমি চার্চ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বলে?

অগুস্ত্ লজ্জা পায়। বলে, না, না, তা নয়। চলুন, চার্চের ভিতরটা দেখে এসে বসা যাক।

ফাদার কথাপ্রসঙ্গে বললেন, অগুস্ত্, এবার তুমি ধর্মীয় কোন বিষয় নিয়ে একটা ভাস্কর্য রচনা কর। এ-কথা বহু-বছর আগেই আমি বলেছিলাম, তুমি কথার প্যাঁচে আমাকে বিপদে ফেলে আমারই মূর্তি গড়লে।

অগুস্ত্ বলে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে নতুন কী গড়ব ফাদার? সেই এ্যানান্সেশন, মাদোনা, মাগ্দালেন, লাস্ট-সাপার, ক্রিস্টিফকেশন, পীতা অথবা রেজারেকশন।

—তা কেন? বাইবেল হচ্ছে রস্বাকর। তুমি 'নোয়ার আর্ক' গড়তে পার, তীর্যবদ্ধ সেণ্ট সিবার্টিয়ান গড়তে পার। ক্রুশ হাতে সেণ্ট হেলেনাকে গড়তে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে পড়াশুনা করতে হবে! তুমি যদি উৎসাহী হও তাহলে আমার গ্রন্থাগারে এসে খুঁজে দেখতে পার। দু-তিনশ বছরের প্রাচীন অনেক পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। বাইবেলের কাহিনীগুলির উপর রচিত নানান উপকাহিনী। বিগত যুগের ফাদাররা লিখেছেন।

অগুস্ত্-এর মনে পড়ল—ঠিক এভাবেই ফাদার নিকোলা একদিন মিকেলাঞ্জেলোকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থাগারে।

রাজি হল সে। প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি হাঙড়াতে থাকে। সাধুসন্তদের লেখা—সাধুসন্তদের জীবনী। খুঁজতে খুঁজতে একদিন পেয়েও গেল। অদ্ভুত একটা উপকথা: সেণ্ট জন দ্য ব্যাপতিস্ট্!

জন চাষার ছেলে। যীসাস্-এর পূর্বসূরী। জর্ডনের জলে তিনিই যীসাস্কে পরে ব্যাপটাইস্ট করেন। যীশু আবির্ভূত হবার পূর্বযুগে জন ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন—খুঁজতে। সত্য-সুন্দরের সন্ধানে তাঁর অভিযাত্রা। নির্জন মরুভূমিতে এক ক সাধনায় আকাশের দিকে দু-হাত তুলে তিনি আত্ননাদ করতেন: প্রভু! আলো দেখাও! পাপে এ পৃথিবী পূর্ণ হয়ে গেছে! এখনও কি দ্রাণকর্তার আবির্ভাবের মহান লগ্ন

আসেন?

তারপর একদিন জন প্রত্যাদেশ পেলেন: প্রভু যীশু আসছেন! দ্রাণকর্তারূপে! ঈশ্বরপ্রেরিত নবীর বেশে।

মরুভূমি থেকে ফিরে এলেন তরুণ সন্ন্যাসী। বলিষ্ঠগঠন যুবাপুরুষ তিনি। একমাথা অবিন্যস্ত চুল, একমুখ ঘনকালো দাড়ি। ইতিমধ্যে মরুভূমির দুরন্ত ঝটিকায় তাঁর জীর্ণবস্ত্রের শেষ সূতোটি পর্যন্ত যে অপহৃত হয়েছে সে বোধ নেই সন্ন্যাসীর। জেরুসালেমের পথে পথে দিগম্বর সাধক আগমনী গান গেয়ে ফেরেন: তোমরা প্রস্তুত হও! তিনি আসছেন! জগৎ-দ্রাতা!

শিষ্যরা বলে, 'তিনি' কে? আপনি নিজেই তো মহাসন্ন্যাসী! আপনিই তো আমাদের পথ দেখাচ্ছেন।

জন বলেন, না না! আমি তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। তাঁর পায়ের জুতোর ফিতেটা বেঁধে দেবার মতো যোগ্যতাও আমার নেই!

এ পর্যন্ত বাইবেলের কাহিনী। বাইবেল আরও বলেছেন, জেরুসালেম-এর তদানীন্তন রোমান গভর্নর হেরাড-এর আদেশে জনকে বধ করা হয়। এই কাঠামোটুকু অবলম্বন করে বিগত যুগের সন্ন্যাসী যে উপকাহিনীটি রচনা করে পাণ্ডুলিপি আকারে গ্রন্থাগারে রেখে গেছেন তা এই রকম:

সালোমে ছিল গভর্নর হেরাড-এর আত্মজা। অষ্টাদশী, অসামান্য রূপসী এবং কামার্তা। নানা ব্যাভিচারে সে লিপ্ত। রাজপথে বিচরণরত দিগম্বর তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে তার মনে উদয় হল কামভাব। রাজ্যদেশে কৌশলে বন্দী করা হল সন্ন্যাসীকে। তাকে কারাবদ্ধ করা হল এক নির্জন কক্ষে। গভীর রাতে অভিসারিকার বেশে বন্দীর নির্জন কারাকক্ষে আবির্ভূত হল রাজপুত্রী। তরুণ সন্ন্যাসী তখনও দিগম্বর। পাষাণশয্যা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন। প্রদীপ তুলে রাজপুত্রী দেখল তাঁকে। মোহিত হয়ে গেল। আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করতে চাইল বন্দীকে। কিন্তু পরিবর্তে লাভ করল তীর ভৎসনামিশ্রিত প্রত্যাখ্যান। জীবনে কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি সালোমে। তার সঙ্গলাভের জন্য জেরুসালেমের যাবতীয় তরুণ উন্মাদ। প্রচণ্ড আঘাত পেল উপেক্ষিত। স্থির করল, চরম প্রতিশোধ নেবে সে। নিলও। প্রতিহিংসা-পরায়ণার চক্রান্তে পরদিন রাজ্যদেশে জনের শিরশ্ছেদ করা হল।

সুধীজনমাত্রেরই স্মরণ হবে, এই একই প্লট নিয়ে অস্কার ওয়াইল্ড্ রচনা করেছিলেন একটি অনবদ্য নাটিকা : 'সালোমে'।

এখানে দুটি প্রশ্ন আমি পণ্ডিত-পাঠকদের উদ্দেশ্যে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ এদুটি অনুপপত্তির সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। এ বিষয়ে কোনও পণ্ডিত আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তথ্যটা সর্বসাধারণের দরবারে পেশ করতে পারি। প্রথম প্রশ্নটি এই : আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্ড্ 'সালোমে' নাটক লিখেছিলেন ১৮৯৩ সালে ; অর্থাৎ রোদঁয়ার 'জন দ্য ব্যাপতিস্ত' ভাস্কর্যের পনের বছর পরে। ফলে নাটকের প্রভাব ভাস্কর্যে পড়েনি ; ভাস্কর্যের প্রভাব নাটকে পড়েছিল কি ? 'সালোমে' উপকাহিনীর মূল উৎস কোথায় ? আমি এখানে যে কথা বলেছি : রোদঁয়া প্রাচীন গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি অবস্থায় কাহিনীটি উদ্ধার করেছিলেন, তা আমার কল্পনা, 'ঔপন্যাসিক সত্য'—বাস্তব তথ্য নয়। তাহলে বাস্তব তথ্যটা কী ? অস্কার ওয়াইল্ড্-এর কপোল-কল্পনা হলে তার দেড়দশক আগে রোদঁয়া এই অনুপ্রেরণাটি পেলেন কোথায় ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : আইরিশ লেখক আজীবন ইংরাজী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে শুধুমাত্র 'সালোমে' নাটকটা ফরাসী ভাষায় লিখলেন কেন ? রোদঁয়ার 'জন দ্য ব্যাপতিস্ত' কি তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ঐ কাহিনীটি উদ্ভাবনে—যদি না দুটি শিল্পকর্মের কোনও মূল এবং সাধারণ উৎস থেকে থাকে ?

সে যাই হোক, অগুস্ত্-এর মাথায় তখন 'জন দ্য ব্যাপতিস্ত' ক্রমাগত পদচারণা করছেন ! তিনি জন্ম, থামতে জানেন না। জনপদ থেকে জনপদে প্রচার করে চলেছেন, 'ওঠে ! জাগো ! তিনি আসছেন !' তিনি নিজে সচেতন নন যে, তিনি দিগম্বর ; অথচ কামনা-বাসনায় জর্জরিত সালোমে-প্রতিম দর্শক তাঁকে দেখে শিউরে উঠছে। আকৃষ্ট হচ্ছে, মুগ্ধ হচ্ছে। 'অবজেক্টিভলি' তিনি ইন্ড্রিয়জ কামনা-বাসনার উদ্বেগ—জৈন তীর্থঙ্করদের মতো, শিবের মতো, লাকুলীশের মতো, শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বরের মতো। 'সাব্জেক্টিভলি' মূর্তিটির আবেদন কী-জাতের তা নির্ভর করবে তোমার আমার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। কী-চোখে আমরা দেখব। সালোমের দৃষ্টিতে, না ফাদার এইমার্ড-এর দৃষ্টিতে।

এই সময়েই একদিন পাপিনো ওর স্টুডিওতে এসে হাজির।

বলে, চিনতে পারেন, মেংর ? রোমে আপনি বলেছিলেন পারীতে এলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে ? আমি পাপিনো। অগুস্ত্ বললে, মনে আছে। তুমি মাসখানেক দাঁড়ি কামাওনি দেখছি। কেন হে ?

—সময় পাইনি, মেংর ! এবার কামাবো।

—না, কামিও না। কাল থেকে তুমি সিটিং দেবে। তোমাকে আমার দরকার।

—কী গড়বেন মেংর ?

—সেন্ট জন দ্য ব্যাপতিস্ত্ প্রীচিং !

পাপিনো আঁৎকে ওঠে। বলে, সেন্ট জন ! আমি যে পাপিনো, পাপী !

জন-এর দক্ষিণ তর্জনী যেন ইঙ্গিত করছে যীশুর আবির্ভাবের কথা। অথবা তা বলতে চায় : জাগো ! ইন্ড্রিয়জ কামনা-বাসনার মোহাক্ষকার থেকে জাগরিত হও। বাঁ-হাতের তর্জনীতে বোধকরি বাইবেলের সেই পংক্তিটির ব্যঞ্জনা—'তঁার জুতোর ফিতে খুলে দেবার যোগ্যতাও আমার নেই।' কিন্তু এ ভাস্কর্যের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য যতির মধ্যে গতির প্রকাশ। জন-এর দুটি চরণই ভূমিস্পর্শ করে আছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ দেহটা গতিময়। গতির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার সহজতম পন্থা—মূর্তির একটি পা'য়ের, সচরাচর পিছনের-পায়ের, গোড়ালীকে শূন্যে রাখা। শুধু আঙুলগুলো ভূমিস্পর্শ করে থাকবে। যেমন আছে 'ডিসকোবোলস্'-এর বাঁ-পায়ে, অথবা 'লাকুন-গ্রুপ'-এর তিন-তিনটি মূর্তিতেই। শিল্পীমাত্রেরই 'গতি' সম্বন্ধে এই সহজ সূত্রটা জানেন। কিন্তু কখনও কখনও কোনও দুঃসাহসী শিল্পী গতির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে ঐ সরল সমাধানটার আশ্রয় নেন না। যেমন, তাজোর-এর নটরাজ মূর্তি। তাঁর একটি চরণে দেহভার ন্যস্ত। কিন্তু তাও ব-নৃত্যছন্দ্র-ব্যঞ্জনাময় চরম-গতির প্রতীক নটরাজের সেই চরণটি সম্পূর্ণভাবে ভূমিস্পর্শ করেছে—বুড়ো-আঙুল থেকে গোড়ালির সবটাই। তাতে কিন্তু গতিময়তার অভাব হয়নি। প্রসঙ্গত রোদঁয়ার সংগ্রহে একটি নটরাজ মূর্তি ছিল। এবং নটরাজ মূর্তির সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—'Art Asiaticce, III, Sculpture Sivaïtes'-এ। এ-ক্ষেত্রেও জন-এর দুটি চরণই সম্পূর্ণভাবে পাদপীঠকে স্পর্শ করে আছে—ভবু গতিময়তা তিলমাত্র ব্যাহত হয়নি।

শোনা যায়, এ ভাস্কর্য গড়বার সময় পাপিনো ক্রমাগত পদচারণা করতে বাধ্য হয়েছিল। তাকে শিপ্পা ক্ষণেকের তরেও দাঁড়াতে দেননি। মূর্তিটা শেষ হবার পর পাপিনো হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এ কয় মাসে যা হেঁটেছি তাতে পারী থেকে রোম পৌঁছে যেতুম।

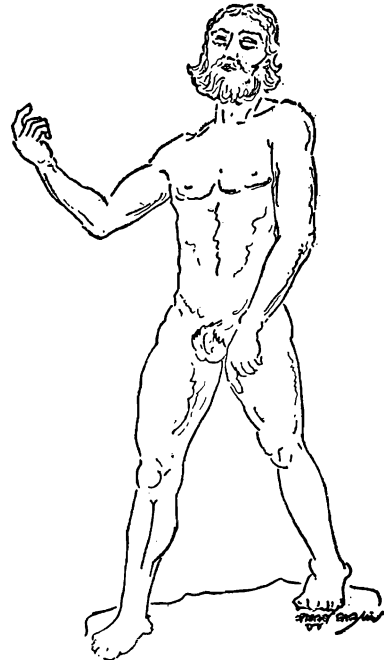
অগুস্ত্ হেসে বলে, গেলেই পারতে!

—কেমন করে যাব মেংর্! কুকুরে কামড়ে দিত যে!

—কেন, কুকুরে কামড়াবে কেন?

অগুস্ত্-এর স্টুডিওতে। তাঁদের মুখপাত্র হিসাবে কবি ম্যালার্মে বল্লেন, মসুয়ে রোদ্যাঁ, আমরা আপনার এ শিপ্প-সৃষ্টিতে মুগ্ধ। সালোঁ এটি প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করতে স্বীকৃত; কিন্তু একটি ছোট্ট সতর্ক আছে। আপনি যদি একটি অলিভ পাতায়...

অগুস্তের ভ্রুগুলে জাগল কুণ্ডন। বলে, বাইবেল কি বলেননি—মরুভূমির দুরন্ত ঝড়ে জন-এর পরিধেয় বস্ত্রের শেষ সুতোটি পর্যন্ত নিশিচ্ছ হয়েছিল?



চিত্র—21 : সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট্ প্রীচিং (1878)

—বাঃ! আপনি আমার প্যাণ্টলুনটা কেড়ে রেখেছিলেন যে! কুকুরে তাড়া না করলেও পুলিশে তাড়া করত। ওরা তো জানে না, আমি সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট্!

ভাস্কর্যটি যখন সালোঁতে পাঠানো হল, তখন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কর্তৃপক্ষ।

সেন্ট জন সম্পূর্ণ নগ্ন।

নিষ্ঠা নিয়ে ভাস্কর ওঁর যোনাঙ্গটি উৎকীর্ণ করেছেন—বোধ করি সালোঁমের উপকথাটি স্মরণে থাকায়।

অনতিবিলম্বে সালোঁর প্রতিনিধিবৃন্দ—সেই দ্বয়ী—এলেন

—বলেছেন। কিন্তু বাইবেল পাঠযোগ্য সাহিত্য। এটা দৃশ্যকাব্য।

—মিকেলাঞ্জেলোর ‘ডেভিড’ কি সম্পূর্ণ নগ্ন নয়?

—মসুয়ে রোদ্যাঁ। ‘ডেভিড’ সেন্ট নয়। সে বীর!

একগুঁয়ে জেদী ভাস্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি দুর্গুণ্য। আপনাদের অনুরোধে আমি আমার শিপ্পদর্শনের ব্যাপারে কোনও আপস করব না। করতে পারি না।

—তার মানে সালোঁর সাহায্য চান না আপনি।

—চুলোয় যাক আপনাদের সালোঁ আর ব্যো-আর্ৎ! আমার যদি সৃজনী-প্রতিভা থাকে তবে সারা পৃথিবীকে একদিন

সে-কথা স্বীকার করতে হবে ; সালোঁও তখন নতজানু হয়ে
সে-কথা মেনে নেবে !

ওঁরা নতমস্তকে ফিরে গেলেন।

মেরী-রোজ ওঁদের সামনে আসেনি। আড়ালে দাঁড়িয়ে
শুন্ছিল এতক্ষণ। ওঁরা চলে যেতে সে ঘরে এসে বললে,
অমন কড়া কথাগুলো না বললেই পারতে।

—তুঁয়! এসব বুঝবে না।

বুঝবে না, বুঝবে না, বুঝবে না ! মেরী-রোজ কোনদিনই কিছু
বুঝবে না। বুঝ্বেওয়াল্লা একমাত্র ওর মরদ ঐ অগুস্ত্ রোদ্যাঁ !

কিন্তু ওখানেই শেষ হল না ব্যাপারটা। পরদিন সালোঁর
পক্ষ থেকে আবার দেখা করতে এলেন এক শিম্পবোন্ধা।
একাকী। স্টুডিওর কড়া নাড়তে দোর খুলে দিল মেরী-
রোজ। ভূত দেখল যেন। বললে : আপনি ?

—হ্যাঁ। মসুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যাঁ আছেন ?

মেরী-রোজ ঘাবড়ে যায়। তবে কি সে চিনতে ভুল করেছে ?
ওরেস লেকক দ্য বোয়াবোদ্রান চিরকাল অগুস্ত্কে তুই-
তোকারি করেন—রোজ জানে। ততক্ষণে সদর দরজার কাছে
উঠে এসেছে অগুস্ত্। লেকক কোনদিন তার স্টুডিওতে
আসেননি। অগুস্ত্ও কখনও তাঁকে আমন্ত্রণ করেনি।
মেরী-রোজ-এর জন্য। দশ বছর আগে যে কথোপকথন
হয়েছিল অগুস্ত্ তা ভোলেনি। তবু লেকককে দেখেই ও
বুঝতে পারে ব্যাপারটা কী হয়েছে ! হঠাৎ রক্ত চড়ে যায়
মাথায়। গুরুকে আহ্বান করে না। বরং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে
ওঠে, এট ট্যু ব্রুতাস্ ! আপনিই না একদিন বলেছিলেন
আপস করার চেয়ে উপোস করা ভাল ? মাপ করবেন মেৎর !
আমি রাজি নই !

দরজার দুই চৌকাঠে দু-হাত বাড়িয়ে প্রবেশপথটা ব্লক করে
দাঁড়িয়ে আছে অগুস্ত্। লেকক তখনও পথে।

শান্ত সমাহিত কণ্ঠে লেকক বলেন, মসুয়ে রোদ্যাঁ। আমি
বত'মানে সালোঁর অফিশিয়াল প্রতিনিধি। আপনি আমাকে
'মেৎর' সম্বোধন করবেন না। বলুন : মসুয়ে লেকক !

অগুস্ত্ রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা করে : কী
বলতে চাইছেন ?

—এই পথের উপর দাঁড়িয়েই তা বলব ?

—না না। আসুন, ভিতরে এসে বসুন। কী বলতে এসেছেন
আপনি ?

লেকক ওর স্টুডিওতে প্রবেশ করলেন। নিজেই ওর ওয়ার্ক-
টুলটা টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, বলতে তো আর্সিনি
কিছু ; শুনতে এসেছি। কেন আপনার জিদটাই বড় হল ;
কেন সালোঁর প্রস্তাবটা আপনি প্রত্যাখ্যান করলেন ?

অগুস্ত্ মহাভারত পড়েনি। না হলে হয়তো ওর মনে হত
এবার দ্রোণপর্বের দ্বৈরথ সমর শুরু হচ্ছে। নিজেও একটা টুল
টেনে নিয়ে বসে। গভীরভাবে বলে, সে-কথা আমি গতকালই
বলেছি মসুয়ে ম্যালার্মেকে। আবার বলছি : মিকেলাঞ্জেলোর
'ডেভিড' যদি নগ্ন হতে পারে, তবে 'জন'ও পারেন। সেণ্ট
হলেও তিনি নরদেহধারী, মর-মানুষ। না হলে সালোঁমে
তাঁকে ভজনা করতে যেত না।

লেকক বলেন, মসুয়ে রোদ্যাঁ, আমরা 'ডেভিড'-এর সঙ্গে
'জন'-এর তুলনা করছি না, করছি মিকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যের
সঙ্গে আপনার ভাস্কর্যের। যেহেতু মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড'
আকারে সাধারণ মানুষের তিনগুণ বড়, তাই তার যোনাঙ্গ
দর্শককে কোনও বাস্তব আঘাত দেয় না। তুলনায় আপনার
'রোজয়ুগ' হুবহু একটি মানুষের দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। দর্শকদের
দোষারোপ করবার আগে শিম্পীর কি আত্মজিজ্ঞাসা করার
প্রয়োজন ছিল না—কেন তিনি মূর্তিটা এমন সমান মাপের
গড়লেন ? কিছুটা বড় অথবা কিছুটা ছোট করে গড়লে
ওটা অত নগ্ন লাগতো না, ছাঁচে ফেলার অভিযোগও উঠত
না। হুবহু নকল করা তো শিম্পের উদ্দেশ্য নয় ?

অগুস্ত্ একটু চিন্তায় পড়ল। কথাটা ভাববার।

—দ্বিতীয় কথা, সিস্তিন চ্যাপেলের 'শেষ বিচারের' কথাটা
ভেবে দেখুন। সেখানে শতাব্দিক ন্যূদ আছে—নারী ও পুরুষ
—কিন্তু একটি মাত্র ধর্মীয় ফিগর কি আপনি দেখাতে পারেন
যিনি বিবস্ত্র ? মা-মেরী, যীসাস, সেণ্ট পীটার, সেণ্ট বার্থেলেম্যু
এবং হ্যাঁ, সেণ্ট জন—যিনি দিগম্বররূপে ধর্মপ্রচার করতেন
—তঁরা সকলেই বস্ত্রাচ্ছাদিত। কেন ? আপনার কী
ধারণা ? মিকেলাঞ্জেলো ভীত ? না কি উপোস এড়াতে
আপস করেছিলেন ?

পুরো একমিনিট অগুস্ত্ নিস্তব্ধ। তারপর অস্ফুটে বলে, কিন্তু
মাত্র গতকালই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি ! আজ নতুন করে—

—আপনি কেন করবেন ? আপনি শুধু অনুমতি দেবেন।
তা আপনি দিয়েছেনও, আমাকে, এই মুহূর্তে। অপর কেউ
অলিভ পাতটা গড়ে দেবে।

অগুস্ত্-এর নাসারক্ত স্ফূর্তিত হয়ে ওঠে। গম্ভীরকণ্ঠে বলে, অপর কেউ! অপর কেউ অগুস্ত্-রেনে রোদাঁয়ার ভাস্কর্যে দুটি সংশোধন করবে! কে? কে সেই মহান শিল্পী অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?

হঠাৎ অট্টহাস্য করে ওঠেন লেকক্। বলেন, এতক্ষণে তুই একটা শক্ত প্রশ্ন করেছিস্ অগুস্ত্। তা বটে! অগুস্ত্-রেনে রোদাঁয়ার দুটি সংশোধন করবার হিম্মৎ কার আছে! কিন্তু শিল্পতীর্থ পারী-শহরে কি এমন একটি মাত্র শিল্পীকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে ছোট্ট একটা অলিভ পাতা গড়তে শিখেছে!

অগুস্ত্-গুম মেরে যায়। বুঝতে পারে না-ঐ অট্টহাস্যের উৎসটা কোথায়! শিল্পী হিসাবে তার আত্মবিশ্বাসকে মেংর্ কেন এভাবে ধুলায় লুটিয়ে দিচ্ছেন? কৌতুকের মূল উদ্দেশ্যটা কী? কৌতুকই! তাই উনি হঠাৎ ‘তুই-তোকারি’তে নেমে এসেছেন। মেংর্-এর ভূমিকায়। সালোঁর প্রতিনিধি হলে এটাকে ‘অপমান’ আখ্যা দেওয়া যেত।

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

লেকক্ হাসতে হাসতে বলেন, বলতে চাইছি: প্রশ্নটা কঠিন! এত কঠিন যে, কোন শিল্প-পণ্ডিত এর সমাধান খুঁজে পাবেন না। এর জবাব পণ্ডিতে না জানলেও সাধারণ দর্শক জানে। শিল্প তো পণ্ডিতদের জন্য নয়—সাধারণের জন্য। তারা ঠিক খুঁজে বার করবে এমন একজন শিল্পীকে যে অগুস্ত্-রেনে রোদাঁয়ার দুটি সংশোধনের হিম্মৎ রাখেন।

অগুস্ত্ অগ্নিদৃষ্টি মেলে শুধু তাকিয়েই থাকে। জবাব দেয় না। হঠাৎ দ্বারের দিকে নজর পড়ে লেকক্-এর। বলেন, ঐ তো ও আছে। সাধারণ দর্শক একজন। এদিকে এগিয়ে এস তো না? তুমি তো মেরী-রোজ ব্যুরে?

ভিতরের দরজায় কবাটের আড়ালে কৌতুহলী মেরী-রোজ দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। বাধ্য হয়ে এবার ঘরে ঢোকে। লেকক্কে অভিবাদন করে ‘কার্টেস বাও’ করে। লেকক্ বলেন, আমরা একটা নিদারুণ সমস্যায় পড়েছি। অগুস্ত্ একটা ভুল করেছে। শোধরাতে হবে। ওর মূর্তিতে একটা ছোট্ট অলিভ পাতা জুড়ে দিতে হবে। কে সেটা পারবে, বলতে পার?

লেকক্-এর সেই চাষীর মেয়েটি লজ্জা পেল না। কেন পাবে? অগুস্ত্ জীবনভর তাকে শুধু শুনিয়েছে—‘তুমি বোকা,

তুমি বুঝবে না!’ আর আজ সেই অগুস্ত্-এর গুরু তাকে সালিশ মেনেছেন! যে সমস্যায় ওঁরা হালে পানি পাচ্ছেন না, তার সমাধান জানতে ওকেই ডেকেছেন। আর ভয়? ‘জোন-অব-আর্কে’র দেশের মেয়ের ভয়? সাধারণ বুদ্ধিতে যা মনে এল তাই অকপটে বলে বসল, আপনি নিজেই পারবেন, মেংর্।

আবার অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন পোঁত একোলের প্রাক্তন আচার্য! —তাই তো! তাই তো! এমন সহজ সমাধানটা এতক্ষণ নজরে পড়েন! বুড়ো হয়ে গেছি, তবু ছোট্ট একটা অলিভ-পাতা আজও গড়তে পারব নিশ্চয়! আর অধিকার? গোটা পারীর শিল্পতীর্থে তা-বড় তা-বড় শিল্পীর যে অধিকার নেই, একমাত্র ওরস লেকক্ দ্য বোয়ামোদ্রান-এর সে অধিকারটাও যে আছে। ও যে আমার ছাত্তর! রাম-শ্যাম-যদু নয়—পাগলটা আমার অনেক সাধের অগুস্ত্-রেনে রোদাঁয়া!



সালোঁ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। প্রগতিবাদীদের—‘কালিকলম’ আর ‘কল্লোলগোষ্ঠীর’—সোচ্চার প্রতিবাদে আর কান পাতা যাচ্ছিল না। অগুস্ত্কে স্বীকৃতি না দিলে ফরাসী শিল্পই বেইজ্ঞত হয়ে যাবে। অথচ তার ঔদ্ধত্যকে পুরোপুরি মেনে নিতেও চক্ষুলাজ্জায় বাধা ছিল সালোঁর। এ জন্যই বারে বারে আপসের প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠাচ্ছিল এতদিন। এ ভালই হল। লাঠিও মচ্‌কালো, সাপও মরল না।

সালোঁতে সেবার দুটি মূর্তিই প্রদর্শিত হল—‘রোজগুগ’ এবং ‘জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত’! সংবাদপত্রও ঐ নীতিতে বিশ্বাসী: এমনভাবে রিপোর্ট লিখবে যাতে লাঠিটা মচ্‌কায় অথচ সাপটা না মরে। ওরা জন দ্য ব্যাপ্তিস্ত-এর ভূয়সী প্রসংশা করল। মূর্তিটির যতির মধ্যে গতির প্রকাশের সুখ্যাতি করল; এবং বারে বারে বলা হল—অগুস্ত্ রোদাঁয়া এতদিনে নিজের ভ্রমটা প্রণিধান করেছেন। পূর্ব বৎসর শিল্পবিশারদেরা যে সমালোচনা করেছেন তারই ফলশ্রুতিতে এবার তিনি একটি অলিভ পাতায় সৌজন্যের মর্যাদা রক্ষা করেছেন।

‘রোজগুগ’ যে প্রদর্শিত হয়েছে এটা আদৌ উল্লেখিত হল না। এমন কত মূর্তিই তো অনুল্লোখিত থেকে যায় প্রদর্শনীতে। সালোঁ সে বছর ‘জন’কে থার্ড প্রাইজ দিলেন। রোজগুগদক।

অগুস্ত্ প্রাইজটা এনে দেখালো মেরী রোজকে। হোক থার্ড প্রাইজ। এটাই তার শিম্পের প্রথম স্বীকৃতি।

মেরী রোজ সেটা নেড়ে চেড়ে বলল—মেডেলটার মাপ ঐ অলিভ পাতার মতো। যেটা মসৃণ লেকক্ গড়েছেন।

অগুস্ত্ বলে, তাই তো হবে! মূর্তিটা তো প্রাইজ পায়নি।

পেয়েছে মেং-এর গড়া ঐ অলিভ পাতাটাই!

—মানে?

—সেটা বোঝা ভারি শক্ত!

কিন্তু তার চেয়েও জ্বর খবর—সালো ঐ দুটি মূর্তিই নগদ মূল্যে ক্রয় করলেন। সালো নয়, ফরাসী সরকার। লাক্সেমবুর্গ উদ্যানে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে। মূল্য অবশ্য ষাটকোটি—জোড়া বেরাল্লিশ শ ফ্রাঁতে! তাতে ঢালাই খরচ মিটিয়ে সামান্য লাভ থাকবে। তা হোক—এই প্রথম ও নগদ মূল্যে কোনও ভাস্কর্য বিক্রয় করল!

নগদ টাকার বাণ্ডল জেব্-এ নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এল অগুস্ত্। মেরী রোজকে ডেকে বলে: ‘আজ কোন কাজ নয়, সব ফেলে দিয়ে’—

—মানে?

—এই আমার প্রথম রোজগার! আজকের দিনটা স্মরণীয়। আজ শুধু নাচব, গাইব আর মদ্যপান করব। চল, ফিল বাজোঁয়া-তে তোমাকে ডিনার খাওয়াব আজ!

মেরী রোজ-এর দুটি চোখ ছলছল করে ওঠে। ওর জীবনেও এটা একটা স্মরণীয় দিন! অগুস্ত্ নিজে থেকে ওকে পারীর শ্রেষ্ঠ হোটেল ডিনার খাওয়াবার নিমন্ত্রণ করেছে! এটাও ওর জীবনে প্রথম তো!

অগুস্ত্ বলে, তোমার সবচেয়ে জমকালো গাউনটা পরে নাও। অনেকক্ষণ নাচতে হবে কিন্তু!

মেরী রোজ চুপ করে কি যেন ভাবছে।

—কী ভাবছ বল তো? তোমার যেন কোনও উৎসাহই নেই?

রোজ বলে, তুমি রাগ কর না অগুস্ত্। আজ নয়, আমরা কাল কিম্বা পশু আনন্দ করব।

—কাল-কিম্বা-পশু! কেন, আজ কী দোষ হল?

—আজ সারারাত তোমাকে কাজ করতে হবে।

অগুস্ত্ হাসতে হাসতে বলে, মনে হচ্ছে ঢাকা ঘুরে গেছে! তুমি গ্রীক বলছ, আর আমি বোকার মত তর্কিয়ে আছি! ব্যাপারটা কী?

মেরী রোজ নিশ্চিন্দে উঠে যায়। একটা পোর্টম্যান্টো হাঙড়ে বার করে আনল একখণ্ড জীর্ণ কাগজ। বললে, এতে একটা কবিতা লেখা আছে। কী কবিতা আমি জানি না—কেউ আমাকে পড়ে শোনায়নি। তোমার মা যখন মারা যান তুমি তখন ব্রাসেল্‌স্-এ। উনি এটা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন—যেদিন তুমি প্রথম রোজগার করবে...

অগুস্ত্ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। ধীরে ধীরে দুটি হাত মেরীর স্কন্ধে রাখে। কাছে টেনে নিয়ে ওর কানে কানে বলে, আমি বড় ভুলো মানুষ। আমার বড় ভুল হয়ে যায়। তুমি আমার ভুল এভাবে শুধরে নিও, কেমন? কথা দাও—আমাকে কোনদিন তুমি ছেড়ে যাবে না?

মেরী রোজ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পায় না। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়স হল তার। প্রতি মুহূর্তেই ওর আশঙ্কা হয়—এই বুঝি সুয়োরানী এসে দাঁড়ায় দোর গোড়ায়। তার যৌবনের পশরা নিয়ে; তার শিক্ষার, সংস্কৃতির, আভিজাত্যের ডালা সাজিয়ে। তার হাতে স্টুডিওর চাবিকাঠিটি বুঝিয়ে দিয়ে দুয়োরানীকে চলে যেতে হবে তার অনিবার্য কুঁড়ে ঘরে। আর সেই দুয়োরানীকে অগুস্ত্ আজ নিজে থেকে বলছে: কথা দাও, তুমি আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবে না!

চোখের জল মুছে জীর্ণ কাগজখানা বাড়িয়ে ধরে বলে, এটা ধর।—দরকার হবে না। কবিতাটা আমার মুখস্থ। কাগজখানা তোমার কাছেই থাক। আমি হারিয়ে ফেলব।

মেরী রোজ বলে, কী লেখা আছে গো কাগজটায়?

বহু-বহুদিন পর অগুস্ত্ দু-হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরল। বহু-বহুদিন পর মেরী রোজ পেল তার ওষ্ঠাধরে একটি কবোক্ষ স্পর্শ।

অগুস্ত্ বললে, এই কথা!



উ

রমণী জাতির মোহিনী, নন্দ্য ও হ্লাদিনী শক্তির বিষয়ে রোদ্যার শিম্পমানস কী জাতের কথা বলতে চায় তা বুঝে নিতে এবার আমরা একগুচ্ছ ভাস্কর্যকে একসঙ্গে বিচার করব। সাতটি ভাস্কর্য এই অনুচ্ছেদে আলোচিত হচ্ছে। তার প্রথম চারটি একই ধারার, পঞ্চমটি ভিন্ন সুরের—কিন্তু পাঁচটি একই বর্গের। ষষ্ঠ ও সপ্তম উদাহরণ দুটি ভিন্ন ভিন্ন রসের ডাল নিয়ে উপস্থিত।

যে-কথা বারে বারে বলেছি, পুনরুক্তি দোষ হচ্ছে জেনেও আবার তা বলছি : রোদ্য গ্রীকযুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর চুম্বকসার - ক্লাসিকাল যুগের গঙ্গোদী থেকে ভাস্কর্য তরণীকে তিনি নিয়ে এসেছেন উনবিংশ শতকের নয়া-শিম্পবোধের ঘাটে। ফলে রমণীর রম্যরূপকে গ্রীক দর্শন ও হেলেনিক-শিম্প কী চোখে দেখত এবং তার প্রভাব অতি-আধুনিক রোদ্যার উপর কতটা পড়েছে তা প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হবে।

প্লেটো (c. 427—c. 347 B. C.) তাঁর 'সিম্পোজিয়াম'-এ বলেছেন : ভেনাস দুজাতের—Venus Coelestis এবং Venus Naturalis ; অর্থাৎ 'অপার্থিব ভেনাস' এবং 'জাগতিক ভেনাস'। একটা সম্ভাব্য প্রাপ্তি এড়াতে—যে-ভুল আমি নিজেই করেছি একটি পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থে—এখানে জানিয়ে রাখা ভাল যে, প্রভেদটা জননী ও জায়ার নয়, লক্ষ্মী ও উর্বশীর নয়। উর্বশীরই দ্বিধাবিভক্ত সত্তার কথা এখানে বলা হচ্ছে। প্রভেদটা যেন জীবন-সাঁঙ্গিনীর বৈতরূপের। এক : সে নর্ম-সহচরী, সুখ-দায়িনী, শয্যাসাঙ্গিনী ; দুই : সে সহধর্মিণী, শঙ্ক-সঞ্চারিণী, হ্লাদিনী। উদ্ধৃতি দেব না—পার্থক্যটা প্রকাশ করতে বরণ পরামর্শ দেব 'তীর্থঙ্কর'-গ্রন্থে দিলীপকুমার

ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথনটা পড়ে নিতে।

রমণীর ঐ রম্য-রূপটি আলোচনা করতে রোদ্য-ভাস্কর্যের চারটি নমুনা এখানে পেশ করা হচ্ছে : 'চুম্বন', 'চিরবসন্ত', 'আমি চঞ্চল হে', এবং 'পলাতকা প্রেম'। ভারতীয় মিথুন-ভাস্কর্যে দেড় হাজার বছর ধরে আমরা একটি ক্রম-বিবর্তন লক্ষ্য করেছি মন্দিরের গায়ে। সে-কথা আমার 'ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতি সংক্ষেপে প্রাসঙ্গিক বার্তাটুকু পেশ করি : একেবারে প্রথম যুগে— ভারত, বুদ্ধগয়া, সাঁচিতে এবং তারও দু-তিন শ' বছর পরে পর্যন্ত অজন্তা, কালের, কাহেরী, ভাজা, উদয়গিরিতে আমরা দেখেছি যুগলমূর্তি। মিথুন সেখানে অনুভূজিত—বড় জোর পরম্পরের হাত ধরেছে অথবা কাঁধে হাত রেখেছে ! চার পাঁচ শ' বছর ধরে সংযম অভ্যাসের পর নাগাজুনকোণ্ডা, অমরাবতী, আহিওল, বাদামীতে দেখলাম তারা রূপান্তরিত হয়েছে উভেজিত মিথুনে এবং ক্রমে শৃঙ্গাররত-মিথুনে। পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ ফুটে উঠেছে দেহভঙ্গের নানান ছন্দে। একেবারে শেষ পর্যায়ে—নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল মৈথুনরত মিথুন—ভুবনেশ্বর, পুরী, খাজুরাহো, ভাবকা, বালাসন, গলতেশ্বর এবং আরও শত শত মন্দিরে।

যেভাবে সাধারণ একটি মানব-দম্পতির জীবনে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের ভিতর প্রথম পরিচয়ের আনন্দ-শিহরণ থেকে মধুরতম মিলনের অভিজ্ঞতাটা আসে, মন্দিরগায়ে সেটা ঠিক সেই পর্যায়ক্রমেই এসেছে, হাজার বছর ধরে। রোদ্যার শিম্পে শেষ পর্যায়টি বাদে প্রতিটি পর্যায়ই প্রতিফলিত, কিন্তু তারা ঐভাবে কালানুক্রমিক নয়।

কিন্তু নরনারীর দৈহিক-মিলনের বিষয়টি আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যায়। মিথুনে আবশ্যিকভাবে আছে দ্বৈতসত্তা—তাদের ব্যক্তিমানসের মিলনেচ্ছার তারতম্যে শিল্পরসের প্রকারভেদ প্রত্যাশিত। যেমন, এক : নারী উত্তেজিত, উন্মুখ, অথচ পুরুষ উদাসীন; দুই : নারী পুরুষ উভয়েই সমভাবে সক্রমক; তিন : পুরুষ মিলনেচ্ছু অথচ নারী উদাসীন এবং চার : পুরুষ সক্রমক, নারী অনিচ্ছুক কিম্বা বাধাদানেচ্ছু। রোদাঁর যে চারটি ভাস্কর্য এখানে উপস্থাপিত করা হচ্ছে তা ঐ ক্রমপর্যায়ে সাজানো।

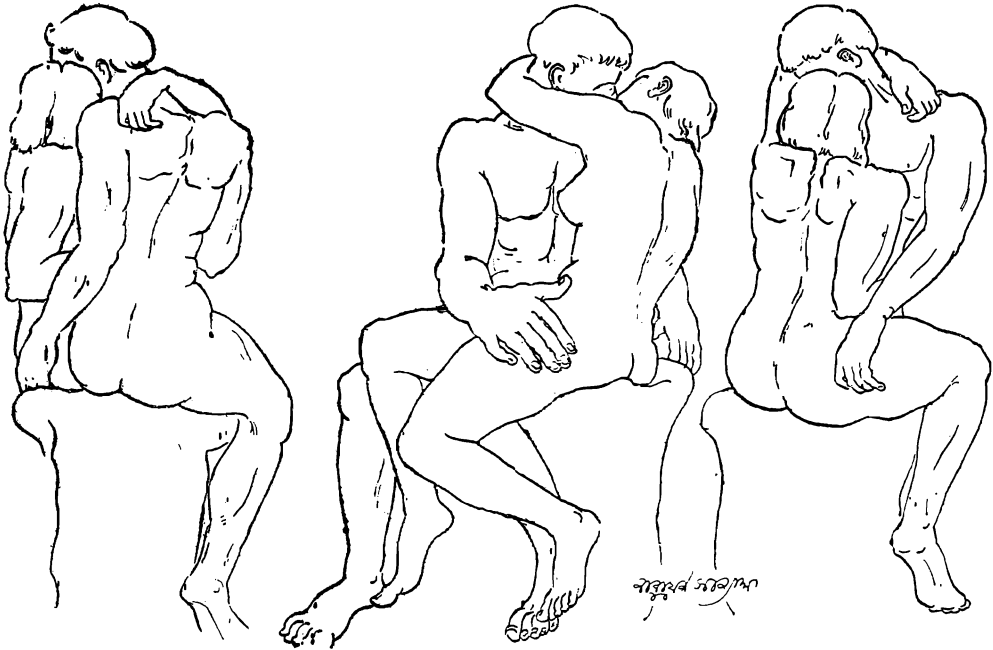
THE KISS (1888) : চুম্বন :

আদি যুগে রোদাঁ এই অনবদ্য মিথুন ভাস্কর্যের পরিকল্পনা করেছিলেন ‘নরকের দ্বার’-এ সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে। সম্ভবত পাওলো ও ফ্রান্সেস্কার অবৈধ প্রণয় এটির উপজীব্য। অর্থাৎ শিল্পে দৃষ্ট নায়ক হচ্ছে নায়িকার দেবর। তাই এই ভাস্কর্যের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল ‘নরকের দ্বার’-এ। কিন্তু প্রণয়দৃশ্যটি যে অবৈধ, এ তথ্যটা জানা না থাকলে দর্শক এ শিল্পের ত্রিসীমানায় নরকের ছায়া দেখতে পাবেন না।

প্রসঙ্গত রোদাঁ এ শিল্পটি নির্মাণ করেছিলেন পুরুষ ও নারী

মূর্তির মডেলকে পৃথক পৃথক বসিয়ে। অর্থাৎ বাস্তব মডেলদ্বয়কে ঐ ভঙ্গিতে আলিঙ্গনবদ্ধ হতে হয়নি। নারী মডেল ছিল ‘কামীল’, যার কথা আমরা অঁচিরেই জানব। পুরুষ মডেল অজ্ঞাত।

শিল্প সমালোচক শ্রীঅশোক মিত্র দিল্লি থেকে লিখছেন, “রোদাঁর ‘চুম্বন’ নামক ভাস্কর্যটির কথাই ধরা যাক, কাগজে দেখি, উদ্বোধনের দিন অনেকেই ‘চুম্বনটা কই’ প্রশ্ন করতে করতে অধীরভাবে ভাস্কর্যটি খোঁজেন। স্ত্রী-পুরুষ বয়স নির্বিশেষে এ আগ্রহ খুবই সুস্থ ও স্বাভাবিক।.. যে আত্ম-নিবেদনে মানুষের আমিষ সম্পূর্ণ লয় হয়ে অন্য আত্মা বা বৃহত্তর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, ‘চুম্বন’ সেই ঐশী, অতীন্দ্রিয় অবস্থার পার্থক্য স্থূল প্রতীক। রোদাঁ নিজে বিশেষ আবেগভরে খেদ করেছেন, ভারতীয় ভাস্কর্যে এই সম্পূর্ণ মিলন ও আত্মনিবেদনের যে ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখা যায় তার তিলাংশও ইউরোপীয় ভাস্কর্যে নেই। [লক্ষণীয় মিত্রশায়ের সমালোচনার ধারে কাছেও ‘অবৈধতা’ বা ‘নরক’ স্থান পায়নি। বস্তুত দানেন্দ (চিত্র—1)-এর মতো এক্ষেত্রেও নারক ভাবনা নিতান্ত ‘প্রক্ষিপ্ত’ এবং বাহুল্য।]...আমার শুধু



চিত্র—22 : The Kiss (1888)—চুম্বন

খেদ এই, দেশজ পরিবেশে বা আলোচনায় রোদ্দ্যার মহৎ সৃষ্টির ভারতীয় মানসে যে মূল্যায়ন সম্ভব হত তা এ উপলক্ষ্যে হল না ! চোখের সম্মুখে জলজ্যাস্ত দৃষ্টান্ত পাশাপাশি উপস্থাপিত করা সম্ভব নাই হোক, এমন কি লিখিত আলোচনাও হল না । ফলে আমাদের রোদ্দ্যার শিম্পশিক্ষা ও আত্মদান অসম্পূর্ণ থেকে গেল !” (‘দেশের শিম্পকলা না বুঝে রোদ্দ্যার প্রদর্শনীতে উপচে-পড়া-ভীড় সাহেব ভক্তিরই নামান্তর’, পরিবর্তন, 17.8.83 ।)

কলকাতায় রোদ্দ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনের বা অন্য কোনও দিনে ‘চুম্বনটা কই’ প্রশ্ন করতে করতে অধীরভাবে কাউকে এই ভাস্কর্যটি খুঁজতে দেখিনি । বোধ করি এটি দিল্লিওয়ালা দর্শকদেরই ‘সুস্থ ও স্বাভাবিক আগ্রহ ।’ কলকাতার দর্শক-দেরও এ শিম্পটির প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল—তার হেতু ‘দ্য কিস্’ এবং ‘দ্য থিংকার’ রোদ্দ্যার সর্বাধিক প্রচারিত শিম্প । সে যাই হোক, আসুন, শিম্পটা দেখি :

দেখিছি, প্রকৃতি উত্তেজিত ও চুম্বন-তিয়াসী ; তুলনায় পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও দ্বিধাজড়িত । তার দুটি হাতই নারী-জানুতে অলস



চিত্র—23 : চুম্বনোদ্যত, কোণার্ক

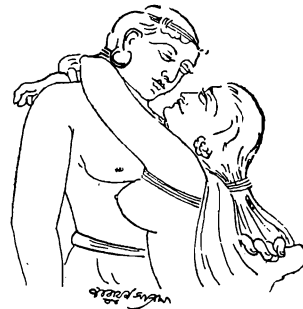
ভঙ্গিমায়ে ন্যস্ত । অপরপক্ষে নায়িকার আল্পেষণন বঞ্চিতমঠামে, বম্বাহুর বেষ্টনীতে যথেষ্ট উত্তেজনার ব্যঞ্জন । আমরা, শাস্ত্র ভাবনায় জড়িত দর্শকেরা বলব, ‘তাই তো স্বাভাবিক । দেখছ ন—প্রকৃতির বাম পদপল্লবটি ‘বিপরীত-রত্নাতুরার’ ব্যঞ্জনায় পুরুষের দক্ষিণ চরণের উপর স্থাপিত । পুরুষ তো স্বতই’ নিষ্ক্রিয় ; আদ্যাশক্তিই সৃষ্টির আদিম উৎস !’ শেক্সপীয়রের দেশের সমালোচক আমাদের ধমকে উঠবেন : বল্‌ডারডাশ ! শিম্পের মানস-চক্ষে তখন ভাসছিল—‘ভেনাস এ্যাণ্ড এ্যাডর্নিস্’-এর সেই অনবদ্য পংক্তি দুটি :

‘O, pity,’ gan she cry, ‘flint hearted boy !

‘T is but a kiss I beg, why art thou coy ?’

এই যে পরিকল্পনা, নারীর অগ্রসরী মানসিকতা এবং পুরুষের দ্বিধাজড়িত অনাসক্তি—এটা আমরা ভারতীয় মন্দিরভাস্কর্যে বারে বারে দেখেছি কিস্তি । দুটি অনবদ্য উদাহরণ এখানে তুলনামূলক বিচারের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত করা গেল, কোণার্ক জগমোহন এবং খাজুরাহো থেকে । উভয় ক্ষেত্রেই নায়িকা চুম্বন-তিয়াসী, নায়ক অনাসক্ত অথবা দ্বিধাজড়িত ।

প্রসঙ্গত একটি তথ্য পেশ করি : সৃষ্টির বছর-পাঁচেক পরে শিকাগো শহরে নিখিল-বিশ্ব প্রদর্শনীতে যখন ‘চুম্বন’ ভাস্কর্যটি প্রদর্শিত হল, তখন একাধিক মার্কিন সমালোচক শিম্পীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন—অশ্লীলতার দায়ে । বোধ করি শিকাগোর সাহেব দর্শকেরাও দিল্লি-ওয়ালাদের মতো ‘সুস্থ ও স্বাভাবিক আগ্রহ’ দেখিয়ে ‘চুম্বনটা কই’, ধ্বনিতে প্রদর্শনীকক্ষ মুখারিত করে চতুর্দিকে খুঁজাছিল—যেটা সাহেব সমালোচকের বরদাস্ত হয়নি । সেটাও ক্লাইমাক্স নয়, অতি সাম্প্রতিক কালে—বস্তুত এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে লণ্ডনের



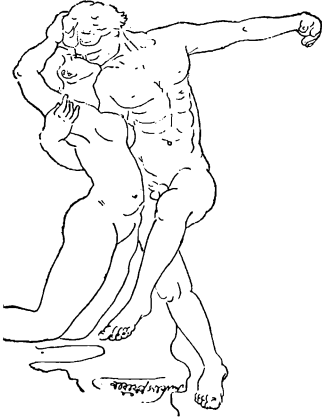
চিত্র—24 : চুম্বনোদ্যতা, দেবী জগদম্মা, খাজুরাহো

টেট-গ্যালারির কর্তৃপক্ষ যখন ঐ ভাস্কর্যের একটি মর্মর অনুকৃতি সংগ্রহে উৎসাহী হলেন তখনও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল ।

ETERNAL SPRING (1884) : চিরবসন্ত :

যদি বলেন, এর নামও ‘চুম্বন’ হতে পারত, তাহলে আমি আপত্তি করব । পূর্ববার্তী উদাহরণে ছিল, ‘দুখানি অধর হতে কুসুম চয়ন/মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে’, এখানে তা নয় । ঘরে ফেরার অবকাশ আর নেই ! উভয়েই উত্তেজিত উত্তাল, উদ্দাম ! ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যের নিরিখে ওরা আর

‘ঐতিহ্য-মিথুন’ নয়, ‘শৃঙ্গার-মিথুন’, যার পরবর্তী পর্যায়—যা ভারতে আছে য়ুরোপে নেই : ‘মৈথুন-মিথুন’। শৃঙ্গার-মিথুন হাজারে হাজারে নির্মিত হয়েছে মহা-ভারতের প্রতিটি মন্দির গাঙ্গে—নবম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে। এখানে দেখছি, প্রকৃতি পুষ্পধনুকাকৃতি—পুষ্পধনুর উপর শুধু ভারতীয় মদনেরই একচেটিয়া অধিকার নয়, পশ্চিমী-মদন কিউপিডও ফুলধনুর ব্যবহারে সমান দক্ষ ! জ্যা-মুক্ত প্রসূন-ধনুর পঞ্চশর দায়িত্বের মর্ম বিদ্ধ করেছে। পূর্ব উদাহরণের মতো নায়ক এখানে আধা-উদাসীন নয় মোটেই ; নিষ্ক্রিয় মহাশিব এবার চোল-নটরাজের ভঙ্গিমায তাণ্ডব নৃত্যরত। না, ধ্বংসের নয় সৃজনের উন্মাদনায় নটরাজের এই নৃত্যলাস্য। তার পদদ্বয় নটরাজ-অনুসারী হলেও (রোদ্যার স্টুডিওতে দুটি ভারতীয় মূর্তি বরাবর ছিল, একটি নটরাজের একটি বুদ্ধদেবের)



চিত্র—25 : চিরবসন্ত (1884)

ভূমিস্পর্শ করে নেই। উভয় চরণই শূন্যে। যেন নন্দনলোকে ভাসমান। দক্ষিণহস্তে সে প্রিয়তমাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেছে ; কিন্তু সেখানেই তার কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি ঘটে। মানিছ, ওর বামহস্তের উৎক্ষেপ ভারসাম্যের প্রয়োজনে—নায়িকার বিপরীত দিকে প্রসারিত পদদ্বয়কে ব্যালেন্স করতে ; কিন্তু রসের নিরিখে মনে হচ্ছে বাঁ-হাতে সে যেন বিশ্বপ্রপঞ্চকে জড়িয়ে ধরতে চায়। পুরুষের বহুমুখী আকাঙ্ক্ষার কি আর আদি-অন্ত আছে ? হেলেন প্রাপ্তির পরেও প্যারিস বলতে থাকে : ধনং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি ! পুরুষের সুবর্ণ গোলকের আলোকবিচ্ছুরণ একমুখী হয় না। নারীর তা নয় ! সর্বাস্তঃকরণে সে আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক বস্কিম ভঙ্গিমায বিলীন।

আমরা, ভারতীয়রা বলব, শৃঙ্গার-এ মিথুন অতিভঙ্গ মূর্ছনার। ওঁরা, পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যেরা বলবেন, An Eternal ‘Couplet’ !

মেরী রোজ ব্যুরে বোধ করি সলজ্জে বলবে : আমরা !

I AM BEAUTIFUL (1882) : আমি চঞ্চল হে :

বর্তমান নামটি কবি বোদলের অনুসরণে :

“আমি সুন্দর, হে মরণশীল মানুষ, শোন,
আমি মর্মরস্বপ্নের মর্মর...”

বোদলের-এর কবিকল্পনায় এ নারী বহুভোগ্যা, ক্ষণিক-বাদিনী, চিরচঞ্চলা। এ দীপশিখা দীপ থেকে দীপান্তরে অগ্নিচুম্বন করে। দীপান্তরের হাতছানি হানে। এ তাদের জ্বালিয়ে দেয়, এবং জ্বালায়। বোধকরি অন্তিম জ্বলেও !

বিড়লা-প্রদর্শনীতে ফটো তুলতে চেয়েছিলাম, অনুমতি পাইনি। স্কেচ করতে চেয়েছিলাম, অনুমতি পাইনি। রোদ্যার উপর যে কয়খানা গ্রন্থ যোগাড় করতে পেরেছি, তাতে এ ভাস্কর্যের আলোকচিত্র নেই। ফলে ঐ যাকে আপনারা ‘পেন-পিকচার’ বলেন, তাই দাঁখল করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

পুরুষ অত্যন্ত বলিষ্ঠগঠন। যেন ‘বিড-বিল্ডিং’-এর প্রতিযোগী। দণ্ডায়মান অবস্থায় নায়িকাকে সে শূন্যে তুলে ধরেছে। যেভাবে আপনি আমি দেড়-দু বছরের বাচ্চাকে দু-হাতে তুলে লোফালুফি করি। নায়িকার পদদ্বয় সংকুচিত—তার হাঁটুদুটি পেটের সঙ্গে সংলগ্ন ! বলা বাহুল্য উভয়েই ন্যূন। পুরুষের মুখভাবে একটা বিশ্ববিজয়ীর দার্ঢ্য, নাগরীর মুখে একটা ফিচ্লেমি। শবপোড়া-মড়াদাহের ভাষা সজ্ঞানে ব্যবহার করছি একটা বিশেষ হেতুতে। ‘দার্ঢ্য’ শব্দটির ক্লাসিকাল পুরুষটির উপযুক্ত বিশেষণ—সে পৌরাণিক বীর, প্র্যাক্সটেলিজ মিকেলাঞ্জেলোর হারকিউলিস্-এর ঐতিহ্যমণ্ডিত। অপরপক্ষে নাগরীর ‘ফিগার’ ও মুখভাব শিম্পীর সমকালীন সহজিয়ার—যেন এমিল জোন্সার কোনও সাধারণীর ফিচ্লেমি !

নায়িকার মতো এ ভাস্কর্যের নামটিও চঞ্চল। আদি-যুগে রোদ্যা যে ফরাসী শব্দে এর নামকরণ করেছিলেন তার অর্থ অপহরণ বা ‘এ্যাবডাকশন’। সেটা আদৌ সুপ্রযুক্ত নয়। অপহরণে নায়িকার অঙ্গভঙ্গি ও মুখভাব সম্পূর্ণ অন্য জাতের হবার কথা। গ্রীক ও রোমক যুগে অপহরণের অনেক-অনেক ক্লাসিকাল উদাহরণ আমাদের দেখা আছে। রোমক সভ্যতার

পতনই তো হল সাবাইন রমণীকুলের ‘ম্যাস-এ্যাবডাক্শনে’। তার ভূরি-ভূরি শিল্প নিদর্শন আছে সর্বযুগেই। মধ্য যুগেও লোরেঞ্জো বার্গিনী অথবা ফ্রাঁসোয়া গিরারগঁ-র ‘পারিসিফোন-এর অপহরণ’ অনবদ্য ভাস্কর্য। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপহৃত রমণী হয় বাধাদানরতা অথবা উদ্ধবাহু অসহায় ভঙ্গিমা আক্ষেপ করছে। আলোচ্য ভাস্কর্যে নায়িকার ভঙ্গিমা আদৌ তা নয়। হয়তো সেজন্যই রোদ্যাঁ পরবর্তীকালে নামটি বদল করে রেখেছিলেন ‘দ্য ক্যাট’ বা ‘পুঁষিমাগি’। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার ক্ষণিক-বাদিনী নায়িকার ফিচ্লেমিকেই প্রাধান্য দেওয়া হল। সেটাও শিল্পীর মনোমত না হওয়ায় শেষমেশ বোদলের থেকে একটি পংক্তি তুলে নিয়ে এ ভাস্কর্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বাৎসায়ন ঋষি রোদ্যাঁ-প্রদর্শনীতে এলে সহজেই মেয়েটিকে সনাক্ত করে বলতেন, এ হচ্ছে : ‘বৃক্ষাধিষ্ঠাসনা’।

আমি কিন্তু অন্য এক নামকরণের কথা ভাবছি : ‘চুম্বন’-এর নায়ককে দেখে মনে হয়েছিল—মিকেলাঞ্জেলোর নিঃসঙ্গ নায়ক ‘ডোভড’ বুঝি এতদিনে দোসর খুঁজে পেয়েছে। ‘চিরবসন্ত’-র নায়ক শাশ্বতকালের ‘এ্যাডিন্’, আর আলোচ্য মিথুনের নায়ককে দেখে মনে হয়—ও স্যামসন ! চণ্ডলমতি ‘ডালিলা’-কে সে অনায়াস ভঙ্গিমায়ে তুলে ধরেছে সুখের সপ্তম-স্বর্গে ; ও হতভাগ্য জানে না—ঐ অবলা মেয়েটিই তাকে এক-দিন নামিয়ে আনবে নির্বীর্ষের অতলাস্তিক ব্যর্থতায়।

তাই আমাদের মতে এ ভাস্কর্যের নাম : ‘স্যামসন এ্যাও ডালিলা’ !

প্রসঙ্গত ভারতীয় মন্দির ভাস্কর্যে ‘অপহরণ দৃশ্য’ কখনও আমার নজরে পড়েনি। পুরাণে অপহরণ ও বলাৎকারের বহু কাহিনী আছে ; কিন্তু ভারতীয় ভাস্কর কোনও যুগেই সেগুলিকে শিল্পের উপজীব্য করেননি। রোমনগরীর উত্থানের মতো ভারতীয় পৌরাণিক ইতিহাসে আমরা মথুরাপুরীর পতনে পাই ‘ম্যাস-এ্যাবডাক্শান’। ভারতীয় ভাস্কর্যে তা উপেক্ষিত। বোধকারি রবি বর্মার পূর্বে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের অনবদ্য কাহিনীটিতেও কোনও ভারতীয় শিল্পী উদ্বুদ্ধ হননি।

FUGIT AMOR (1884) : পলাতক প্রেম :

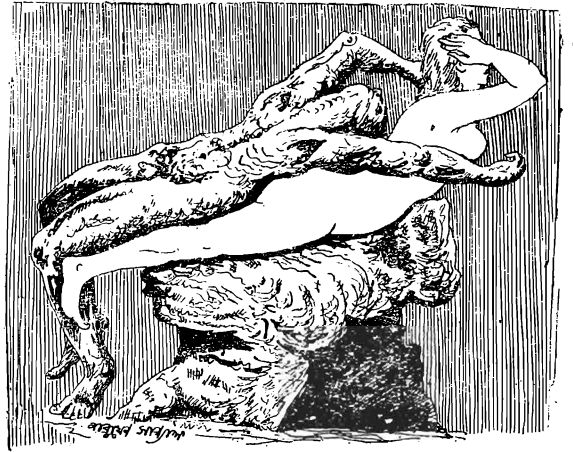
বকুবর ক্ষুর কণ্ঠে বলছিলেন, এমন ‘কিছুত’ মিথুন আমি কখনও দেখিনি—কী ভারতে, কী পাশ্চাত্যে ! নারী নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে, পুরুষ তার উপর চিৎ হয়ে। ‘এ্যাবসাড

কম্পোজিশন !’

কথাটা ভাববার !

এমন অভূত অবাস্তব পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটা কী ? স্মারক পুস্তিকায় ব্যাখ্যাকার বলেছেন, “This pair symbolizes the carnal side of human love. The work also portrays the elusive appeal of beauty, embodied by the woman evading the outstretched arms of the man who vainly tries to hold her back.” (এ মিথুন মানব প্রেমের রিরংসার প্রতীক। শিল্পটির আরও একটি আবেদন আছে : সৌন্দর্যের পলায়নী মনোবৃত্তি। তাই দেখছি, মেয়েটি পুরুষের প্রসারিত-বাহুর প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে পলায়নপরা।)

আপনারা হয়তো অভিযোগ করবেন,—স্মারক পুস্তিকার ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করা আমার একটা ম্যানিয়ায় দাঁড়িয়ে



চিত্র --26 : Fugit Amor (1884), পলাতক প্রেম

গেছে ! তা হোক, উপায় নেই ! এবারেও আমাকে আপত্তি জানাতে হবে। Carnal side of human love (মানব-প্রেমের রিরংসার দিক) কোথায় ? ‘মানবপ্রেম’ তো একতরায় বাজে না, বাজে দো-তরায়, খঞ্জনীতে। এক হাতে যেমন তালি বাজে না, এক পাটি খঞ্জনীতেও তেমনি আদরস বাজে না। বোধকারি ব্যাখ্যাকার বলতে চেয়েছিলেন—Carnal side of masculine love বা পুরুষের রিরংসার কথা। কারণ নায়িকা যে পলায়নপরা, রমণীবম্বুখ, সে-কথা তো নিজেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেটাই যদি এ শিল্পের

মৌল প্রতিবেদন হয়, তাহলে ব্যাখ্যাকার আমাদের দুটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কী জবাব দেবেন? এক : পুরুষ যদি মেয়েটির নাগালই পেতে চায় তাহলে চিৎ-হওয়া-কাঁছের মতো অবাস্তব অসহায় ভঙ্গিতে শুরেছে কেন? দুই : মেয়েটি যদি পলায়নপর্যায় হইবে, তবে পুরুষের প্রসারিতবাহুর নাগপাশ দু-হাতে ছাড়াতে চাইছে না কেন? কী কারণে সে শুধু নিজের দুই কান চেপে ধরেছে?

এ দুটি সমস্যার সমাধান না-হয় আপাতত মূলতুর্বি থাক। একথা স্বীকার্য যে, নায়ক-নায়িকার মানসিকতার বিচারে এ মিথুন তৃতীয় পর্যায়ের—অর্থাৎ পুরুষ কামার্ত, প্রকৃতি অনভিলাষী। প্রেমের এই পর্যায়টি—স্বীকার করতেই হবে—বাস্তব জীবনে স্বীকৃত সত্য। বাৎসর্যায়ন থেকে হ্যাভলক এলিস বলেছেন—দুতিনটি সন্তান জন্মানোর পর এটাই নাকি সচরাচর দাম্পত্যজীবনের বৃঢ় অভিজ্ঞতা। তবু শিল্পে—বিশ্বশিল্পে, এ সত্যের স্বীকৃতি স্বপ্ন। উপন্যাসে পাই প্রচুর, কাব্যেও। পুরুষের খেদোক্তি শুনি—‘কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়’...‘স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে/এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা, প্রাণপাথি কাঁদে এই বাসনার টানে ॥’ যতদিন না তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়—‘দেবতার তরে থাক পুষ্প অর্ঘ্যভার’—ততদিন সে দু-হাত বাড়িয়ে ভুলভঙ্গিতে অপরাপণীয়কে পেতে চায়। অপরপক্ষে নারীর উক্তিও সমান সক্রিয়—‘মিছে তর্ক? থাক তবে থাক, কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?/তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিনাম আঁখি, এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভৎসনা ॥’ প্রেমের এই পীড়াদায়ক পরিণতি—‘love’s sad satiety’-র কথা আমরা চিত্র-ভাস্কর্যে খুব কমই দেখিছি। কী ভারতে, কী পাশ্চাত্যে।

ভুল বোঝাবুঝির কিছু অবকাশ আছে। তাই বলি—ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে কিছু মূর্তি আছে, যা দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সে শিল্প বুঝি প্রেমের ঐ তৃতীয় পর্যায়টি হৃদয়িত করছে : পুরুষের কামনার্ত ভঙ্গি এবং নারীর অভিমানহীন প্রত্যাখ্যান। যেমন, একটি উদাহরণ পেশ করছি (চিত্র—27) আহিওল মন্দির থেকে। পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত শেষ-চালুক্যযুগের গুপ্ত-প্রভাবিত লাদ্ধান মন্দিরের এই মিথুনে দেখা যাচ্ছে—নায়ক তার প্রেমাস্পদার কটিদেশে বস্ত্রখণ্ড-গ্রন্থিটি মোচনে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু নায়িকা আড়ম্ব বামহস্তে

বস্ত্রখণ্ডটি ধরে রেখে যেন বাধা দিচ্ছে। আরও দেখছি, নায়ক তার ডান হাতে চেপে ধরেছে মেয়েটির দক্ষিণ মণিবন্ধ। অর্থাৎ বাধাদানে বাধা দিচ্ছে। ফলে প্রাথমিক বিচারে মনে হতে পারে, এক্ষেত্রে নায়ক কামনা-জর্জর এবং নায়িকা বাধাদানেচ্ছু। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, শিল্পের রস তা নয়। নায়িকার গ্রন্থি ঠাম, তার বামহস্তের আড়ম্ব ভঙ্গিমা,



চিত্র—27 : উত্তোজিত মিথুন, আহিওল

মুখভাব সর্বকিছুই সম্মতি সূচক! এ শুধু ছলাকলায় : ‘নহি নহি বোলিয়াবি, মোড়িয়াবি গমি!’ রোদাঁকুত আলোচ্য ভাস্কর্যে ফিরে আসা যাক। পশ্চিমখণ্ডের পাণ্ডিতদের সঙ্গে মতপার্থক্য হচ্ছে জেনেও আমি আমার মতো ব্যাখ্যা দাখিল করি—মানা-না-মানা আপনাদের অভিরুচি। শিল্পটির রোদাঁদ-দেওয়া নাম : Fugit Amor ; ইংরাজিতে অনুবাদ করলে যা Fleeting Love, বাঙলায় ‘পলাতক প্রেম’। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় : পলাতক। এক্ষেত্রে প্রেমিকা নয়, প্রেম। বিষয়বস্তুটা ব্যাখ্যা করতে প্রথমে একটি তুলনা-মূলক ভাস্কর্য পেশ করি—বার্ণিনীর প্রখ্যাত ভাস্কর্য—‘এ্যাপোলো’ এবং ‘ডাফনে’ (চিত্র—28)। কাহিনীটি সুপরিচিত—জলকন্যা ডাফনেকে অশ্বশায়িনী করবার জন্য সূর্যদেবতা এ্যাপোলো পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু নদীকন্যা ডাফনে বোধ করি জানে—সূর্যদেবতার পুঙ্কর-পোরুষের বীর্যেই স্রোতীস্বনীর গর্ভে তার জন্ম—তাই এ্যাপোলোকে সে পিতৃ-স্থানীয় মনে করে এবং মিলিত হতে স্বীকৃত হয় না!

একদিন এ্যাপোলো তাকে তাড়া করে, আর নিরুপায় ডাফ্‌নে অলৌকিক ক্ষমতাবলে স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তি ঘটায়—একটি বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে যায়! এই গ্রীক উপকথাটি অবলম্বন করে অসীম প্রতিভাধর ভাস্কর লরেঞ্জো বার্ণিনী (1598-1680) যে ভাস্কর্যটি গড়েছিলেন



চিত্র—28 : এ্যাপোলো ও ডাফ্‌নে, বার্ণিনী

তারই রেখাচিত্র এখানে দেবার চেষ্টা করেছি। একটি স্যানিটারী-ওয়্যারের বিজ্ঞাপনে এ শিল্পের ভালো আলোক-চিত্র নিশ্চয়ই দেখা আছে আপনার। এখানেও পুরুষের রিরংসার হাত থেকে পরিদ্রাণ পাওয়ার জন্য মেয়েটি পলায়নপরা। আলোচ্য ভাস্কর্যে ডাফ্‌নের দু-হাতের উৎক্ষিপ্ত ও অসহায়ত্ব অপহৃত্য পারসিফোন-এর (বার্ণিনী এবং গিরারগঁর) অনুরূপ। রোদাঁর নায়িকা কিন্তু দু-হাতে অসহায়ত্বের বাঞ্ছনা করেনি আদৌ, বাধাও সে দিচ্ছে না। সে শুধু দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরেছে। কেন? কারণ, আমাদের মতে রোদাঁর নায়িকা পালাতে চায় না, সে ধরাই দিতে চায়। হায়! ‘পলাতকা’ প্রেমিকা নয়, প্রেম! ট্রাজেডি সেখানেই!

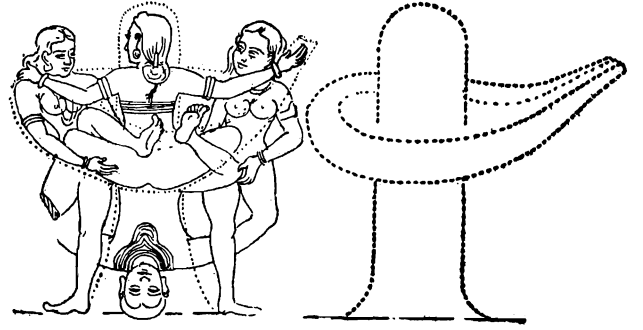
স্মরণ্য : ইব্‌সেন-এর ‘A Doll’s House’ (পুতুল খেলা) প্রকাশিত হয়েছিল 1879 সালে, এবং তার ফরাসী অনুবাদ

হয় 1882 সালে। আলোচ্য ভাস্কর্য তার দু-বছর পরে গড়া। শুধু ইব্‌সেনের ‘পুতুল খেলা’ নয়, সমকালীন ফরাসী সাহিত্যে দাম্পত্য-জীবনের এই ট্রাজেডিটি বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে ও হচ্ছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সমাজে স্বামী তার নিজের কর্মজগতে মশ্‌গূল—বাড়ি-বুহাম-বিত্তের মতো বনিতা বাবুর কাছে একটা ব্যবহারের বস্তু, উপভোগের উপচার! কাজের অবকাশে গৃহে ফিরে সে জীবনসঙ্গিনীকে দেখতে চায় মহিমময়ী সাম্রাজ্যবৃদ্ধি-পন্থী ক্রীতদাসীর ভূমিকায়! গৃহস্বামিনীরও যে একটা নিজস্ব জগৎ আছে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিকশিত হবার বাসনা থাকতে পারে, এ বোধ স্বামীর নেই! যেন ভূপতি তার সাংবাদিকার মাধ্যমে দেশসেবার অবকাশে চারুলতাকে সময় ও সুযোগ মতো কাছে পেতে চায়; যেন মহিম তার মহিমা দিয়েই অচলাকে বাঁধতে চায়! যেন নিখিলেশ... থাক, আর উদাহরণ বাড়াব না! ডল্‌স্-হাউস-এর নোরা, নষ্টনীড়-এর চারুলতা, অথবা গৃহদাহের অচলা, ঘরে-বাইরের মিসরাণী, কেউই উদাসীন, নিশ্চেষ্ট ছিল না—তবু তারা মাঝে মাঝে দু-হাতে নিজের কান চাপা দিয়ে ভালবাসার বাঁধাবুলিকে অস্বীকার করতে চেয়েছে! স্বগতোক্তি করেছে, “এখন হয়েছে বহু কাজ, সতত রয়েছে অনামনে। সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি আমি—হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে॥” দুর্ভাগা তারা—যে ভাবে, যে ভঙ্গিমায় জীবনসঙ্গিনীর মন ছোঁওয়া যায় তা ওদের প্রেমাস্পদরা জানত না; ভুল পথে, ভুল ভঙ্গিমায় তারা নায়িকাকে পেতে চেয়েছিল। জানত না—হাত দিয়ে যে দ্বার খোলা যায় না, গান গেয়ে সে দ্বার খোল যায়! এ ব্যাখ্যা যদি মেনে নিতে পারেন তাহলে বন্ধুবরের মতে ‘কিছুত’ ঐ মিথুনটি সার্থক হয়ে উঠবে। ওদের ঐ বিপরীত দিকে মুখ ফিরে শয়নের কম্পোজিশন, পুরুষের দ্রাস্তভঙ্গিমায় অপরাপণীকে প্রাপ্তির ঐকান্তিক প্রয়াস এবং নায়িকার দু-হাতে নিজের কান চেপে ধরার ব্যঞ্জনাটি বাস্তব হয়ে উঠবে। ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে তো নয়ই, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিত্র-ভাস্কর্যেও এতদিন আমরা এ-জাতের মিথুন দেখিনি। রোমান্স-সাবাইন’ প্লুটো-পার্সিফোন, এ্যাপোলো-ডাফ্‌নে, রাবণ-সীতার সঙ্গে রসের বিচারে এ মিথুনের প্রভেদ আসমান-জমিন! এ ভাস্কর্যে আপত্তির কথা একটাই: পুরুষ মূর্তিটিতে রোদাঁ সহজ সমাধান খুঁজেছেন—‘প্রডিগাল সন’কেই শুলিয়ে দিয়েছেন এখানে। (বরং বলা উচিত এই নায়ককেই খাড়া করে তিন

‘প্রডিগাল সন’কে গড়েছেন, যেহেতু সোঁট পরে নির্মিত।) এখনই বলেছি, রসের ক্ষেত্রে এ ভাস্কর্যের সমান্তরাল শিল্প ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে দেখিনি; কিন্তু এইসঙ্গে স্বীকার করে যাই—আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেখেছি। হয়তো একটু অপ্রাসঙ্গিক হচ্ছে, কিন্তু একটি সমান্তরাল ভারতীয় ভাস্কর্যের ভাবনা এই সঙ্গে দাখিল করি। কারণ এই অতি-বিখ্যাত ভাস্কর্যটি আধুনিক কলাসমালোচক দ্বারা প্রভূত পরিমাণে পুরস্কৃত এবং তিরস্কৃত হলেও তার এ-জাতীয় ব্যাখ্যা বোধকরি ইতিপূর্বে দেওয়া হয়নি। আমি খাজুরাহোতে অবস্থিত কাণারীয় মহাদেও মন্দিরের জগমোহন-কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত অতি বি- (কু)খ্যাত যোথ-যোনাচার ভাস্কর্যের কথা বলছি (চিত্র—29)। টমাস ব্যারেট বলেছেন—এ ভাস্কর্যে তিনটি নারী এবং একটি পুরুষের যোনাচার সমসাময়িক অবক্ষয়ী সমাজের প্রতিচ্ছবি। ফ্রান্সিস লীসন বলেছেন, শীর্ষাসনে পুরুষটির সঙ্গম-প্রচেষ্টা অবাস্তব; অপরপক্ষে মূলক রাজ আনন্দ উপনিষদ হাৎড়ে এ ভাস্কর্য তথা যোথ-যোনাচারের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী। কোল কাপালিকদের প্রবর্তিত যোথ-যোনাচার নীতিশাস্ত্রসম্মত কি না, সে প্রসঙ্গ না তুলেও শুধুমাত্র শিল্প হিসাবে আমরা এখানে ভাস্কর্যটির বিচার করছি।

রোদ্যার আলোচ্য শিল্পের সঙ্গে এ ভাস্কর্যের সাদৃশ্য একটাই—পুরুষমূর্তির বৃপায়ণ দৃশ্যত অবাস্তব, অপ্রত্যাশিত এবং বন্ধুবরের ভাষায়—‘কিস্তুত’! আমরা দেখেছি, রোদ্যা একটি বিশেষ কারণে ঐ অবাস্তব ভঙ্গিটি গ্রহণ করেছিলেন; আমরা দেখব, একটি বিশেষ হেতুতে খাজুরাহো-ভাস্কর এই কিস্তুতকিমাকার কম্পোজিশনের আশ্রয় নিয়েছেন। কোল-কাপালিক তত্ত্বে প্রভাবিত ভাস্কর আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন—যোথ-যোনাচারের মাধ্যমে আদিরসের আদিম দেবদেবী শিবপার্বতীর পূজাই করা হচ্ছে। এ বিশ্বাসের ধর্মীয়, সামাজিক, বা নৈতিক যৌক্তিকতা এঁড়িয়ে যদি শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাই, এ কম্পোজিশনে একটি অপূর্ব ‘সাদৃশ্য’ রচিত হয়েছে। ‘সাদৃশ্য’ কী, জানতে হলে আপনাদের পড়তে হবে অবনীন্দ্রনাথের ‘শিল্পে ষড়ঙ্গ’। রোদ্যার পরবর্তী শিল্পের আলোচনায় সে কথা সংক্ষেপে বলেছি। আপাতত লক্ষ্য করতে বলব—চিত্র—29-এ ফুটকি-চিহ্নে যে বহিরঙ্গ-রেখাটি আঁকা হয়েছে সেটিকে।

রোদ্যার ঐ আস্মান-মুখী নায়ক বন্ধুবরের কাছে যেমন ‘কিস্তুত’ মনে হয়েছে, খাজুরাহো-মূর্তির শীর্ষাসনে সঙ্গমরত নায়ককে ব্যারেট এবং লীসন-এর তেমনি অবাস্তব মনে হয়েছে। কিন্তু



চিত্র—29 : যোথ-যোনাচার, কাণারীয় মহাদেও, খাজুরাহো
ওঁরা কেউই শিল্পীর অন্তর্নিহিত বক্তব্যটা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেননি।

THE ETERNAL IDOL (1889) : শাস্ত্রত হলাদিনী

Venus Coelestes! অপার্থিব ডেনাস। পূর্ব-বর্ণিত রমণীকুলের সঙ্গে এর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। যেন ভিন্নমেরুর বাসিন্দা। এর মুখে এক স্বর্ণীয় দ্যোতনা। অপাপবন্ধ নিকষিত হেম। সে বরদা, হলাদিনীশক্তির মূর্ত প্রতীক। শিল্পী তাকে সৌন্দর্যের পাদপীঠে বসিয়ে পূজা করতে চায়। দেহজ কাম অন্তর্হিত; তাই পুরুষের দুটি হাত নারী দেহকে আদৌ বেঁধেন করেনি। তাই ওর মস্তক নায়িকার স্তন-সমতলের নিচে ন্যস্ত। প্রকৃতির মস্তক আলম্ব; খজু ভঙ্গিমায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ভাস্বর। যদিও পুরুষদেহের গুরুভারে কাঁধ থেকে জানু পর্যন্ত উর্ধ্বাঙ্গ পুরুষমূর্তির আনত দেহভঙ্গিমার (বাঁ-দিকের পার্শ্বচিত্র) সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। অপরপক্ষে নায়ক কায়মনোবাক্যে পত্ননোমুখ ওক-গাছের মতো সৌন্দর্যদেবীর পাদপীঠে আশ্রয় খুঁজছে। ভারতীয় শিল্পের নিরীখে নায়িকার দক্ষিণ হস্তে ভূমিস্পর্শমুদ্রা: বামহস্ত বরদা। উর্ধ্বাঙ্গে প্রকৃতি খজু, পুরুষের ‘সাপোর্ট’; নিম্নাঙ্গে সে পুরুষমূর্তির সঙ্গে একতানে একটি বাক্সমেরেখায় একান্ত।

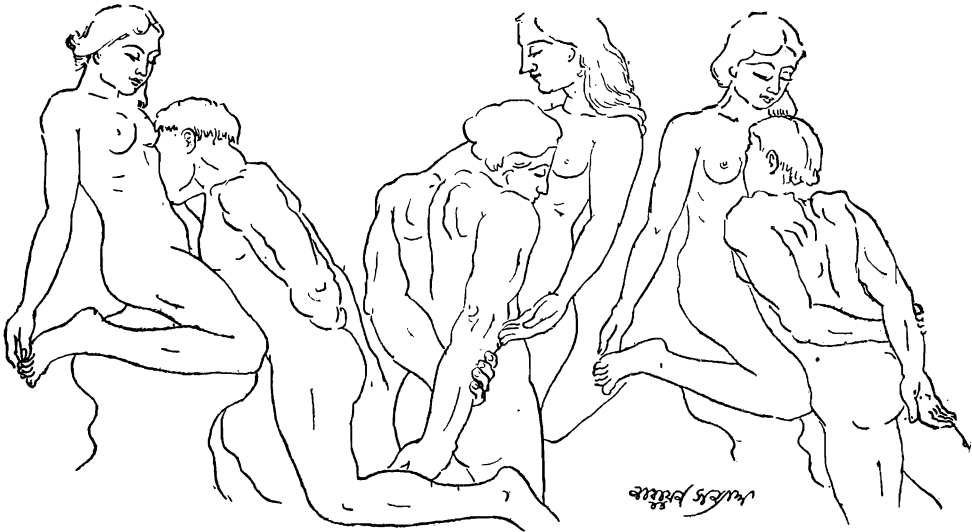
এ মূর্তির কম্পোজিশনটি মৌলিক হলেও রসের ক্ষেত্রে রোদ্যা এখানে একটি প্রাচীন ঐতিহ্যের ভাবধারাকে সম্প্রসারিত

করেছেন। দোনাতেল্লো, বার্গিনী বা মিকেলাঞ্জেলোর কোনও শিল্পে এ ধারা আমার নজরে পড়েনি। কিন্তু প্রাথমিক প্র্যাক্সিটেলীজ এই ভাবধারাটির তীক্ষ্ণ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্র্যাক্সিটেলীজ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এথেন্সবাসী। তদানীন্তন গ্রীকশিল্পের তো বটেই, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের অন্যতম। তাঁর স্বহস্তের কাজ আমরা খুব অল্পই পেয়েছি; অধিকাংশই তাঁর শিষ্যদের করা অনুকৃতি। অনেকের মতে ‘ভেনাস ডি-মিলো’ তাঁরই কীর্তি। তাঁর একটি ভাস্কর্য, সম্ভবত অরিজিনাল—‘শিশু ডায়োনিশাস-স্কন্ধে হার্মিস্।’ গ্রীসের অলিম্পিয়াতে সেটি 1877 সালে আবিষ্কৃত হয় এবং বর্তমানে লুভারে রক্ষিত। প্র্যাক্সিটেলীজ-এর সমকালে ‘পাইরীন’

আহরণ করেছেন তাঁর মানসীকে এবং আমাকে উৎসর্গ করেছেন পাইরীনের পদমূলে—সেই তো আমার মূল্য”।]

আলোচ্য ভাস্কর্যে সেই অনবদ্য রসেরই ব্যঞ্জনা। প্র্যাক্সিটেলীজ-এর মডেল পাইরীন—সে নশ্বর; কিন্তু প্র্যাক্সিটেলীজ-এর মানসীর অধিষ্ঠান শিল্পীর অতলান্ত অন্তরে; সে শাস্ত : **The Eternal Idol!** রোদ্যার এ ভাস্কর্যও যেন সেই কথাই বলছে। জয়দেবের পাখ-পালকের কলমটি তুলে নিয়ে যেন এক চিরকালের শিল্পী লিখে দিয়ে গেলেন শাস্ত স্বীকৃতি—‘দেহি পদপল্লবমুদারম্।’

প্রথম তিনটি উদাহরণের—‘ভেনাস ন্যাচুরালিস্’-এর সঙ্গে এই ‘ভেনাস কোয়েলিস্টিস্’-এর আরও একটি বৈপরীত্য লক্ষণীয়।



চিত্র—30 : **The Eternal Idol (1889)**—শাস্ত-হ্লাদিনী

ছিলেন এথেন্সের শ্রেষ্ঠ হেরোট—‘জনপদকল্যাণী।’ শিল্পী তাঁর প্রেমে পড়েন। পাইরীনকে মডেল করে একাধিক ন্যুড ‘ভেনাস’ নির্মাণ করেছিলেন ভাস্কর! তার একটি অতি বিখ্যাত : ক্লিডিয়ান ভেনাস। একটি ন্যুড ভেনাস-এর পাদ-পীঠে ভাস্কর স্বহস্তে খোদাই করেছিলেন, “**Praxiteles hath portrayed to perfection the Passion (Eros), drawing his model from the depths of his own heart and dedicates Me to Phyrene as price of Me.**” [“অন্তর্লীন আদরসকে (কামনাকে) হিন্দ্য-প্রতিষ্ঠা দিতে প্র্যাক্সিটেলীজ অন্তরের অতলান্ত থেকে

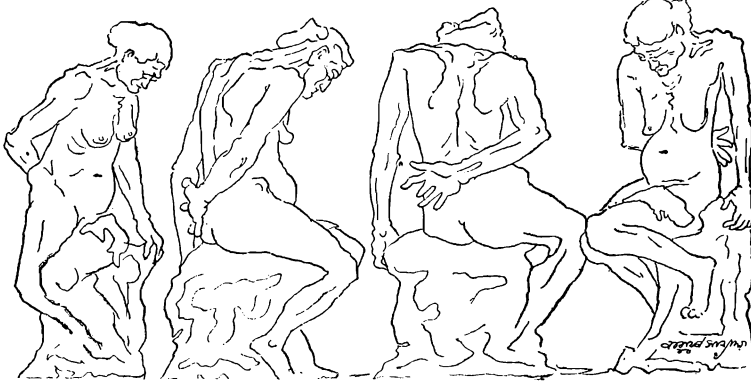
প্রথম তিনটি মিথুনে মনে হচ্ছে—নায়ক ও নায়িকা যেন পরমুহূর্তেই নড়ে চড়ে উঠবে। যেন গতিময় ভঙ্গিমার ক্ষণিক ‘স্ন্যাপসট’। যেন নায়গ্রা-প্রপাতের আলোকচিত্র—প্রতিটি জলবিন্দুতেই স্থিতির মধ্যে গতির ব্যঞ্জনা। অপরপক্ষে এখানে স্থিতির মধ্যে শূন্য জ্যোতির বিকাশ। যেন নিস্তরঙ্গ মানস-সরোবরে প্রতিবিম্বিতা ফুলে-ভরা, স্থাবর রোডোডেনড্রন পাদপ।

এই হ্লাদিনী-শক্তিই যুগে যুগে বীরকে করেছে বিজয়ী, গায়ককে গতিময়, শিল্পীকে সৃজনধর্মী আর নীরব কবিকে মুখর।

প্রথম তিনটি মিথুন-মূর্তির যে ব্যঙ্গনা—যথাক্রমে উত্তেজিতা নায়িকা, উদ্দাম নায়ক-নায়িকা, উদ্বেল নায়ক—তার তুল্যমূল্য মিথুনমূর্তি আমরা অসংখ্য দেখেছি ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে ; কিন্তু এই পঞ্চম মিথুনের যে প্রাণরস—প্রসূর-ভাস্কর্যে ‘দেহি পদপল্লবমুদারম্’ মন্ত্র তা ভারতীয় ভাস্কর্যে আমার অন্তত নজরে পড়েনি।

এ পর্যন্ত রোদ্যা ছিলেন ক্লাসিকাল যুগের উত্তরসূরী। এবার আমরা দেখব কিছু ভাস্কর্য যা ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রেরণায় গড়া। রমণী জাতির যে তিনটি গুণের বিষয়ে

বৃদ্ধাকে দেখে কেমন করে জানলেন যে, সে যৌবনকালে সুন্দরী ছিল তার কোনও ইতিহাস নেই। কোন পণ্ডিতই এ বিষয়ে কিছু বলেননি। স্বরবর্ণের এলাকায় আমরা শিল্পী ইন্দ্র দুগারের পরামর্শ মত চলব—রাজার-রাজার দ্বারেই যখন এসেছি তখন শিল্পটাকেই দেখি, পাণ্ডাদের বুজবুকিতে কান দেব না (পরে ব্যঙ্গনবর্ণের ক্ষেত্রে আমি নিজেই যদি পাণ্ডাগিরি করে, নানা মশলা মিশিয়ে ব্যঙ্গন বানিয়ে বোঝাতে চাই—শিরস্ত্রাণ-নির্মাতাটিকে কে এবং অগুপ্ত কেমন করে জানল যে, যৌবনকালে সে সুন্দরী ছিল তাতে আপনারা কান দেবেন না—সেটা গল্পে কথা)।



চিত্র—31 : The Old Courtesan (1885)—বৃদ্ধা বারাসনা

আমরা এতক্ষণ নিবন্ধদৃষ্টি ‘ছিলাম—মোহিনী, নন্দ্য ও হ্লাদিনী—তা ছাড়াও নারী প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে চাইছে ঊনবিংশ শতকের পারীর ‘কালিকলম ও কল্লোলগোষ্ঠী’। নারীর অবহেলা, অবক্ষয় ও নির্যাতনের কথা। এবার যে উদাহরণটি দাখিল করছি তার নাম ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন রকম। কেউ লিখেছেন (ফাইউন প্রকাশনা) : “She, Who once was the Helmet-maker’s Beautiful Wife”; কেউ লিখেছেন (The Modern Library, New York) The Old Courtesan। ফরাসী ভাষায় মূর্তিটির পরিচয় : সেল কি ফু ওলমিয়ের অথবা Heulmiere : One Time Beauty অর্থাৎ কারও মতে ‘সেই মেয়েটি যে, এককালে ছিল শিরস্ত্রাণ-নির্মাতার সুন্দরী স্ত্রী’, কারও মতে (Abbey Library, London) ‘প্রাক্তন সুন্দরী’ এবং অপর কারও মতে—‘বৃদ্ধা বারাসনা’। শেষ নামটি সহজবোধ্য ও সুপ্রযুক্ত। প্রথম নামটি রোদ্যা কেন দিয়েছিলেন—কে সেই অজ্ঞাত শিরস্ত্রাণ-নির্মাতা এবং শিল্পী ঐ লোলচর্মা

THE OLD COURTESAN (1885) :

বৃদ্ধা বারাসনা :

স্থান : পারী ; কাল : 1885 ; এবং পাত্রী : অজ্ঞাত। তবু কালটাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলব। 1885 সালে প্রকাশিত হয়েছিল এমিল জোলের ত্রয়োদশতম উপন্যাস, Germination (অঙ্কুর)। প্রকাশমাগ্রেই যা নিয়ে তুমুল আলোড়ন হয়—বইটিকে নিষিদ্ধ করার জন্য একদল পণ্ডিত উঠে পড়ে লাগেন। কারখানার মালিক ও মজদুরদের সংগ্রামকাহিনী, কুলিবস্তি-সংলগ্ন বেশ্যাপল্লী এবং নারীজাতির অবমাননার চিত্র সে গ্রন্থে বীভৎস আকারে চিত্রিত। ভাস্কর্যটি ঐ বৎসরে নির্মিত। এটি রোদ্যার এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। এ ভাস্কর্যে রোদ্যা চিত্রশিল্পী ওনরে দ্যোমিয়ের (1808-79) উত্তরসূরী। বৃদ্ধা বারাসনাকে মডেল করে তিনি এবার তাঁর অন্তর্লীন সমবেদনা নিঙড়ে বার করেছেন। ব্যাখ্যার বড় একটা অবকাশ এখানে নেই—শিল্প নিজেই নিজের কথা বলছে। আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমি

আপনাদের হাত ধরে মূর্তিটি প্রদক্ষিণ করার চেষ্টা করেছি মাত্র। দু-একটি ইঙ্গিত শুধু রেখে যাই : শোনা যায়, জনৈক দুঃসাহসী দর্শক প্রদর্শনীতে এ মূর্তিটি দেখে শিম্পীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ওর হাত দুটি দেহের তুলনায় বেশি লম্বা নয় ? রোদাঁ তৎক্ষণাত জবাবে বলেছিলেন, উপায় কি ? না হলে তো আপনি আবার বলে বসতেন—গলানো মোমের ছাঁচ নিতে গিয়ে বুড়টাকে আমি খুন করেছি।

এটা রহস্য কিম্বা স্ফোভের প্রকাশ জানি না—কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, রোদাঁ এ নারী-মূর্তিতে হাত দুটোকে দেহাকৃতির অনুপাতে কিছু দীর্ঘায়ত করেছেন। প্রশ্নটি নিয়ে শিম্পিবিষারদ Louis Weinberg দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন, “Why does Rodin ignore correct proportion in his figures—the arms of ‘The Old Courtesan’ seem a mile too long”. জবাবে তিনি বলেছেন, এটা আধুনিক শিম্পের একটি বৈশিষ্ট্য—চোখে যা দেখব তাই শিম্পে হুবহু প্রতিফলিত করব না। যা হলে রসটা ঠিকমতো পরিবেশিত হবে, তাই গড়ব।

কিন্তু আলোচ্য ভাস্কর্যে হাতদুটি দীর্ঘায়ত হওয়ায় রস পরিবেশনে কী সুবিধা হল সে-কথা সমালোচক স্পষ্টাক্ষরে বলেননি। আমরা কি সেটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ?

বৃদ্ধা বারাস্কনার দৃষ্টি ক্ষীণ—হয়তো দৃষ্টিহীনা সে। অতীতের সুখস্মৃতিই তার একমাত্র জীবনরস। অন্ধ আবেগে সে দু-হাত বাড়িয়ে তাই অতীতকে খুঁজছে। অন্ধের সেই আন্তর-কামনাতেই যেন ওর হস্তদ্বয় দীর্ঘায়ত। বামহস্তে সে দেহভার রক্ষা করছে—না হলে মেরুদণ্ড সোজা করে ও বসতে পারে না। ফলে বামহস্ত ওর দৈহিক ভারসাম্যের প্রয়োজনে—সেটা বর্তমানকে স্বীকার করতে। কিন্তু তার ডান হাত ? অনবদ্য ব্যঞ্জনা ! ডান হাত অতীতমুখী। সে হাত হারানো অতীতকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তাই হাতটা তার পিছনে—কারণ অতীতও যে তার পিছন দিকে। তাই ওর হাতে একটা ক্ষুধার আর্তি—অতীতকে পাওয়ার বুভুক্ষা।

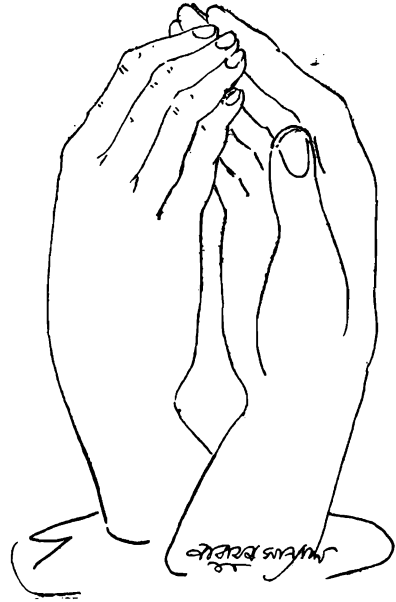
আমার তে মনে হয়েছে, কুপারিনের ‘সামা দ্য হেল-হোল’ গোটা উপন্যাসটা ঐ বৃদ্ধা বারাস্কনার ভাস্কর্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে !

রোদাঁর এই মানসিকতায় গড়া অনেকগুলি ভাস্কর্য আছে : Women Damned, Caryatid, Rodin’s Hand, The Crouching Woman, Large Clenched Hand

with Suppliant Figure—সবগুলিই ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলশ্রুতি, যাতে এমিল জোলা, বোদলের, ফ্লেবায়ার, মোপাসাঁ, ম্যলার্মের প্রভাব প্রতিফলিত। এবার এ পর্যায়ের শেষ উদাহরণ, যা না ক্লাসিকাল না ঊনবিংশ শতকের নব জাগরণের প্রভাবে ! যা শুধুমাত্র ‘রোদাঁয়ক’ !

THE CATHEDRAL (1908) : গীর্জা :

বিড়লা আকাদেমীতে এ ভাস্কর্যের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দর্শককে প্রশ্ন করেছিলেন, এর নাম ‘গীর্জা’ হল কেন বলতে পারেন ?



চিত্র—32 : The Cathedral (1908)—গীর্জা

উনি ডাইনে-বাঁয়ে হেলে ভাস্কর্যটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, মনে হচ্ছে একজন তীর্থযাত্রী ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে দুটি হাত জোড় করে মেলে ধরেছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। আঙুলগুলি যেন গীর্জার প্রতীক।

বললুম, কিন্তু তীর্থযাত্রীর কি একজোড়া ডান হাত ?

উনি ঘাবড়ে গেলেন, তাই তো !

আবার সেই এ্যানার্টমিক্যাল ভ্রান্তি ? অরফিউস্-এর বাঁ-হাতে তিনটি আঙুল ? ভদ্রলোক স্মারকগ্রন্থটি দেখে বললেন, না, বইতেও লেখা আছে ‘এক জোড়া ডান হাত’। ভুল হয়নি কিছু। এর নাম এককালে ছিল ‘The Arch of Alliance’

সন্ধির খিলান। বোধকারী বিবদমান দুই রাষ্ট্রশক্তিকে ঈশ্বরের দরবারে এক হতে বলেছেন শিম্পী।

হবেও বা। রাজনীতি ভালো বুঝি না।

বিড়লা আকাদেমী এবং দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট 'রোদ্যা স্মারক পত্রিকায়' শুধু বলেছেন, "It suggests the ogival shapes in Gothic architecture which Rodin specially admired."

আমি কিন্তু দ্বিতীয় এক দৃষ্টিকোণ থেকে গীর্জাটাকে খুঁজতে থাকি। এ ভাস্কর্যের বহু আলোকচিত্র দেখেছি, কিন্তু বাহিরঙ্গের ঐ অশ্বখুরাকৃতি গথিক-খিলান ব্যতীত অন্তরঙ্গে গীর্জার কোনও আভাস পাইনি। সেটাই স্বাভাবিক। রোদ্যার ভাষায় : ভাস্কর্যের আবেদন ক্যামেরায় ধরা দেয় না। সেটা ত্রিমাত্রিক—ঘুরে-ফিরে দেখার। বিড়লা আকাদেমীকে লাখে সুক্ৰিয়া। এই ভাস্কর্যটিকে প্রদর্শন করার দুর্ভাগ্য সুযোগ ওঁরা আমাদের দিয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে এক খণ্ডমুহুর্তে বিশেষ এক কোণ থেকে গীর্জার দ্বিতীয় একটা স্বরূপ ধরা পড়ল আমার দৃষ্টিতে। দুটি হাতের ফাঁকে ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে যে স্পেস্টা ধরা আছে তা গথিক-গীর্জার চূড়া!

স্কেচে সেটাকে ধরতে গেলাম। কর্তৃপক্ষ বাধা দিলেন। সেটা নাকি বে-আইনি। স্কেচ করা বারণ। এ নিষেধ ফরাসী সরকারের অথবা বিড়লা আকাদেমীর তা জানি না। পরে শুনছি, ঠিক জানি না, এ বিধি-নিষেধ দিল্লি-বোম্বাই-তে আরোপ করা হয়নি! তা সে যাই হোক, আমি কি তাই বলে হাইপারনেস্টার (আপনাদের বলতে ভুলেছি, ইতিমধ্যে আমি 'দানেশ'-ভগ্নীবন্দ্রের সেই পঞ্চাশতমা 'অনন্য'র—নামটা উদ্ধার করেছি : হাইপারনেস্টার) দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে পারি? অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেল, অথচ পাত্রটা ফুটো বলে সে অমৃত-রস ঘরে আনতে পারব না? স্কেচবুক-পেন্সিল বারান্দায় রেখে বারে বারে দেখে আসি, আর মন-ক্যামেরায় ধরা একটি-দুটি রেখা খাতায় তুলে ফেলি। এতে ওঁদের আপত্তি করার কিছু নেই। বারান্দায় কোনও মূর্তি নেই—সেখানে ছবি আঁকা বে-আইনি নয়, যেমন নয় ঘরের ভিতর মন-ক্যামেরায় ছবি তোলা। যে ভদ্রলোক প্রথম আপত্তি জানিয়েছিলেন, তিনি আমার পিছু-পিছু বার-কয়েক ঘর-বার করলেন। বিরক্ত হলেন। বৈশিষ্ট্য আমার সঙ্গে 'ও কুমীর! তোর জলকে নেমোঁছ' খেলতে রাজি হলেন না। বে-কানুন

কিছু হচ্ছে না এটা সমঝিয়ে নিয়ে তিনি এই নাছোড়বান্দার কুসঙ্গ ত্যাগ করে অন্যত্র সরে গেলেন।

এতটা কুছসাধনের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ভাস্কর্যে ও চিত্রশিল্পে দেশকাল-নিরপেক্ষভাবে 'বন্ধাজলি' শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রতীক। গ্রীক ও মিশরীয় শিল্পে এর ব্যবহার ছিল স্বল্প। কিন্তু ভারতীয় শিল্পে এর বহুল ব্যবহার আদি যুগ থেকেই দেখা যায়; পশ্চিমযুগেও খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের পর প্রায় সর্বত্রই 'যুক্তকর' শ্রদ্ধানিবেদনের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত। প্রাচ্যে, যেখানে বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রবেশ করেছে, সেখানেই যুক্তকরের ব্যবহার আছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে একত্রে সংকলন করা গেল—অজন্তা, লেঅনার্দো এবং মিকেলান্জেলো থেকে। জার্মান শিম্পী ডারার (1471-1520) এঁকেছিলেন দেহ-বিগুস্ত শুধু একজোড়া হাত—প্রার্থনার ভঙ্গিতে! "হ্যাণ্ড অব্ প্রেমার"। "নীলচে রঙের কাগজে ব্রাশে আঁকা। ঈষৎ অসমাপ্ত। কারণ আসল অভিপ্রায় ছিল আঁকবেন তেল রঙে। যুরোপের ঘরে ঘরে একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল ঐ প্রার্থনার হাত, ছাপাখানার সুবাদে, রঙীন পোস্টকার্ডের মারফতে। কয়েক শতাব্দী পরে কিছুটা স্নান সে স্মৃতি। যখন পাঁচশো বছর পূর্ণ হতে চলেছে ডারারের, তার এক বছর আগে ঐ জার্মানিরই আর এক তরুণ শিম্পী, ক্লাউজ স্টেক, দু-রঙের সিল্ক-স্ক্রীনে ছেপে পুনরুজ্জীবন ঘটালেন সে হাতের। স্টেক নিছক কপি করলেন না ছবিটিকে। মূলকে অবিকৃত রেখেই জুড়ে দিলেন নিজস্ব ইন্টারপ্রিটেশন" ('কালি কলম মন,' পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রতিদ্বন্দ্ব, 2.9.83, পৃ: 79)।

আমাদের চারটি উপস্থাপিত উদাহরণে যে শিম্পিরস, তা আমূল বদলে গেল। অজন্তা শিম্পী, লেঅনার্দো, মিকেলান্জেলো এবং ডারার যুক্তকরের উপস্থাপনে যে রস নিবেদন করতে চেয়েছিলেন, তার সঙ্গে স্টেকের এ শিম্পির বক্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক। স্টেকের বিদূপ-কষাঘাত সামাজিক কি ধর্মীয় ঠিক জানি না। প্রথম ক্ষেত্রে হলে অনুমান করা যায়, ঐ যুক্তকর শ্রমিকের অথবা প্রজার। স্কু-জোড়া এঁটে দেবার ব্যবস্থা করেছেন মিলমালিক অথবা ভূমিধিকারী। অপরপক্ষে, ধর্মীয় হলে—এ আক্রমণের লক্ষ্যস্থল চার্চের ধর্মাক্ততা অথবা ধর্মীয় অত্যাচার।

লক্ষণীয়, এতাবৎ উপস্থাপিত প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল একটি ডান ও একটি বাঁ-হাত—একই লোকের।



চিত্র—৩৩ : কৃতাজলি,
অজন্তা প্রথম-গুহা,
সজ্জপাল জাতক



চিত্র—৩৪ : গীর্জার প্রতীক-ব্যঞ্জনা, সাদৃশ্য



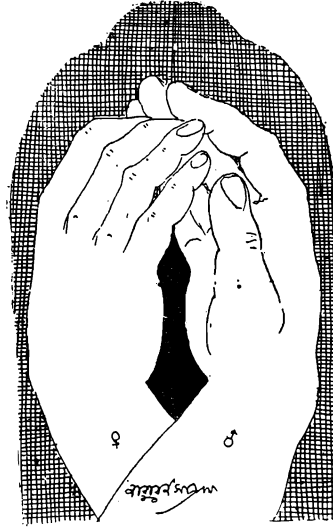
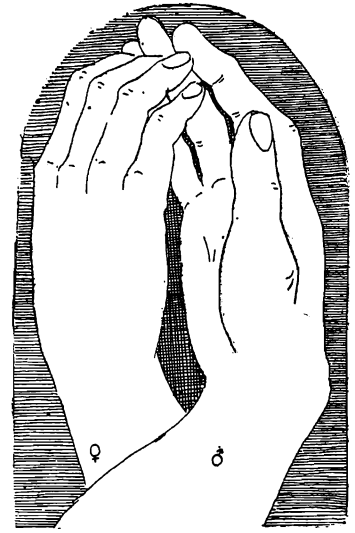
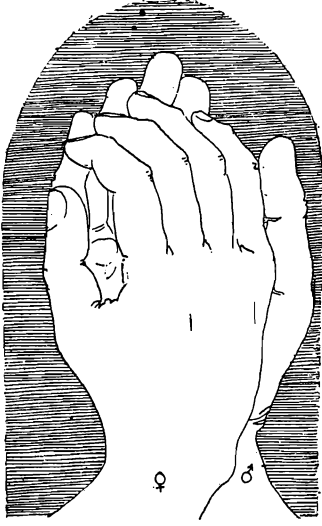
চিত্র—৩৫ : র্যাচেল,
জুলিয়াস-সমাধি, রোম,
মিকেলাঞ্জেলো



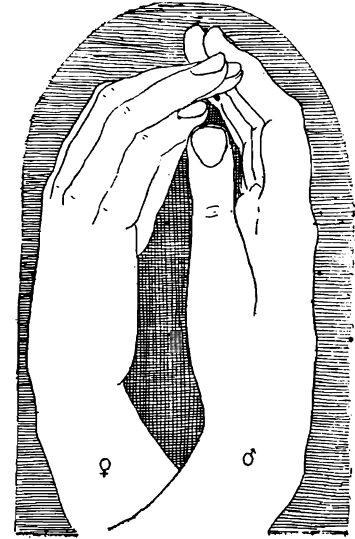
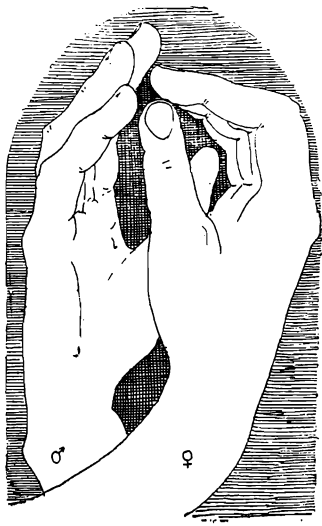
চিত্র—৩৬ : বন্ধাজলি,
ম্যাডোনা অব্ দ্য রক্স,
লেঅনার্দো



চিত্র—৩৭ : বন্ধাজলি,
ডুয়ার/স্টেক্



চিত্র-৩৭ : গীর্জা-প্রদক্ষিণ



রোদ্যার যুক্তকর দ্বিতবাদী দর্শনে।

তাই আমাদের মতে—এটি একটি দুর্লভ শিল্পসম্পদ। পশ্চিম খণ্ডের এক অনন্য : ‘সাদৃশ্য’!

ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রমতে শিল্পের যে ছয়টি অঙ্গ আছে তা নিশ্চয় জানেন। যশোধর বাৎসায়ন-আলোচনা প্রসঙ্গে যে-কথা বলেছেন, তা আমার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ ‘অজস্র-অপরূপা’য় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন, “সদৃশ্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। ...কবিতা কবির মনোভাবের সাদৃশ্যকে পায় ও পাঠকের বা শ্রোতার মনোভাবকে তৎসদৃশ করিয়া তোলে। সুতরাং কবি নির্ভয়ে বলিতে পারেন ‘মুখচন্দ্র’। চন্দ্রে ও মুখে সেখানে আকৃতির সাদৃশ্য কবি দিতেছেন না—দিতেছেন সেখানে চন্দ্রদেয়ে নিজের মনোভাবের সহিত প্রিয়মুখদর্শনে প্রেমিকের মুখভাবের সাদৃশ্য। কাজেই বলিতে হইতেছে, সেই সাদৃশ্যই উত্তম যাহা কোন এক রূপের ব্যঞ্জনটুকু অন্য-এক রূপ দিয়া বাস্তব করে। মনোভাবের সদৃশ্য হওয়াই সাদৃশ্য।” শিল্পাচার্যের ঐ ব্যাখ্যার কঠিনপাথরে এই পাশ্চাত্য শিল্পটিকে আবার দেখলুম। আগে যা নজরে পড়েন এবার তাই দেখতে পাওয়া গেল। একেবারে বাহিরদ্বারে—গোপুরমে, শুধু গাথক-গীর্জার ‘অগিভ্যাল’ খিলানটিকেই নয়, দেখলুম ‘রেখ-পীড়’ দেউলের সেই নাগর-স্থাপত্যের পরিচিত বিজ্ঞকরেখা। উপরে পুরুষহস্তের মধ্যমায় ‘বিমান’-এর আমলক-ঘণ্টা-কলসের আভাস; বহিরঙ্গে ‘বিমান-জগমোহন’-এর রেখ-পীড়-মিথুনের বাঙ্গ্য; অন্তরঙ্গে—গর্ভগৃহে দু-হাতের ফাঁকে ঋণাত্মক-ভাস্কর্যে-বিধৃত গাথক-

গীর্জার—না খিলান নয়, চূড়াটা!

আপনি আপত্তি জানাবেন। বলবেন—এটা বাড়াবাড়ি। রোদ্যার কেমন করে ভারতীয় শিল্পভাবনায় অনুপ্রাণিত হতে পারেন? জবাবে আমি অনেক সমান্তরাল প্রসঙ্গ তুলতে পারতুম। প্রতি-প্রশ্ন করতে পারতুম—খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নির্মিত অজস্র দশম ও নবম গুহাচৈতোর প্ল্যানিং এবং সমকালীন গ্রীকো-রোমান ব্যাসিলিকার প্ল্যানিং একই জাতের হল কি করে? একদল স্থপতি তো অপরদল স্থপতির কাজ দেখেননি, নামই শোনেননি। কিম্বা গুপ্তযুগের কবি কালিদাস এবং প্রায় সমকালীন চৈনিক কবি য়ুনান কেমন করে কল্পনা করলেন প্রাচীনতম প্রাচীরের কাছে পুষ্পরমেধকে দৃত হিসাবে প্রেরণের কথা? তাঁরাও তো পরম্পরকে জানতেন না? এ জবাব আমি দিচ্ছি না, কারণ আপনার উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বেই দিয়ে বসে আছেন ফরাসী রাষ্ট্রদূত, আকাদেমী প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকার মুখবন্ধে, “উপস্থাপিত শিল্প-কর্মগুলি এমন একজন শিল্পীর, যিনি শৈব-স্থাপত্য এবং ভারতীয় মূদ্রার বিষয়ে গভীর অনুরাগী।”

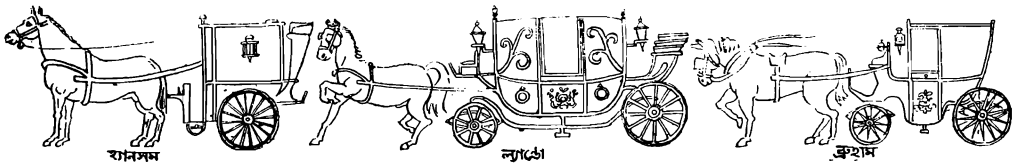
শৈব-স্থাপত্য? তাহলে এ ভাস্কর্যেও আছে নাকি শৈব-বাঙ্গ্য? বরাহ-মিহির সঙ্কলিত বৃহৎ সংহিতার সেই অনবদ্য মন্ত্রটি, যাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—প্রমথ-মন্দির ‘মিথুনৈঃ’ সুশোভিত করতে হবে। হ্যাঁ তাই। শিবলিঙ্গের প্রতীক ব্যঞ্জনটি এখানে নবরূপে বিকশিত। একটি হাত পুরুষের, একটি নারীর। এ ভাস্কর্য একটি মিথুন! ওদের যোঁথ প্রার্থনার ঘটাকাশ ও পটাকাশ এখানে অভেদাঙ্গ।



য

কলিং-বেল-এর দড়িতে আঙুলটা ছোঁওয়াতে গিয়েও হাতটা টেনে নিল আবার। বুদ্ধদ্বারের পাশে কাঠের ফলকে লেখা ঠিকানা মিলে গেছে ; নামটাও : ‘এ. রোদ্যা’। বোধহয় ঠিকই আছে। ও যে খামখানা বিল করতে এসেছে তার উপর অবশ্য লেখা আছে ‘মস্যুয়ে অগুস্ত’ রেনে রোদ্যা’। কাঠের ফলকটায় না ‘মস্যুয়ে’ না ‘রেনে’ ; আর ফলকের ঐ ‘\’ যে অগুস্ত, তা কেউ হলফ নিয়ে বলেনি। বর্ণমালার ঐ আদ্য অক্ষরটি যদি অকালকুমাণ্ড, অপোগণ্ডেশ্বর জাতীয় অভাবনীয় কিছু না হয়, তবে সে গতব্যস্থলেই এসে পৌঁছেছে। কিন্তু এই বাড়ি ? হাড়-পাঁজরা বার করা ! পার্টতে যাবার মতো একজোড়া প্যাণ্টলুন আছে তো ওর ? তা হোক, মনে মনে ‘মনে’র কথা স্মরণ করে ও সাবধান হয়। তার নিয়োগকর্তা মাদাম এবং মস্যুয়ে জর্জ শাপেতিয়ে পারীর উচ্চকোর্ট-মহলের একজন অভিজাত্য অভিজাত। মাসে একবার তাঁর প্রাসাদে অষ্টবজ্র-সম্মেলন হয়। অর্থাৎ পার্ট। পারীর তা-বড় তা-বড় মহারথীরা সমবেত হন—মন্ত্রী, সেনেটর, রাজনীতিবিদ—প্রাক্তন-বর্তমান-হবু প্রধান মন্ত্রী এবং শিম্পী, শিম্প-সমজদার, শিম্প-ব্যবসায়ী—কবিসাহিত্যিক-মণ্ডাভনেতা-নেত্রীর দল। মাসে একবার তাই পিয়নটা চিঠি বিলি করতে বার হয় ঠিকানা খুঁজে খুঁজে। সচরাচর চিঠির প্রাপকেরা

প্রাসাদবাসী ; সেসব প্রাসাদের প্রবেশপথে পাহারা দেয় তক্কা-সাঁটা মাস্কেটিয়ার। সেসব প্রাসাদের বাগানে মার্বেল ন্যুডের চরণচুম্বিত মরশুমী ফুলের নিত্য-রামধনু। কম্বে লোয়া এক্স, কস্তাসিনা লা ওয়াই, আল-কাউণ্টেস্ লে জেড কিয়া ডিউক-এ্যাণ্ড-ডাচেস্ অব খোদায়-মালুম। শিম্পী-সাহিত্যিকেরা অবশ্য এমন খানদানী প্রাসাদের বাসিন্দা নন। একবার তো রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছিল চিব্রিশিম্পী ক্লদ মনে-কে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে—ভেঁথিয়ুলে—পারী থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। কড়া নাড়তে দোর খুলে দিয়েছিলেন ক্লদ মনের স্ত্রী, কামীল মনে ; কিন্তু গৃহস্থামিনীর আধময়লা ওয়াক-এ্যাপ্রনটা দেখে ও ভুল ভেবেছিল। মনে করেছিল বাড়ির ঝি। বলেছিল, ‘তোমার কর্তা-গিন্নির নিমন্ত্রণ আছে ; এই চিঠিখানা তাঁদের কারও হাতে দিয়ে পিয়ন-বইতে একটা সই করিয়ে আনো তো বাছা।’ মাদাম কামীল ‘মনে’ নিক্কথায় খাতখানা টেনে নিয়ে সই দিয়ে ফেরত দিয়েছিলেন। বেচারি ক্ষমা চাইবার আগেই সদর-দোর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওর নাকের ডগায়। সেই থেকে কারও দোরে কলিং-বেল বাজাবার আগে ও সতর্ক হয়। মনে মনে মাদাম ‘মনে’কে স্মরণ করে আর তাল ভাঁজে। কলিং-বেল বাজাতে যিনি দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন—অথবা যে



६६

বোঁমা !

বেটা কো বাপ, মাদারি কো সাঁপ, কাটে-না-কাটে মারে
অচানক্ লাফ !

মেরী-রোজ বলে, কবে পার্টি ?

বুড়ো প্রাণ-খোলা হাসি হাসে। বলে, অতটা বিদ্যে আমার
নেই। এম্মেটা চিনি, শাপেতিয়ের। যখন চাকরি করতুম
তখন পুলিশ-সাহেবের নামে এমন নিমন্ত্রণপত্র আসত কি না।

ছোট-খোকন ইঙ্কল থেকে ফিরে এলে তারে শুধিও !

আবার পাশ ফিরে শুরু হল তার বার্থক্য-নিদ্রা। মেরী-রোজ
এবার একটা চিন্তার সূত্র পেল। শাপেতিয়ের নামটা সে
জানে। শহরের এক হোমড়া-চোমড়া। অগুস্ত্ এতদিনে
তাহলে জাতে উঠেছে।

পেতি অগুস্ত্ স্কুল থেকে ফিরে এল সন্ধ্যা নাগাদ। কিন্তু
রহস্যজাল ভেদ করা গেল না। খামখানা এক নজর দেখে
বললে, আমি এখন ব্যস্ত। একটা ম্যাচ আছে।—বলেই
হুড়মুড়িয়ে খেলতে বেরিয়ে গেল।

অগুস্ত্ ফিরল রাত করে। চিঠিখানা পড়ে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে
উঠল তার। ডিসেম্বরের একত্রিশে শাপেতিয়ের বাড়িতে
নববর্ষের পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছে সে। অভিজাত মহলে
শিম্পী হিসাবে এই তার প্রথম স্বীকৃতি। পাপা রোদ্যা
উচ্ছ্বসিত। বললে, আর কে কে আসবেন ?

—তা কেমন করে জানব ? আন্দাজ করতে পারি মাত্র।
মিনিস্টার অব ফাইন আর্টস্, মস্যুয়ে আন্তোনি প্রুস্ত্ আর তৃতীয়
রিপাবলিকের মুকুটহীন রাজা গায়েতা নিশ্চয় আসবেন।
এদ্মনন্ড্ তাকুঁয়ে আসবেন সম্ভবত ; তিনি ফাইন আর্টস্
দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারি। শিম্পী দলের অনেকেই আসবেন।
মানে, মনে, দেগা, দানু, রেনোয়াঁ। কবিদের মধ্যে ম্যালার্মে,
বোদলের ; এবং সাহিত্য-মহারথীদের মধ্যে হয় য়ুগো, নয়
জোলা।

—হয় ইনি নয় উনি কেন ? দুজনেরই নিমন্ত্রণ হবে
না ?

—বোধহয় না। শুনছি ভিক্তর য়ুগো আর এমিল জোলা
মধ্যে ইদানিং মুখ দেখা-দেখি বন্ধ। য়ুগোর বয়স তোমার
সমান, প্রায় আশী ; আর জোলা ঠিক আমার বয়সী, চল্লিশ।
এমিল জোলা প্রথম অপরাধ : তার বই আজ বেশি বিক্রি
হয়। দ্বিতীয় অপরাধ, সে প্রকাশ্যেই বলেছে তার পূর্বসূরী

য়ুগো বা দুমা নন : বালজাক !

মেরী রোজ বললে, পার্টিতে তুমি কী পরে যাবে ?

মেয়েমানুষের উপযুক্ত প্রশ্ন ! যেন সেটাই একমাত্র বিবেচ্য !
অগুস্ত্ বলে, কিছু ভেব না তুমি। এসব পার্টিতে যাবার
উপযুক্ত পোষাক একরাতের জন্য সস্তায় ভাড়া পাওয়া যায়।

—তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও, প্লীজ। আমি স্যুটটা
বেছে দেব।

এর বেশি সে চাইতে সাহস পায় না। এটুকুতেই সে সন্তুষ্ট।
পার্টিতে তার নিমন্ত্রণ হয়নি, হবেও না কোনদিন। যে প্রতিভার
ব্যাপ্তি ও নিজের জীবনটাকে দীর্ঘমেয়াদী আমানত রেখেছে সেই
ব্যাপ্তি হয়তো একদিন ফুলে ফেঁপে উঠবে—ভার্সাই রাজ-
প্রাসাদ থেকে নিমন্ত্রণ পাবে অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ। সেদিনও
মেরী রোজ ঘরের কোণে বসে বসে কল্পনায় দেখবে
আলোকোজ্জ্বল প্রমোদকক্ষ—ঝাড়-লঠন, শ্যাঙেলয়ার—
শ্যাম্পেনের বন্যাস্রোত। তা হোক, অগুস্ত্ যখন পার্টিতে
যাবে, আর ও যখন ভোর্নিশিয়ান লুভারটা উঁচু করে দেখবে
তখন যেন অন্তত সে মনে মনে বলতে পারে : ‘রাজপথ দিয়ে
চলে এত লোকে, এমনটি আর পড়িল না চোখে, আমার
যেমন আছে।’

কবিপল্লী নয়, কবিমানসী নয়—স্টোনকাটারের মডেল !



সে'ন নদীর দক্ষিণ-পারের চেয়ে উত্তর-পারেই
নয়ন-মনোহর সৌধ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ভীড়াও
সৈদিকেই বেশি। বোধকারি সেজন্যই মস্যুয়ে
শাপেতিয়ে নদীর বামতীরকে পছন্দ করেছেন
এবং সমগ্র পারী-নগরীর অন্যতম মনোরম

প্রাসাদটি বানিয়েছেন। আরও একটা প্রভেদ আছে। অধিকাংশ
প্রাসাদই গড়ে উঠেছে, এটি ফুটে উঠেছে। সামনে প্রকাণ্ড লন,
পোর্টিকো, হল-কামরা—ভিতরে কী আছে খোদায় মালুম।
রু দ্য গ্রেনেলে পৌছে অগুস্ত্ দিশেহারা হয়ে গেল। গাড়ির
পর গাড়ি, তন্মাদারীর ছড়াছড়ি, ‘কার্টেসী বাও’ আর ‘বঁজুঁ’-র
বাড়াবাড়ি। গাড়ি সবই অঞ্চালিত—ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া,
হ্যানসম, ফিটন আর ল্যাগোই বেশি। অগুস্ত্ একটা ভাড়া-করা
হ্যাক্সিনে এসেছিল ; নিমন্ত্রণবাড়ির কাছাকাছি এসে ছেড়ে
দিল গাড়িটাকে। নিমন্ত্রিত যে কতজন তা আন্দাজ করা অসম্ভব।
একটি উচ্চ মঞ্চে মস্যুয়ে শাপেতিয়ে যুগলে দাঁড়িয়ে ;

নিম্নিতরা লাইন করে মণ্ডের দিকে যাচ্ছেন, কর্তা-গিন্নীর করমর্দন করে ভীড়ে মিশে যাচ্ছেন। পাশে খাড়া আছেন দু-তিনজন সেক্রেটারি। তাঁরা আগন্তুকের নাম ও সৎক্ষিপ্ত পরিচয় ঘোষণা করছেন। তাঁরা বোধকারী জীবন্ত পারী বিশ্ব-কোষ। সবাইকেই চেনেন। লক্ষ্য হল, এক কোণায় বসে জনৈক করণিক ঘোষণামাত্র আগন্তুকের নামটি একটি 'বৈকুণ্ঠের খাতায়'-য় লিপিবদ্ধ করে চলেছে। এ্যাঙ্কোবোটিক্যাল। পার্টি চলাকালে নিম্নিত ব্যক্তিটি সুযোগমত চিহ্নিত খোপে তাঁর স্বাক্ষরটি দিয়ে যাবেন—এটাই নিয়ম। অগুস্ত্ কিউ-সরীসূপে সামিল হল এবং অচিরেই নিম্নিত কর্তা-কর্ত্রীর সমীপে উপনীত হল।

একটা অস্বাভাবিক নীরবতা। বিশ্বকোষও ফেল মেরেছে। তার কালঘাম ছোটর উপক্রম। মসুয়ে..., ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য মসুয়ে, পারদ...

অগুস্ত্-এর কান দুটি রক্তিম হয়ে ওঠে। ভদ্রলোকটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলে, আজে না, 'মসুয়ে পারদ' নয়, অগুস্ত্ রোদ্য!

মাদাম শার্পেতিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর সেক্রেটারির দুটি সংশোধন করে নিতে বলেন, ভুল বুঝবেন না মসুয়ে রোদ্য; শুধু 'নাম' নয়, আপনার গুণকীর্তন কী ভাষায় করতে হবে সেকথাই উনি খুঁজছিলেন।

ওর করগ্রহণ করে স্বামীর দিকে ফিরে বলেন, নবীন ভাস্কর, চিনতে পেরেছ নিশ্চয়? সেই যে, যাঁর মূর্তিটা ছাঁচে বানানো বলে অভিযোগ উঠেছিল—

জর্জ শার্পেতিয়ে বলে ওঠেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনব না কেন? সেণ্ট জনকে ঘনি—

পরবর্তী কিউ-সরীসূপের অংশীদার ততক্ষণে অগ্রসর হয়ে আসায় সেণ্ট জনকে পুনরায় সর্বসমক্ষে দিগম্বর হতে হল না। বাক্যটা অসমাপ্ত রইল। অগুস্ত্ মিশে গেল অতিথ্যারণ্যে। সব উৎসাহ নিবে গেছে তার। শিম্পী-হিসাবে তার যুগল কীর্তিই অভিনন্দিত; জ্যাস্ত-মানুষের হাঁচ তোলা এবং সেণ্ট জনকে ন্যাংটো করা। এক সন্ধ্যার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট! ইচ্ছে হল বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু তখনই দেখা হয়ে গেল ভাস্কর-শিম্পী ব্যুশের সঙ্গে। সেই ব্যুশে, যে এসেছিল সালোঁর তরফে প্রস্তাব নিয়ে। ইতিমধ্যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছে।

ব্যুশে বললে, এ সুট্টায় তোমাকে কিন্তু দারুণ মানিয়েছে অগুস্ত্।

অগুস্ত্ বলে, তবু ভালো, পোষাকটা অন্তত একজনের নজরে পড়েছে! আমার তো ধারণা হচ্ছিল, সবাই ভাবছে, পোষাকের তলায় আমিও ন্যাংটো সেণ্ট জন-এর মতো।

—ঈডিয়ট! জর্জ আর মাদাম শার্পেতিয়ের পার্টিতে যে শিম্পী প্রথম আসে সে সেই সন্ধ্যায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আর তুমি এরই মধ্যে ক্ষেপে উঠেছ! এস, তোমার সঙ্গে কয়েকজনের পরিচয় করিয়ে দিই।

সামনের হল-কামরায় একটি প্রকাণ্ড তৈলচিত্রের সামনে একটা জটলা। তৈলচিত্রটি রেনোয়াঁ সম্প্রতি এঁকেছে—মাদাম শার্পেতিয়ে আর তাঁর দুই সন্তানের। রেনোয়াঁ আর 'মানে' উপস্থিত, আরও একজন মধ্যমণি ছবিটি দেখছিলেন। চিত্রটির শৈম্পিক বিচার চলল কিছুক্ষণ। ক্ষণিক ছেদ পড়তেই ব্যুশে সেই মধ্যমণিকে সম্বোধন করে বললে, মসুয়ে জোলা, আপনার সঙ্গে পরিচয় করাতে আমার বন্ধুকে নিয়ে এলাম। অগুস্ত্ রেনে রোদ্য। এ হচ্ছে...

এমিল জোলা ঘুরে দাঁড়ালেন। কালো কোট-প্যাণ্ট, নিতান্ত সাধারণ পোষাক, কালো চাপ দাড়ি, নীল একজোড়া চোখ। হাত তুলে তিনি থামতে বললেন ব্যুশেকে! অগুস্ত্কে আপাদ-মস্তক দেখে নিয়ে বললেন, আপনার 'জন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি আনন্দিত যে, আপনি ধর্মীয় নীতিবাগীশ নন, প্রকৃতিপ্রেমিক।

অগুস্ত্ একটি কার্টিস বাও করে বলে, দুটোর একটাও নই, আমি ভাস্কর।

—হতে পারে। কিন্তু আপনি বিদ্রোহী ভাস্কর।

—বিদ্রোহ আমি করতে চাইনি। পাকেচক্রে—

—এবার আমি দুর্গত। সজ্ঞান বিদ্রোহীকে আমি সম্মান করি, পাকেচক্রে যে বিদ্রোহ করে তাকে আমি করুণা করি। শিম্প একটি যুদ্ধক্ষেত্র। বিদ্রোহ যে সজ্ঞানে করতে নারাজ সে অচিরেই রাম-শ্যাম-যদুর দলে নাম লেখায়।

আলোচনার একটা সূত্র পাওয়া গেল। পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র—অর্থাৎ 'শিম্পের প্রয়োজনে বিদ্রোহ, না বিদ্রোহের প্রয়োজনে শিম্প'-এই বিতর্ক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল অগুস্ত্কে ছেড়ে।

ব্যুশে ওর হাত ধরে অন্যত্র নিয়ে চলে। রেনোয়াঁ বলে, জোলা'র

কথার মন-খারাপ কর না অগুস্ত্। ও একটু আগে তোমার 'সেন্ট জন'-এর দারুণ প্রশংসা করছিল।

অগুস্ত্ গভীর হয়ে বলে, আমি তার প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করতে যাইনি।

—অমন করে বল না অগুস্ত্। এমিল জোলা আমাদের পক্ষে। তরুণদের পক্ষে।

—এদুগার দেগ্যাকে দেখাছি না যে ?

—এদুগার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রিপাবলিকান নয়, শাপেতিয়েরা মনে প্রাণে রিপাবলিকান।

—অর্থাৎ রাজনীতি! আর 'মনে' ?

—'মনে' ! তুমি জান না 'মনে'র খবর ?

—কী খবর ?

—কামীল মারা গেছে গত সপ্তাহে।

অগুস্ত্ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, কী বলছ ব্যুশে ! কী করে ?

—এই পরিবেশে দাঁড়িয়ে সে-কথা বলতে আমারও খারাপ লাগবে, শুনতে তোমারও। 'মনে' একেবারে ভেঙে পড়েছে। আহা-নিদ্রা তো বোঁ-এর অসুখের সময়েই ত্যাগ করেছিল—এখন ছেড়েছে ছবি আঁকা ! ও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে। সুযোগমত একদিন ওর সঙ্গে দেখা কর। কেমন ?

অগুস্ত্ কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। 'মনে'-র সঙ্গে ওর দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না ; কিন্তু দুজনেই দুজনকে দারুণ ভালোবাসত ! রুদ 'মনে'-র ছবির বাজার নেই—সে এখনও প্রতিষ্ঠা পায়নি ; কিন্তু লড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল কামীলের কথাও। প্রাণচণ্ডলা শি পীগৃহিণী। প্রাণ দিয়ে আগলে রাখত পাগল শিম্পীকে। ছবি আঁকতে বসলে 'মনে' নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত—কামীল ধমক দিয়ে কেড়ে নিত রঙ-তুলি। অগুস্ত্ বললে, ব্যুশে, আমাকে বল—কী হ্যাঁছিল কামীলের ? এমন রাতারাতি—

ব্যুশে জবাব দিল না। রেনোয়াঁ ওর কানে কানে বলে, রাতারাতি নয় বন্ধু ! দীর্ঘ দিনের সংগ্রাম ! ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়েছেন রক্তাপত্যজানিত অসুখে মৃত্যু হয়েছে। সাদা-ফ্রেণ্ডে যাকে বলে : অনাহারে !

শাপেতিয়ে প্রাসাদের মহামূল্য শ্যাঙেলয়ার, চিপেঙেল ফার্নিচার, বাগানের ফোয়ারা, মর্মর-নিগিকা, প্রবেশপথের সার-দেগ্গো বুহাম-ফিটন-ল্যাগো-ভিক্টোরিয়া মনে হল স—ব

মিথো, মিথো, মিথো !

এ সন্ধ্যায় ফরাসী-শিম্পি আশ্রয় নিয়েছে শিম্পী 'মনে'র ঝোপড়িতে। ইউরিডিস্-এর বিরহে যেখানে অরফিউস্ আর বীণা বাজাতে পারছে না ! রঙ-তুলি ক্যানভাসের মাঝখানে নিশ্চুপ বসে আছে 'মনে'।

ব্যুশে ওর কানে কানে বলে, প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে দেখ অগুস্ত্।

অগুস্ত্ মনে মনে 'মনে'র ঝোপড়ি ছেড়ে নেমে এল ফরাসী-শিম্পির শ্যাম্পেনসমুদ্রসৈকতে।

প্রবেশদ্বারের কাছে একটা জটলা। নবাগতকে ঘিরে। নবাগতের নাম বা পরিচয় কিছুই ঘোষিত হল না। সেটুকুই তাঁর সম্মান। অশীতিপর ভিক্টর য়াগো আজকের পারীতে একজন ডেমি-গড। গ্রিশের দশকে ক'লকাতার কোন নিমন্ত্রণ বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করলে যে গুঞ্জন প্রতিক্রিয়াটা হত সেটা যদি কম্পনা করতে পারেন তাহলে আমি আর পণ্ডিত্রম করে বর্ণনা করতে বসি না।

তফাৎ আছে। য়াগো আশী বছরেও ওক গাছের মতো সোজা। তারুণ্যের সঙ্গে তাঁর অন্য জাতের প্রতিযোগিতা চলে আজও—প্রতি রাতে না হলেও সপ্তাহান্তে তাঁর শম্যাসঙ্গিনীর বদল হয় ! তাঁর লেখনী এখনও সচল, এটুকু সবাই জানে ; কিন্তু অল্প কিছু অন্তরঙ্গ-মহল খবর রাখেন য়াগো ইদানিং লর্ড বায়রণ অথবা তাঁর মানসপুত্র ডন জুয়ান-এর রেকর্ড বিচূর্ণ করতে বদ্ধপারিকর।

অগুস্ত্ আপনমনে বলে ওঠে—ঐ মাথাটা আমার চাই !

—মাথাটা ! য়াগোর মাথা। ক্ষেপে গেলে নাকি ?

অগুস্ত্ লজ্জা পায়। বলে, না, মানে, কী অসাধারণ মাথাটা ! মিকেলাঞ্জেলো ঔঁকে দেখলেও ঐ কথা ভাবতেন। অমন একটা হেডস্টাডি করতে পারলে সব ভাস্করই ধন্য !

—তুমি সিরিয়াস্ ?—ব্যুশে জানতে চায়।

—তুমি সুযোগ করে দিতে পার ? য়াগো সিটিং দেবেন ?

—না, আমি পারি না। তবে ম্যালার্মে হয়তো পারে। কার্ব ম্যালার্মেকে উনি দারুণ স্নেহ করেন। ম্যালার্মের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

—বাঃ ! তোমার মনে নেই, তুমি আর ম্যালার্মে তো একসঙ্গেই এসেছিলে আমার স্টুডিওতে, অলিভ পাতায় জনের লজ্জা নিবারণের প্রস্তাব নিয়ে।

—হ্যাঁ তাইতো। চল, আগে ম্যালার্মেকে ধরা যাক।

সব শুনে ম্যালার্মে বললে, আমি তোমার জন্য চেষ্টা করে দেখতে রাজি আছি অগুস্ত্। ভেব না, তোমাকে অনুগ্রহ করছি। য়াগোর উপযুক্ত মূর্তি আজও কেউ বানাতে পারেনি। হয়তো তুমি পারবে। এস—

ব্যুশে বলে, একটা কথা। অগুস্ত্ যে একটু আগে এমিল জোলার সঙ্গে কথা বলছিলেন তা তো দেখিনি বুড়ো কত?।

অগুস্ত্ জানতে চায়, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

ম্যালার্মে বলে, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জোলা আর য়াগোর মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। তুমি আগে জোলার কাছে গেছ জানতে পারলে—

অগুস্ত্ বাধা দিয়ে বলে, তাহলে শাপেতিয়ে দুজনকে একসঙ্গে নিমন্ত্রণ করে কেন?

—কাকে বাদ দেবে? য়াগো বাদে প'টি হচ্ছে ডেনমার্কের রাজপুত্রহীন 'হ্যামলেট' অভিনয়। আর জোলার যাবতীয় গ্রন্থের প্রকাশক জর্জ শাপেতিয়ে!

ব্যুশে আর রেনোয়াঁ মানে-জোলা গ্রুপের দিকে এগিয়ে যায়। আর অগুস্ত্কে নিয়ে ম্যালার্মে চলে আসে য়াগোর কাছে। মহাকাব্য তখন ফ্যান-বোঁসিত। কবি-ভক্তদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—আধুনিক কবিতায় ভুলটা কোথায় হচ্ছে। কেন নবীন-গোষ্ঠী—বদলের, ম্যালার্মে প্রভৃতি য়াগোর সাফল্যচূড়ার কাছাকাছি আসতে পারছে না। হঠাৎ ম্যালার্মেকে এগিয়ে আসতে দেখে ওদের দিকে চোখ টিপে বললেন, ও আলোচনার এখানেই সমাপ্ত!

—এস, এস নবীন কবি! তোমারই জয়গান গাইছিলাম আমরা এতক্ষণ।

ম্যালার্মে বলে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে নিয়ে এসেছি। আমার বন্ধু : অগুস্ত্ রোদঁয়া। বর্তমান পারীর সবচেয়ে আলোচিত ভাস্কর।

য়গো পারীসিন ভদ্রতায় এনচাণ্টেড হবার অভিনয় করে যন্ত্র-চালিতের মতো বললেন : আশাঠে!

—এবারের সালোঁতে ওর দুটি ভাস্কর্য—'সেন্ট জন' আর 'রোজুগু'—

—ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তোমার হাতের কাজ আমার ভালো লেগেছে বোঁদো।

নিজের নামটা বিকৃত হওয়ায় আহত হল অগুস্ত্। সংশোধন

করে দিল না কিন্তু।

ম্যালার্মে বলে, ওর আদম ঈভও অনবদ্য, রোজুগু—

বাধা দিয়ে য়াগো বললেন, আদম ঈভ আমি দেখিনি। সে দুটিও কি ছাঁচে বানানো?

অগুস্ত্ শ্রুতিত। মনের বিরক্তি প্রকাশ করতে সে ঠক্ করে পানপাত্রটা টেবিলে নামিয়ে রাখল শুধু।

ম্যালার্মে যোগ করে, ওর ইচ্ছে ও আপনার একটা হেডস্টাডি...

—এনাফ্! মাঝপথেই ম্যালার্মেকে থামিয়ে দিয়ে য়াগো বলে ওঠেন, ইতিপূর্বেই আট-দশবার আমার 'গিলোতিন' হয়ে গেছে। আর মুণ্ডপাত করবার ইচ্ছে নেই! অনাগতকাল যদি এই অযোগ্য কবির প্রতিমূর্তি টেবিলে সাজিয়ে রাখতে চায়, তবে তারা যেন এক-একখণ্ড 'লে মিজারেবল' কিনে রাখে।

ম্যালার্মে তবু সুপারিশ করে, ওর মূর্তিগড়ার ঢঙ্ কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আপনাকে সিটিং দিতে হবে না আদো। আপনি নিজের মতো লিখে যাবেন, নড়াচড়া করবেন, ও তারই ভিতর আপনার মূর্তি গড়তে পারবে।

—হতে পারে। কিন্তু তার চেয়ে ওর পক্ষে সহজ হবে আমি মারা গেলে মুখের একটা মোমের ছাঁচ তোলা। মোটকথা, আমি যদি আদো আবার কোনও ভাস্করের যূপকার্ঠে মুণ্ড বাড়িয়ে দিতে রাজি হই, তবে পরখ্ করে দেখে নেব—সে শূন্য পানপাত্র কী-কায়দায় টেবিলে নামিয়ে রাখতে পারে।

অগুস্ত্ একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছি, কিন্তু বাধা পড়ল। সকলেরই দৃষ্টি গেল দ্বার পথের দিকে। একটি অপূর্ব সুন্দরী যুবতী সদ্য উপস্থিত হলেন সাক্ষ্য-সম্মেলনে।

মহিলার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। কালো ভেলভেটের লো-কাট্ রাউন্ডের ভিতর দিয়ে বুকের উপত্যকা পরিদৃশ্যমান। বাহু দুটি নিরাবরণ, গলায় মুক্তোর একটি শতনরী। যার দুটো মুক্তো দলছুট হয়ে ওর কানের লতি থেকে ঝুলছে। বাঁ-হাতের অনামিকায় একটা বেশ বড় মাপের হীরে। মেয়েটি ওদের দিকেই অগ্রসর হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের ফ্যান, তাঁকে দেখতে পেয়েছে। অগুস্ত্ লক্ষ্য করল মুহূর্ত মধ্যে য়াগোর দৃষ্টিতে একটা দ্রুত পরিবর্তন হল! লালসার প্রতিচ্ছায়া! য়াগো মহিলাটির করগ্রহণমানসে নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন।

আশ্চর্য! মেয়েটি ভ্রূক্ষেপ করল না। একবার চোখ তুলে

ঘ্যাগোকে দেখল না পর্যন্ত ! সরাসরি এগিয়ে এল অগুস্তের সামনে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, পারদ, আপনি কি মসুয়ে অগুস্ত্ রেনে রোদ্যা ?

অগুস্ত্ জবাব দিতে পারল না। অপরিচিত মেয়েটির দিক থেকে তার দৃষ্টি সরে গেল মহাকাবির দিকে। তাঁর মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। হাত দুটি পকেটে। অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন এবার অগুস্তের দিকে। যেন এতক্ষণে ঐ তরুণ ভাস্করের প্রকৃত স্বরূপটা তিনি প্রণিধান করতে পেরেছেন।

যেন ইম্পেক্টর জ্যাভার্ড হঠাৎ চিনতে পেরেছে : জাঁ ভালজাঁকে ! আর ঠিক সেই খণ্ড মুহূর্তেই ঘনিয়ে এল নীরক্স অঙ্কার !

রাত বারোটা। হল-কামরার সবকটা গ্যাসের বাতি একসঙ্গে নিবে গেল। বহু দূর থেকে, সেন-এর ওপার থেকে ভেসে এল কিছু পট্কার শব্দ। আর গীর্জার ঘণ্টাগুলো সমবেতভাবে দুলতে থাকে নববর্ষের আগমনীতে।

অগুস্ত্ হঠাৎ অনুভব করল তার দুই স্কন্ধে পেলবস্পর্শ। কে যেন তাকে আলিঙ্গন করে আকর্ষণ করছে। নিচু হতেই ঘ্রাণে লাভ করল অত্যন্ত মহার্ঘ ফরাসী সুগন্ধীর সৌরভ। অগুস্ত্ অপরিচিতার কর্ণমূলে বলতে গেল : শুভ নববর্ষ।

বলা হল না। ওর ওষ্ঠ অঙ্কারে মেয়েটির কর্ণমূল স্পর্শ করা মাত্র ও অনুভব করল মেয়েটির বাঁ-কানে প্রত্যাশিত কর্ণাভরণটি নেই ! নীরক্স অঙ্কারে এপাশে-ওপাশে শুধু চুয়ন-শীৎকার ! অগুস্ত্ ভাবতে গেল - মুহূর্ত মধ্যে দুলটা হারিয়ে গেল কি-করে, কিন্তু সে চিত্রাটুকুরও অবকাশ পেল না—কারণ তার পূর্বেই নিজ ওষ্ঠাধরে লাভ করল একটি কবোক্ষ স্পর্শ !

ও কী-যেন বলতে গেল - বলা হল না—মেয়েটি বন্ধনযুক্ত হতে চাইছে এবার। এতক্ষণে বিহ্বলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে—ও নিবিড় করে মেয়েটিকে এইবার আলিঙ্গন করে ধরতে গেল ; কিন্তু সেটাও হল না। মেয়েটি অক্ষুণ্ণে বললে, ছেড়ে দাও মন্-আমি ! এখনই আলো জ্বলে উঠবে !

ঠিক কথা ! খণ্ড মুহূর্ত পরেই হল-কামরায় আলোর শতনরী খিল্খিলিয়ে হেসে উঠবে ; মুহূর্তের অন্ধ আনন্দ-শিহরণকে দীর্ঘায়ত করার মূখ্যমি যারা দেখাবে তারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপে হবে অপ্রভুতের একশেষ। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় অগুস্ত্ মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। আর ঠিক তখনই-জ্বলে উঠল

হাজারবাতি।

অর্কেস্ট্রা যেন প্রতীক্ষায় ছিল। তৎক্ষণাৎ শুরু হল নববর্ষের আগমনী।

হঠাৎ-আলোর ঝল্কাফানিতে চোখটা ধাঁধিয়ে গেছিল। একটু সয়ে যেতে অগুস্ত্ তাকিয়ে দেখল চারপাশে। ওর অতি-সন্নিকটে কোনও মহিলা নেই ! ম্যালার্মে ওর দক্ষিণে, বাঁয়ে অপরিচিত একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, ঠিক সামনে যেখানে ঐ অপরিচিতার থাকার কথা—যদি না সে বিদ্বদ্ভ্রমতার মতো দুতসঞ্চারিণী হয়—সেখানে ব্যুশে। ঘ্যাগো কর্পোরের মতো উবে গেছেন। আর অনুপস্থিত—গত বৎসরের শেষ মুহূর্তটিতে যে মেয়েটি তাকে শেষ-প্রথম প্রম্মিটি পেশ করেছিল : আপনিই কি মসুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যা ?

বৎসরের প্রথম মুহূর্তটাই এ কী অদ্ভুত ভেল্কি নিয়ে এল ওর জীবনে ?

ম্যালার্মে বলে, এস, তোমার সঙ্গে গায়েতার আলাপ করিয়ে দিই।

অগুস্ত্-এর উৎসাহের পুঞ্জি ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল, পর পর দুই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে—জোলা আর ঘ্যাগো। তাছাড়া ও-বছরের শেষ যেভাবে এ-বছরের প্রথম মুহূর্তটির সঙ্গে মিলেমিশে একটি রহস্যজাল বিস্তার করল তাতে সে বেশ কিছুটা বিমূঢ় হয়ে গেছে। তবু গায়েতা হচ্ছেন গায়েতা—নব-প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ফরাসী-দেশের মুকুটহীন রাজা।

গায়েতা ওর পরিচয় পেয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন আপনার 'জন' আমাকে মুগ্ধ করেছে। কী জানি কেন আমার মনে হয়েছে আপনার 'জন' ফরাসী !

প্রতিবাদ করাটা মূখ্যমি জেনে অগুস্ত্ বললে, সেটা আপনার জাতীয়তাবোধের প্রাবল্যের জন্য। আমার কম্পনায় 'জন' ফরাসী নন, শুধু সেগ্টও নন, তিনি মানুষ।

গায়েতা হাসলেন ! বললেন, আপনার কথা প্রথম শুনছিলাম 'মনে'র মুখে। 'মনে' বলিছিল আপনার একটি নগ্নিকা—'ব্যাকান্তি'র মতো ন্যূড সে জীবনে কখনও দেখিনি—ল্যুভারেও নয় ! সেটা দেখাতে পারেন ?

অগুস্ত্ স্তম্ভিত ! 'মনে' তাকে কোনাদিন এ কথা বলেনি। 'মনে' স্বভাবত স্বপ্নভাষী, উচ্ছ্বাস তার জিহ্বায় নয়, তুলির ডগায়—কিন্তু 'ব্যাকান্তি' মূর্তিটা 'মনে'র এত ভাল লেগেছিল

সে-কথা সে ব্যাকান্তির সৃষ্টিকর্তাকে একবারও তো বলেনি !
কেন ?

—‘ব্যাকান্তি’ মূর্তিটা কি আপনার স্টুডিওতে আছে ?

—আমি দুর্গখত মস্যুয়ে গাষেতা, ‘ব্যাকান্তি’ নেই। একটি দুর্ঘটনায় সেটা চূর্ণ হয়ে যায়। ওটার প্লাস্টার কাস্ট বানানো হয়নি। সেটা ছিল মাটির।

—আপনার স্টুডিও একদিন দেখতে যাব ! ধরুন আগামী রবিবার সকালে ? আপনার সময় হবে ?

অগুস্ত্ উচ্ছ্বসিত। স্বয়ং গাষেতা তার স্টুডিওতে যেতে আসতে চাইছেন ! বললে, আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করব স্যার !

—তাহলে আসুন, আপনাকে প্রুস্ত্-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ওঁকে সঙ্গে নিয়েই আমি যাব। জানেন নিশ্চয়, আন্তোনি প্রুস্ত্ আমাদের নতুন সরকারের লালিত-কলা-মন্ত্রী। আন্তোনি প্রুস্ত্ দীর্ঘকায়, সুগঠিত, সুন্দর পুরুষ। সাজপোষাকের বিষয়ে যত্নবান। গাষেতা যেমন, সাজপোষাকের বিষয়ে একেবারেই অনবহিত। প্রুস্ত্ কেতাদুরস্তভাবে অগুস্ত্-এর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

কথাপ্রসঙ্গে গাষেতা বললেন, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, কিছুদিন ধরেই আমি আর প্রুস্ত্ আলোচনা করছিলাম—ক্যোয়ে দ’অর্সে নতুন যে কলাভবনটি নির্মিত হবে—‘ম্যুসে দে আর্জ দেকরেতিভ’ (মিউজিয়াম অব ডেকরেটিভ আর্ট) তার একটি জ্বর প্রবেশ-তোরণ বানানো দরকার। ফ্লোরেন্সে যেমন আছে ঘিবার্টির রোজ-তোরণ ‘স্বর্গদ্বার’ তারই ক্ষুদ্রতর এক সংস্করণ। এ কাজ বুড়ো-হাণ্ডার নয়। তুমি...আইমীন, আপনি এ কাজটা নিতে পারেন ?

অগুস্ত্ রীতিমতো বিহ্বল হয়ে পড়ে। ফ্লোরেন্সের সেই গীর্জাটিকে চোখের সামনে দেখতে পায়। ঘিবার্টি সমস্ত জীবনব্যাপী পারিশ্রমেও সেই বিশাল তোরণটি শেষ করতে পারেননি। পাঁচ-দুগুনে দশটি প্যানেলে ওল্ড-টেস্টামেন্ট বিধৃত ! মিকেলাঞ্জেলো সেটি দেখে বলেছিলেন, ‘এই গেট স্বর্গের বাস্তব তোরণদ্বারে স্থানান্তরিত হবার উপযুক্ত।’

—অবশ্য আমাদের তোরণদ্বার কত বড় হবে, কত খরচ হবে, এসব প্রুস্ত্ স্থির করবে। আমার উপর শুধু দুটি দায়িত্ব—ভাস্কর নির্বাচন এবং বিষয়বস্তু।

—বিষয়বস্তুটা কী ?

গাষেতা হেসে বলেন, সেটা শিল্পী-নির্বাচনের পরের ধাপ নয় কি ? আপনি এখনও বলেননি—দায়িত্বটা নিতে প্রস্তুত কিনা।

অগুস্ত্ একটি ‘বাও’ করে বললে, আপনি আমাকে এতবড় সম্মান দিচ্ছেন—

—আমি নই ; ফ্রান্স ! থার্ড রিপাবলিক !

—আমি সানন্দে স্বীকৃত।

প্রুস্ত্ হেসে বলে, দরদাম না জেনেই ?

অগুস্ত্ও হেসে বলে, নিশ্চয়ই ! এ তো কোন সম্মানের খেলালখুশীর উচ্ছ্বাস নয় ! আমার নিয়োগকর্তা ফ্রান্স ! থার্ড রিপাবলিক !

—রাভো ! এ জাতীয় প্রত্যুত্তরই প্রত্যাশায় ছিল আমাদের। গাষেতা উচ্ছ্বসিত।

—কিন্তু বিষয়বস্তুটার কথা আপনি এখনও বলেননি।

—না, বলিনি। এটা তার অনুকূল পরিবেশও নয়। আগামী রবিবার, আপনার স্টুডিওতে সে-কথা হবে। আজকের আলোচনার এখানেই শেষ, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ।

—না, শেষ নয়। একটা উপসংহার বাকি আছে—আপনি আমাকে তুমিই বলবেন ; মস্যুয়ে রোদ্যাঁ নয়। অগুস্ত্।

—তাই হবে অগুস্ত্ !

পার্টির বাকি পর্যায়টুকু অগুস্ত্ শার্পেতিয়ের প্রাসাদে ছিল না। ছিল আকাশে। কখনও ফ্লোরেন্স ব্যাপ্তিস্থির প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে, কখনও বা প্রবেশ-তোরণের ওপারে, অর্থাৎ সুখের সপ্তম স্বর্গে ! কত পাত্র শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করেছে, কী কী দুর্লভ খাদ্যের জীবনে-প্রথম রসাস্বাদন করেছে, কিছুই মনে নেই। এমন কি মনে নেই যখন এক ভদ্রলোক ওকে জনান্তিকে ডেকে বললেন, মস্যুয়ে রোদ্যাঁ, আপনি আমাকে চিন্তে পারছেন না ? আমি আপনার পুত্রের স্কুলের হেডমাস্টার—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনব না কেন ? খুব চিনেছি ! আপনার মতো শিক্ষক পেয়ে ফ্রান্স ধন্য।

—কিন্তু আপনি আমার কথাটায় কান দেননি। পোতি অগুস্ত্ গতবছর ক্লাস প্রমোশন পেল না বলে তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিলেন কেন ?

—না, না, ছাড়িয়ে তো দিইনি। প্রমোশন পায়নি সেটা অবিশ্যি আমি জানতুম না, কিন্তু ও তো প্রতিদিন ইস্কুলে

যায়। মাস-মাস স্কুলের মাইনেও দিয়ে যাচ্ছি।

--সে-কথাই তো বলছি আমি তখন থেকে। প্রতিদিন স্কুলে যাবার নাম করে সে অন্য কোথাও যায়। স্কুলের মাইনে সে অন্যভাবে খরচ করে --

অগুস্ত্ জড়িয়ে ধরে বস্কাকে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, তা হতেই পারে না মস্যুয়ে হেডমাস্টার! আপনাকে পেয়ে ফ্রান্স ধন্য! এমন সোনামণি হেডমাস্টারকে ছেড়ে পেতি অগুস্ত্ কোন্ চুলোয় যাবে বলুন? আমি নিতি ত্রিশ দিন দেখি সে বইখাতা বগলে আপনার ইস্কুলে যায়।...আপনি ফ্রান্সের গোরব!...বয়স থাকলে আশ্রমে সে শুল্লোরের বাচ্চার সঙ্গে নিতি ত্রিশ দিন ইস্কুলে যেতুম! আপনি সোনামণি হেডু! ...লক্ষ্মীমণি হেডু!

বৃদ্ধের গণ্ডে চুষন করে অগুস্ত্।

হেডমাস্টারমশাই মদ্যপের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে পালাবার পথ খুঁজতে থাকেন!



17.7.১০ ললিতকলা বিভাগের আগার সেক্রেটারী মস্যুয়ে তাকুয়ে অগুস্ত্কে সরকারীভাবে জানানেন প্রবেশ-তোরণের প্ল্যানটি অনুমোদিত। গায়েতা এবং প্রুস্ত্-এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর অগুস্ত্ তোরণের খসড়াটি প্রস্তুত করেছে।

ঘিবার্টি নির্মাণ করেছিলেন: 'স্বর্গদ্বার'। অগুস্ত্ বানাবে: 'নরকের দ্বার'!

প্রথমে শুনাই সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। সেটাই স্বাভাবিক। ললিতকলার প্রবেশদ্বারে 'নরক'! এ কেমন কথা? অগুস্ত্ বলেছিল, এটাই বাস্তব সত্য! স্বর্গ আছে কম্পনায়! নরক চোখের সামনে! থার্ড রিপাবলিক যদি মরুভূমির উটপাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে বলতে চায় --ফ্রান্সে অনাহার নেই, অত্যাচার নেই, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার অবকাশ নেই, তাহলে সে আলাদা কথা। না হলে, নরকের দৃশ্যটি জনগণের চোখের সামনে মেলে ধরতে হবে যেমন ভাবে মেলে ধরেছিলেন মিকেলাঞ্জেলো সিস্তিন চ্যাপেলে, শেষাবচার দৃশ্যে।

—আপনি কি মিকেলাঞ্জেলোকে অনুসরণ করতে চান?

—না! দান্তের 'ডিভাইনা কমেডিয়া'য় বর্ণিত নরক, যার

প্রতিচ্ছবি দেখেছি জোলায়, বন্দেলোয়, ম্যালার্মের কাব্যে!

আজকের ফ্রান্সে!

স্থির হল, তিন বছরে এই তোরণটি শেষ করবে অগুস্ত্। পারিশ্রমিক আট হাজার ফ্রাঁ। সরকার এজন্য ওকে একটি পৃথক স্টুডিও ভাড়া করে দিলেন রুদ ল'য়ুনিভার্সাইৎ-এ। অগুস্ত্ কিছু আগাম টাকা পেল মালপত্র কিনতে। ঐ সঙ্গে ভাড়া করল দ্বিতীয় একটি স্টুডিও, বুলেভাৎ দে ওয়া গিরাদ-এ। সেখানে সে অন্যান্য কাজ করে। সরকারী স্টুডিওতে শুধুমাত্র 'নরকের দ্বার'।

কয়েক মাসের মধ্যেই সরকারী স্টুডিওটা হয়ে গেল শিষ্পতীর্থ। নানান ছাত্রদল আসে, লক্ষ্য করে ওর কর্মপদ্ধতি। স্কেচ করতে থাকে। প্রতি শনিবার বিকালে দল বেঁধে আসে পারীর সাধারণ মানুষ। অগুস্ত্ কিছু সহকারীও নিয়েছে। একদিন লেকক্ স্বয়ং এসে দেখে গেলেন। অগুস্ত্ জানতে চাইল তাঁর সাজেশ্যান। লেকক্ সর্বকিছু খুঁটিয়ে দেখলেন -- অসমাপ্ত মডেল, স্কেচ, ডিজাইন। বললেন, তোর স্বকীয় চিন্তায় আমি কোনও বাধানিষেধ আরোপ করব না। তুই যেভাবে চিন্তা করিছিস্ সে ভাবেই এগিয়ে যা; কিন্তু আমার তিনটে সাজেশ্যান আছে; সেগুলো বলতে পারি, যদি তুই কথা দিস্ -- আমি বলেছি বলেই তা তুই গ্রহণ করবি না? সেগুলিকে আমার 'আদেশ' বলে মনে করবি না।

অগুস্ত্ হেসে বলে, মেত্র, আপনার পরামর্শ জন-এর নগ্নতাকে আমি আচ্ছাদিত করেছিলাম। সেটা কি আপনার 'আদেশ' হিসাবে? নাকি সেটা 'শুভবুদ্ধি'র নির্দেশ বলে?

—জানি না। আমি আজও তা ভেবে পাইনি! কোন্টা সত্য? —দুটোই। আপনার 'আদেশ' এবং আমার 'শুভবুদ্ধি' একাত্ম হয়ে গিয়েছিল বলে। এখন বলুন, আপনি কী কী পরামর্শ দিতে চান। কথা দাঁড়ি, সেগুলি আমি 'আদেশ' বলে ধরে নেব না। ছাত্রের প্রতি গুরুর পরামর্শ বলেই গ্রহণ করব।

—প্রথম কথা: তুই ঘিবার্টির অনুকরণে গেটটাকে দশটা প্যানেলে ভাগ করেছিছিস্। মিকেলাঞ্জেলো সিস্তিন চ্যাপেলেও ঐ ভাবে ভাগ করেছেন। কিন্তু ঘিবার্টি এবং মিকেলাঞ্জেলো দুজনেই ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে কতকগুলি খণ্ড-খণ্ড কাহিনী উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। তোর পারিকল্পনা তা নয়। তুই অখণ্ড-নরক ফুটিয়ে তুলতে চাস্। তাই আমার প্রথম সাজেশ্যান: প্যানেল পারিকল্পনা তুই বাদ দে।

অগুস্ত্ লারিয়ে ওঠে। বলে, মেংর ! ঠিক ঐ কথাই ভাব-
ছিলাম আমি কদিন ধরে। আজ আপনাকে ঐ প্রশ্নটা করব
ভেবে রেখেছিলাম ; অথচ আপনি নিজে থেকেই—

—দ্বিতীয় কথা : দান্তের 'ডিভাইন কমেডি'-র বহু সচিব
সংস্করণ আছে। আমার ইচ্ছে নয়—তুই দান্তেকে আক্ষরিকভাবে
অনুসরণ করে চলিস্ ! দান্তে মহান কবি—কিন্তু তাঁর চোখ
দিয়ে তুই নরক দেখবি কেন ? দান্তের হাত ধরে নরকের
দ্বারে পৌঁছে নিজের চোখ দিয়ে যদি—

অগুস্ত্ উচ্ছ্বাসিত হয়ে বাধা দেয়। বলে, মনে আছে মেংর !
আপনি ক্রাসে বারে বারে বলতেন, 'ওল্ড মাস্টার্সরা হচ্ছেন
সি'ন্ডার ধাপ। থাপন জুড়ে সেখানে বসে পড়ার জন্য নয়।
উত্তরণের জন্যই সোপানের প্রয়োজন।' দান্তেও তেমনি একজন
নরকের সি'ন্ডার ল্যাণ্ড ! এ-কথাই তো বলতে চান ?

—ঠিক তাই !

—আর শেষ সাজেশ্যান ?

—আমি খুব খুশি হব যদি তুই 'স্বর্গীয়' নরকের দ্বার গড়ে
তুলিস্ !

—'স্বর্গীয় নরকের দ্বার' ! তার মানে ?

—দ্যাখ্ অগুস্ত্ ! আমি দান্তের ঐ পংক্তিটা বিশ্বাস করি না :
'Abandon all Hopes, Ye who enter here !'

আমার একান্ত কামনা : তোর নরকের দ্বারে যেন 'প্রিমিথিউস'-
এর আভাস পাই, 'ফাউন্ট'-এর ইঙ্গিত পাই। সিস্তিন চ্যাপেলে
'শেষ-বিচার' দৃশ্যের কেন্দ্রবিন্দু যেমন যীসাস্-এর উৎক্ষিপ্ত
দক্ষিণ-হস্তের দক্ষিণ্য, তেমনি একটা-কিছু 'রিডীমিং ফিচার'
দিতে তুলিস্ না অগুস্ত্ ! দান্তের বর্ণনায় নরকে নীরব
অমরাট্রি ; কিন্তু শিম্পী হিসাবে বিশ্বাস রাখিস্ অগুস্ত্,
—নীরবতম রাট্রিও 'নিম্প্রভাত' হতে পারে না !

অগুস্ত্ লেকক্-এর সামনে নতজানু হয়ে বলে, আমেন !
আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন, মেংর।

লেকক্ ওর শিরশ্চূষন করে বললেন, ওরা বলেছে, তিন
বছর—আমি জানি বিশ বছরেও এ-কাজ শেষ হবার নয়। তবু
তুই এটা একদিন শেষ করে যাবি। আমি হয়তো সেদিন
থাকব না—কিন্তু মনে রাখিস্, অমর্ত্যলোক থেকে আমি
লক্ষ্য রাখব ; দেখব,—তোর নরকের দ্বারে প্যাণ্ডোরার
নিমগ্নুটি তুই ঠিক সময়ে বন্ধ করতে পেরেছিস্ কিনা।

অগুস্ত্ একদিন গেল 'মনে'-র সঙ্গে দেখা করতে। ভেঁথয়ুল

গায়ে। পারী থেকে বেশ কয়েক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে,
সে'ন-এর ধারে। না গেলেই ভাল হত। 'মনে' একেবারে ভেঙে
পড়েছে। কামীলের মৃত্যুতে। বললে, তুই এসেছিস্ ভাল
লাগছে। সবচেয়ে মজা কি জানিস্ ? কামীলের অসুখের
সময় আমি ঘটি-বাটি বাঁধা দিয়েছি ; তার সংকারের সময়
ভিক্ষা করতে হয়েছে আমাকে—

—আমি দুর্গত 'মনে' ! আমাদের কেন জানাস্ ?

—আমি যে আমার ক্রুশ নিজেই বইব ভেবেছিলাম। বয়েছিও !
কথা তা নয়। কথা হচ্ছে, কামীল মারা যাবার পর থেকেই
একের-পর-একটা ছবি বিক্রি হতে শুরু হয়েছে। পারী থেকে
আমার এজেন্ট টাকা পাঠাতে শুরু করেছে ! শালা যেন রসিকতা
করছে ! প্রতি সপ্তাহেই মনি-অর্ডার আসছে, আর আমি
রিফিউজ্ করছি !

—রিফিউজ্ করছিস্ ! টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছিস্ ?

—দেব না ? কী হবে এখন টাকায় ? ওকে কি এখন মুরগীর
সুরুয়া রেঁধে খাওয়াতে পারব ? ভাল ডাক্তার দিয়ে কি ওকে...
আর ঈশ্বরের কী স্থূল রসিকতা দেখ্—আমার সেই এজেন্ট
জানতে চেয়েছে, বড় কোনও কমিশন নিতে আমি রাজি আছি
কিনা। শালাহ্ !

—কী জবাব দিয়েছিস্ তুই ?

—কী আবার জবাব দেব ? কোনও জবাবই দিইনি। ছবি
আঁকা যে জন্মের মতো ছেড়ে দিয়েছি তা ওকে জানাতে যাব
কেন ?

—জন্মের মতো ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিস্ ?

—আলবৎ ! ঈশ্বর নামের ঐ লোকটার স্থূল রসিকতার ঐটাই
উপযুক্ত স্থূল জবাব !

কী প্রচণ্ড অভিমানে একথা বলছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়
না। ছবি ছিল ওর প্রাণ। ওদের দুজনের। আহা-নিদ্রা বাদ
দিয়ে কত দিবস-রজনী যাপন করেছে ওরা স্বামীস্ত্রী। কিন্তু
রঙ-তুলি-ক্যানভাসহীন দিন আসেনি ওদের দাম্পত্যজীবনে।
'মনে' আঁকত ক্যানভাসে, কামীল আঁকত মনে মনে। সিটিং
দেবার সময়।

অগুস্ত্ বলে, তবে তো বিপদে ফেল্লি ভাই। আমি তো
জানি না তুই ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিস্। আমি তাই রঙ,
তুলি, ক্যানভাস্ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম, তোর বাগানে বসে
দুজনে ছবি আঁকব বলে।

‘মনে’ চুপ করে কী ভাবল। তারপর বলে, তা তুই আঁকতে চাস্, আঁক না।

দুজনে গিয়ে বসে ওদের বাগানে। অগুস্ত্ স্ট্যাণ্ড-স্ট্রজেল সাজিয়ে বসে। ক্যানভাস্ সে নিয়েই এসেছিল ‘মনে’কে দেবে বলে। টুলে বসে আপন মনে বলতে থাকে, তুই কী সৌভাগ্যবান ! দুনিয়ায় এমন একজনকে পেয়েছিলা যার প্রতি ভালোবাসায় ছবি আঁকা পর্যন্ত ছেড়ে দিলা !

‘মনে’ ওর শূন্যপট ক্যানভাস্টাকে দেখাছিল পাশের একটা ইঁজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে। বললে, একে তুই আমার সৌভাগ্য বলিস্ ?

—বলব না ? আমার দিকে তাকিয়ে দেখ্ ; দুনিয়ায় আমার কি এমন কেউ আছে, যে মরে গেলে আমি মূর্তিগড়ার কাজ ছেড়ে দিতে পারব ?

‘মনে’ ধমক দেয়, ও কী করছিচ্ছ ? অত লিন্সীড-অয়েল মেশাচ্ছিচ্ছ কেন ?

অগুস্ত্ হেসে বলে, বহুদিন তেল-রঙে কাজ করি না তো, ভুলে গেছি—

—দে, প্যালেটটা আমাকে দে।

রঙ আর প্যালেটটা ‘মনে’র দিকে এগিয়ে দিয়ে অগুস্ত্ আপন মনে বলতে থাকে, কামীল তো আমার বন্ধু-পত্নী, কতটুকুই বা চিনতুম ওকে, বল্ ? অথচ আজ এই বাগানে বসে আমার মনে হচ্ছে—সমস্ত প্রকৃতিটাই বুঝি কামীলময়। ঐ উইলো গাছের পাতাগুলো যেন তার চুল—ঐ আকাশের নীলটা যেন তার চোখের তারা !...সূর্যের আলো পড়ে সীডার আর এল্‌ম-গুলোর পাতা কী অদ্ভুত চিক্‌চিক্‌ করছে দেখেছিচ্ছ ? কামীল ঐ রকম করে হাসত না ?

‘মনে’-র চোখে একটা স্বপ্নালু ছায়া নেমে এসেছে। অস্ফুটে, যেন আপন মনে বললে, সমস্ত প্রকৃতিটাই আজ কামীলময় ! অদ্ভুত বলেছিচ্ছ কিন্তু !

অগুস্ত্ বন্ধুর হাত দুটি ধরে ধীরে ধীরে তাকে বসিয়ে দিল নিজের ওয়ার্কটুলে। ডান হাতে ধরিয়ে দিল মোটা তুলিটা। এগিয়ে দিল রঙের স্ট্রজেল। কানে কানে বললে, আকাশ-প্রান্তর-বনানী যাই আঁকিস্ না কেন, সে তো শুধু কামীল-এরই পোট্রেট ! সব কিছতেই তো সে মিশে আছে ! তাই নয় ?

‘মনে’ জবাব দিল না। উন্মাদের মতো টানতে থাকে ক্যানভাসের উপর রঙে ভেজা তুলির আঁচড়। রুদ ‘মনে’-র

তুলিতে সব সময়েই একটা ঝোড়ো হাওয়ার স্কাপামি ! আজ যেন তা সাইক্লোন হয়ে উঠল ! তুলি নয়, যেন বেহালার ছেড়ে নাইস্ সিস্ফার্নি বাজাচ্ছে ! আর আপন মনে বিড়-বিড় করে বলছে : কামীল আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে ! পাগলিটা আজ লুকোচুরি খেলছে আমার সঙ্গে ! ঠিক ধরব ওকে—পালাবে কোথায় ?

নিঃশব্দ চরণে অগুস্ত্ বিদায় হল। বন্ধুকে কোনও বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে। ও জানে, সৌজন্যের সম্পর্ক তাদের নয়। বালির চড়ায় ঠেকে গিয়েছিল নৌকাটা। ও এসেছিল মাঝ-গাঙের দিকে তাকে শুধু ঠেলে দিতে। এবার প্রাণের তাগিদে নৌকা নিজে নিজেই এগিয়ে যাবে তরতরিয়ে !

পারী ফেরার পথে অগুস্ত্ মনে মনে বলল : সুযোগ পেলে তোর একটা মূর্তি গড়ব ‘মনে’ : অরফিউস্।



পোতি অগুস্ত্ এখন ওর সহকারী। স্টুডিওর দেখ্‌ভাল করে। কার কাছে শুনছে মনে নেই, অগুস্ত্ টের পেয়েছিল আজ বছর-খানেক ধরে পোতি অগুস্ত্ স্কুলে যাবার নাম করে আড্ডা মেরে বেড়ায়। তাই এই শাস্তি।

একদিন পোতি অগুস্ত্ এসে বললে, মেংর, এক ভদ্রমহিলা আপনার খোঁজ করছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসব ?

—না তো কি আমি স্টুডিও ছেড়ে যাব তাঁর সঙ্গে মাঝ-সড়কে আলাপ করতে ?

পোতি অগুস্ত্ বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। একটু পরে স্টুডিওতে এলেন একজন ঘরানা ঘরের সুন্দরী মহিলা। তাঁকে দেখেই চমকে ওঠে অগুস্ত্। একেই সে দেখেছিল শার্পেতিয়ের পার্টিতে। বললে, আপনাকেই কি এ বছরের প্রথম দিনে দেখেছি মস্যুয়ে শার্পেতিয়ের পার্টিতে ?

—না !

—না ? কিন্তু আমি তো সচরাচর এসব বিষয়ে ভুল করি না !

—সচরাচর করেন না। আমি বোধকরি এক ব্যতিক্রম। কারণ আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল—শার্পেতিয়ের পার্টিতেই, কিন্তু গত বছর !

—গত বছর ? ও হ্যাঁ ! গত বছরের শেষ সম্ভাষণটা ছিল আপনার ! কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেছিলেন

আপনি ?

—সে অনেক কথা। সুযোগ মতো বলব। আপাতত আমার পরিচয়টা দিই। আমার নাম মাদমোয়াজেল মাদেলিন বুফে—

—মাদমোয়াজেল ! কিন্তু আপনার হাতে সোঁদিন এন্গেজমেন্ট রিং দেখেছিলাম মনে হচ্ছে —

মেয়েটি ইক্‌ডি-মিক্‌ডি খেলার ভঙ্গিতে টেবিলে দশটা আঙুল বিছিয়ে দিয়ে বললে, সচরাচর আর কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনি ভুল করেন না ?

মেয়েটির কোনও হাতে আঙুটি নেই। কিন্তু কানে দুলজোড়া আছে !

মাদেলিন বলে, আপনার কাছে এসেছি একটা প্রস্তাব নিয়ে। আপনি কি আমার একটা হেডস্টাডি বানাতে রাজি আছেন ? মার্বেলে ? রাজি থাকলে কতদিন লাগবে এবং আমাকে কী দিতে হবে ?

অগুস্ত্ জবাবে বললে, হীরের অংটিটা কি খোয়া গেছে ?

—না। খুলে রেখেছি। ঐ সব পার্টিতে যখন যাই, তখন রক্ষা-কবচ হিসাবে অংটিটা পরে যাই। তাতে ক্রমাগত অবাঞ্জনীয় পাণিপ্ৰার্থীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের বিড়ম্বনা এড়ানো যায় !

—তাহলে আজ যে বড় সেই রক্ষা-কবচটা ধারণ করে আসেননি ?

—আপনি কি ক্রমাগতই আজ-বাজে কথা বলবেন ? বিজনেস করেন কি করে ?

—অন্তত আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন ! আপনার মুক্তোর দুলজোড়া তাহলে খুঁজে পেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত ?

—মেয়েদের গহনার দিকে তো বেশ নজর আপনার ? জাঁ ভাল্‌জাঁর মতো হাতদোষ আছে নাকি ? দুলজোড়া আবার হারালো কবে ?

—এই বৎসরের আগমনী মুহুর্তে !

—কে বললে ?

—আমি নিজে ! ঠিক মাঝরাতে যখন বাতি নিবে যায়, তখন আপনার বাঁ কানে মুক্তোর দুল্‌টা তো ছিল না !

খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে মাদেলিন। বলে, তার অনুসিদ্ধান্ত মসুয়ে অগুস্ত্ রোদ্যা অঙ্ককারের সুযোগে যে মেয়েটিকে চুমু খেয়েছিলেন তার কানে দুল ছিল না !

—আপনি নিজে নয় ? হতেই পারে না ! আলো জ্বলে ওঠার পর আমার দ্বিসীমানায় কোনও মেয়ে ছিল না !

—আমি ছিলাম ?

—না। আপনিও ছিলেন না অবশ্য ! কিন্তু কেন ?

—মসুয়ে রোদ্যা ! বিশ্বাস করুন, আমি সেই সোঁভাগ্যবতী নই ! কারণ সেই ঘনাক্ষকার মুহুর্তটিতে আমি যে বৃদ্ধ ‘স্যাটীর’ (satyr)-এর বাহুবন্ধনে পিষ্ট হচ্ছিলাম তিনি এক ‘ল্যো মিজারেব্ল্’ !

—সত্যি বলছেন ?

—মা মেরীর দিবিয় !

—আপনিই তাহলে সেই সোঁভাগ্যবতী, যিনি ডেমি-গড-এর চুম্বনধন্যা ?

—এবারও ভুল হল আপনার। বুড়ো ভাম চেষ্টার তুটি করেনি। কিন্তু পারেনি। আমার কানে কানে বুড়োটা বলেছিল : ‘ও গো সুন্দরি ! আন্মোল্ মোতি তোমার দাম !’ আমি তৎক্ষণাৎ কবির কানে কানে পাদপূরণ করেছিলাম : ‘কি গো কোয়্যাসিমোডো অব নহ্‌দাম্ ?’ তারপরেই পরস্পরের ‘দাম’ নিয়ে একটা বিশিষ্ট হুটোপুটি ! টানাহেঁচড়ায় আমার ব্লাউসটা যায় ছিঁড়ে, আর বুড়োর কোটের দু’তিনটে বোতাম হয় নিশ্চিহ্ন ফলে আলো। তলে ওঠার আগেই দুজনকে পালিয়ে যেতে হয় !

—একত্রে ?

—আজ্ঞে না মশাই ! পৃথক পৃথক ! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাবটা মূলতুবি আছে। মার্বেল হেডস্টাডিটা—

—হ্যাঁ, আমি আপনার হেডস্টাডি বানাতে স্বীকৃত। মার্বেলেই। কতদিন লাগবে তা এখনই বলা শক্ত। আপনাকে খুশি করতে মাসখানেক, আমাকে খুশি করতে মাস ছয়েক। আর দাম ? মার্বেলের মূল্য ছাড়া আমার পারিশ্রমিকটা নির্ভর করবে অনেক কিছুর উপর।

—যথা ?

—যথা, খদ্দের কতটা খুশি হল মূর্তিটা পেয়ে, এবং...

—এবং ?

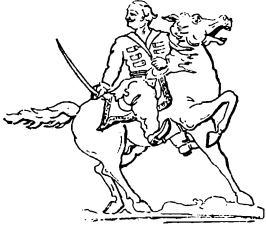
—এবং শিল্পী কতটা খুশি হল আন্মোল মোতিটাকে মডেল হিসাবে পেয়ে।

খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠল আবার। বললে, কবে থেকে কাজ শুরু হবে, মেংর ?

—‘মেংর’ সম্বোধন করলে ছয়মাস পরে। ‘অগুস্ত্’ বলে ডাকলে কাল থেকে !

আবার হাসি। অগুস্তের হাতটা টেনে নিয়ে বললে, বিজনেস তুমি ভালই বোঝ অগুস্ত। কাল থেকেই আসব আমি। কেমন ?

—এস। সকাল দশটায়।



একদিন কবি ম্যালার্মে এসে হাজির। অগুস্ত বলে, নরকের দর্শনার্থীর ভীড় এভাবে বাড়তে থাকলে স্বর্গাধীপ যে চটে যাবেন, কবি :

—আমি তোমার সাহায্য ছাড়াই

নরকের দ্বারে পৌঁছাতে পারব। সে জন্য আসিনি। তোমার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে। শোন, শাপেতিয়ের পার্টিতে তুমি কি ব্যুশেকে বলেছিলে : ‘য্যুগোর মাথাটা আমার চাই !’? অগুস্ত স্তম্ভিত। বলে, কোন অর্বাচীন বুঝি তাই শুনে রটিয়েছে আমি য্যুগোকে খুন করতে চাই ? কে সে ? ব্যুশে এমন কথা বলবে না। কারণ সে জানে, আমি কী মীন করেছিলাম।

—হ্যাঁ, ব্যুশে জানে, আমিও জানি, কিন্তু ইচ্ছেটা কি তোমার আজও আছে ? য্যুগোর একটা হেডস্টাড তৈরী করার ? য্যুগো সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যা জেনেছ তারপর ?

—য্যুগো দেবতাও নয়, দানবও নয়। তবে তার মুখে প্রতিভার স্বাক্ষর আছে, একথা স্বীকার করব। যে কোন ভাস্কর ধন্য হয়ে যাবে তার একটা হেডস্টাড বানাবার সুযোগ পেলে।

—সেজন্যই এসেছি আমি। একজন য্যুগোর একটা হেডস্টাড বানাতে চায়। তোমাকে দিয়ে। ব্যুশের কাছে শুনে যে, তুমি ইন্টারেস্টেড।

—কে সে ? য্যুগো নিজে নয় ?

—না। আচ্ছা, তুমি ‘জুলিয়েৎ দ্রোলে’ নামটা শুনেছ ?

—না শোনার কারণ নেই। সবাই জানে, বুড়ি দ্রোলে এককালে য্যুগোর রক্ষিতা ছিল—এখন আখের ছিবড়ে। কেন ?

ম্যালার্মে একটু চুপ করে থেকে বলে, একটা কথা বলি অগুস্ত, কিছু মনে কর না। এখানেই ভাস্করের সঙ্গে কবির পার্থক্য। তুমি যা বলেছ, তা সত্য—মার্বেলের মতো নিরেট সত্য, রোঞ্জের মতো কঠোর সত্য। কিন্তু মাদমোয়াজেল দ্রোলের প্রসঙ্গে ঐ কথাকাটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারব না আমি।

—কেন ?

—মাদমোয়াজেল দ্রোলে এক অসামান্য মহিলা। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁর মতো সুন্দরী পারীতে দুটি ছিল না ; থাকলে তারা তাঁর মতো বিদুষী ছিল না, কবি ছিল না। রূপ ও অভিজাত্য—শিক্ষা ও সংস্কৃতি, কোনদিকেই তাঁর কোনও খামতি ছিল না। যুরোপের অনেক ঘরানা ঘরের পাত্র—আল, ডিউক এবং হ্যাঁ, একজন কিং পর্যন্ত তাঁর পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, তা জান ? কেন ? না, মেয়েটি তার সমস্ত জীবন-যৌবন বিলিয়ে দিতে চেয়েছিল ফ্রান্সের এক বিশ্রুতকীর্তি প্রতিভার পায়ে। ভিক্তর য্যুগোর কাছে পৃথিবীর যা ঋণ তার অন্তত চার-আনা অংশের দাবীদার এই মহিলা ! যার বিনিময়ে সে সংসার পেল না, সন্তান পেল না, ‘মাদাম য্যুগো’ পরিচয়টা পর্যন্ত পেল না। আজ তিনি সত্তর বছরের বৃদ্ধা। সেই মহান মহিলার উপমান : ‘আখের ছিবড়ে’ ?

অগুস্ত ওর হাত দুটি টেনে নিয়ে বলে, আমার অনায়াস হয়েছে, মাপ কর কবি !

ম্যালার্মের কানে সেকথা যায় না। একইভাবে সে বলতে থাকে, সত্তর বছরের বৃদ্ধার একমাত্র দুঃখ—য্যুগো সর্বক্ষণ শয্যালীনীর দৃষ্টি-সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারে না। য্যুগো এখনও নিত্য-নতুন অভিসারে মাতে - সারাজীবনই সেভাবে কেটেছে তার। দ্রোলে জানে, আপত্তি করেনি কখনও ; বলে—এটাই তো স্বাভাবিক। য্যুগোর পৌরুষ অম্লিন, সে কবি ! তবু দিনান্তে য্যুগো একবার তার জীবনসঙ্গিনীর শয্যাপার্শ্বে আজও হাজিরা দেয়। প্রতিদিন সে নিয়ে আসে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ। নিজের লেখা প্রেমের কবিতা বৃদ্ধাকে পড়ে শোনায়ে—হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে সে কবিতা দ্রোলে শুনেছে পাণ্ডুলিপি অবস্থায়। বুড়ি চায়, তুমি তার একটা মূর্তি গড়ে দাও। যাতে য্যুগো চলে গেলে প্রতিদিন সেই মূর্তিটিকে রাখা যাবে তার দৃষ্টির সম্মুখে। কিন্তু মূর্তিটা তোমাকে গড়তে হবে গোপনে।

—গোপনে ? মানে ?

—হ্যাঁ। বুড়ির পালঙ্কটা যেখানে পাতা আছে তার পিছনেই আছে একটা জানলা। ‘ভেনিসিয়ান ল্যুভার শাটার’—খড়খড়ি পাল্লা। তুমি ও-দিক থেকে বুড়ো-বুড়িকে দেখতে পাবে। য্যুগো তোমাকে দেখতে পাবে না। বুড়ির গভর্নেস সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি ঢুকবে-বেরুবে পিছনের দ্বার দিয়ে।

ۛۛۛ

পারবে। কিন্তু আমার সার্লিসটারকে নির্দেশ দেওয়া থাকবে—আমরা দুজনেই যীসাস্-এর করুণালাভ করলে মূর্তিটি হবে ফ্রান্সের সম্পত্তি। কর্পোরেশন সেটাকে পারীর কোনও চৌমাথায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

স্টুডিওর কথা সচরাচর সে বাড়িতে আলোচনা করে না। এবার কিন্তু তার ব্যতিক্রম হল। মেরী-রোজকে সবিস্তারে জানালো মাদাম দ্রোলের কথা। মেরী-রোজ গোপনীয়তা বজায় রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। সে অবাধ হয়ে বলে, আশ্চর্য! অমন সুন্দরী, অমন শিক্ষিতা মহিলাকে য়্যাগো সারাজীবনভর শুধু প্রত্যাখ্যান করে গেলেন? বিয়ে করলেন না।

অগুস্ত্ বলে, তুমি ধরে নিচ্ছ কেন যে, মাদাম দ্রোলে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন?

মেরী রোজ হাসল। সে কি নিজেই কোনদিন পীড়াপীড়ি করেছে?

—হাসলে যে?

—সেটাই কি স্বাভাবিক নয়? মেয়েমানুষের পক্ষে? মুখে না বললেও তিনি কি মনে মনে সেটাই চাইছিলেন না।

—না। জুলিয়েৎ দ্রোলে গাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে নন। প্রেম যে বিবাহবন্ধনের চেয়ে অনেক বড়, এটুকু উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল। পাইরীনও কোনদিন প্র্যাক্সিটেলীজ-কে পীড়াপীড়ি করেনি—

—পাইরীন কে?

—সে অনেক কথা। পরে একদিন বলব। খাবার কী আছে দাও। ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে।

মেরী রোজ তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। দ্রোলে, পাইরীন পড়ে থাকে অনাদৃত। সে খাবার গরম করতে ছোটো।



এর পর অগুস্তের পরিচিত দুনিয়ায় নেমে এল একঝাঁক মৃত্যু। ১৮৮২ সালের একটি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন গায়েত। বয়সে তিনি ছিলেন অগুস্তের চেয়ে সামান্য বড়।

রাজকীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হল গায়েতাকে। কিছুদিন

পরেই প্রয়াত হলেন ইম্প্রেশনিস্ট শৈলীর আদিগুরু এদুয়ার্দ মানে। একান্ন বছর বয়সে। তাঁকে সবে সরকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল—‘লীজন অব অনার’। ভোগে এল না। মানের শোকযাত্রায় জনসমাগম হয়েছিল অম্প। তাঁর খ্যাতি বহুলাংশেই মরণোত্তর। তবু ধাঁরা শোকযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন তাঁরা আমাদের অপরিচিত নন: দেগা, ফাঁতি, মনে, পিসেরো, রেনোয়ার্, ম্যালার্মে, বুশো, জোলা, সেজান এবং লালিতকলা মন্ত্রী প্রুস্ত।

অগুস্ত্-এর সঙ্গে ‘মানে’-র খুব কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যেমন ছিল ‘মনে’, ম্যালার্মে, বুশো বা ফাঁতির সঙ্গে। তবু মহান শিপ্পী হিসাবে মানে-কে সে শ্রদ্ধা করত। যোগ দিল শোকযাত্রায়।

এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রয়াত হলেন জুলিয়েৎ দ্রোলে। সংবাদ-পত্রের এককোণে ঠাঁই পেয়েছে খবরটা! সবাই আন্ডাজ করে, কী নিদারুণ আঘাত পেয়েছেন বৃদ্ধ য়্যাগো। কিন্তু কেউ জানল না—কী মর্মান্তিক আঘাত পেল অগুস্ত্ রোদ্যঁ। শুধু আর্থিক ক্ষতির জন্য নয়। মূর্তিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। দিনের পর দিন অগুস্ত্ গোপনে তৈরী করেছে য়্যাগোর আবক্ষ মূর্তি। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখে দেখে। মডেলের মুখে দু-হাতের দশটা আঙুল ছোঁয়াতে পারেনি। তা হোক, তবু য়্যাগোকে ধরেছে। প্রিয়তমার শয্যাপার্শ্বে সমবেদনায় আনত-নয়ন য়্যাগো!

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঘড়ি ধরে য়্যাগো আসতেন। তার মিনিট দশেক আগে পাশের ঘরে অন্ধকার মাচাঙে বন্দুক হাতে উঠে বসত অগুস্ত্। য়্যাগো প্রতিদিনই প্রবেশ করতেন একগুচ্ছ গোলাপ হাতে। দ্রোলের বালিরেখাঙ্কিত করপুটে পুষ্পগুচ্ছটি ধরিয়ে দিয়ে আনত হয়ে ওর মুখ চুশন করতেন। তারপর চেয়ারটা শয্যার কাছে টেনে এনে বলতেন, আজ কী পড়ব বল?

—Les Feuilles d'automne!

—তুমি কি কোনদিনই বদলাবে না মন্-চেরি? পঞ্চাশ বছর আগেকার ঐ সব বস্ত্রপাচা পুরোনো কবিতা...

—বস্ত্রপাচা? পুরোনো? বেশ চাই না কিছু শুনতে! যাও! বিদেয় হও! এক্ষণি। এই মুহূর্তে!

বুড়ি ও-পাশ ফিরে শোয়। বুড়ো তাকে কত আদর করে, মিঠে মিঠে বুলি শুনিয়ে রাগ ভাঙায়—পাশ ফেরায় কাঁধ

ধরে। বলে, বেশ বাপু বেশ, যা শুনতে চাও তাই পড়ে শোনানিচ্ছ।

বুড়ির শয্যাসংলগ্ন গা-আলমারিতে থরে-থরে য়্যগোর বই। প্রথম সংস্করণ থেকে শেষ সংস্করণ। বুড়ো বইটা খুঁজে বার করে আবার এসে বসে। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে স্বরচিত কবিতা। কয়েক মিনিট পরে দুজনেই তন্ময় হয়ে যায়।

পাশের ঘরে মাচাঙে-বসা শিকারী তখন মনে মনে বলে : ফায়ার !

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর য়্যগো যখন ফিরে যেতেন তখন অগুস্ত্কে এ ঘরে উঠে আসতে হত। ধরাধরি করে অসমাপ্ত মূর্তিটাকেও নিয়ে আসা হত শয্যালীন বৃদ্ধার দৃষ্টি-সম্মুখে। এক-মাথা বৃপোগলানো চুল, কোটরগত মরকত মণির মতো চোখের মণি, বলিরেখাঙ্কিত সর্বাঙ্গবয়, তবু ঐ মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখে ফুটে উঠত অদ্ভুত একটা হাসি—কিছুটা তৃপ্তির, কিছুটা প্রেমের, কিছুটা আবেগের আর অনেকখানিই কুলের আচার চুরি করা কিশোরীর দৃষ্টিমি। অগুস্তের সঙ্গে এতদিনে যেন একটা নারী-দাঁদিমা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বলতেন, ও বেচারি স্বপ্নেও ভাবতে পারছে না, এ বয়সে আমি লুকিয়ে কারও সঙ্গে প্রেম করছি।



চিত্র—39 : ভিক্টর য়্যগো

—প্রেম করছেন, মাদাম ?

—করছি না ? তোমার ঐ অসমাপ্ত মূর্তিটার সঙ্গে ? এই বুড়ি বয়সে ?

অসমবয়সের দুই বন্ধু খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতেন, মেংর ! আর কতদিন ?

—এই হয়ে এল। আর একটা মাস।

সেই মাসটা আর শেষ হল না। তার আগেই নেমে এল যবনিকা।

খন্দের চলে গেছেন, তবু শেষ করল মূর্তিটা। শুধু তাই নয়, য়্যগোর আরও পাঁচ-দশটা মূর্তি গড়ল একান্তে। আড়াল থেকে যে-সব অসংখ্য স্কেচ করেছিল সেগুলি অবলম্বন করে। তারপর ওর মনে হল, ভিক্টর য়্যগোর স্বরূপটা তখনই বিকশিত হবে যখন য়্যগোকে রূপায়িত করা যাবে : নুড়ে ! তৃতীয় একটি স্টুডিও ভাড়া করেছিল ইতিমধ্যে, আইল সেন্ট লুই-য়ে, সম্পূর্ণ গোপনে। কেউ তার সন্ধান জানে না। সপ্তাহে একদিন সে ওখানে গিয়ে গড়ত নিরাবরণ য়্যগো।

অগুস্ত্-এর খ্যাতি ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ওর কাছে কাজ শিখতে চায়। সে-আমলের শিষ্যদের মধ্যে তিনটি নাম উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর হিসাবে এর মধ্যে সবচেয়ে নাম করেছেন জুলে দেবয়। তাঁকে বলা যায় রোদ্যার অন্যতম উত্তরসূরী। অপর দুই শিষ্য শিম্পী হিসাবে নয়, অন্য কারণে পরিচিত। প্রথমত, রবার্ট ব্রাউনিঙ জুনিয়ার—বিখ্যাত কবি রবার্ট ও এলিজাবেথ ব্রাউনিঙ-এর পুত্র। দ্বিতীয়ত, বেডেন পাওয়েল—যিনি 'বয়েজ-স্কাউট'-এর জনক। পোতি অগুস্ত্ তখন সতের-আঠারো, ভাস্করের শিক্ষানবিশী। 1883 সালে ছাব্বিশে অক্টোবর প্রয়াত হলেন পাপা রোদ্য। একাশি বছর বয়সে।

মৃত্যুকালে সবাই ছিল তাঁর শয্যা ঘিরে—অগুস্ত্, পোতি অগুস্ত্, মেরী রোজ, থেরেস্-পিস। অগুস্ত্ বৃদ্ধের হাত দুটি তুলে নিয়ে বললে, কষ্ট হচ্ছে ?

বৃদ্ধের জ্ঞান টুটনে। বললেন, হবে না ? তুই যে কথা দিলিনে—

—বললাম তো ! কথা দাঁচ্ছি—মেরী-রোজ ব্যুরের দায়-দায়িত্ব আমার। যতদিন সে বাঁচবে—

—বাজে কথা বলিস্ না অগুস্ত্ ! তুই জানিস্ আমি কী চাই ! কথা দে—বোমাকে তুই বিয়ে করবি—

থেরেস্-পিসি—তাঁরও বয়স আটাত্তর—ঝুঁকে পড়ে বলেন, আমি তো রইলাম দাদা ; চিন্তা কর না তুমি।

মেরী-রোজ অগুস্তের হাত ধরে আড়ালে টেনে নিয়ে গেল। দু-চোখের জলে সে ভাসছে। বললে, জীবনে মিছে কথা যে কখনও বলনি এমন তো নয় ! না হয় এসময় একটা মিথ্যে সান্ত্বনাই দিলে ঠকে ! তুমি তো জানই—মা মেরীর নামে

শপথ করে বসে আছি আমি—কোনদিন ও নিয়ে তোমাকে পীড়াপীড়ি করব না।

পাশের ঘরে পাপা রোদাঁ তখন থেরেস্-পিসিকে বলছে, ওদের ডেকে নিয়ে আস থেরেস্। বোঁমা বোধহয় হতভাগাটাকে বোঝাচ্ছে—এসময়ে মিথ্যে শ্রোক দিতে হয়! লাভ নেই রে থেরেস্। ও হবার নয়! ওর মা বলত, খোকনের সব ভালো, শুধু জিদ্দিবাজির জন্য ওর কিছু হবে না।

এই তার শেষ কথা।

ভিক্টর স্ল্যাগো প্রয়াত হলেন ১৪৪৫তে; জুলিয়েৎ দ্রোলের মৃত্যুর দু-বছর পরে।



লেঅনার্দো'র সঙ্গে রোদাঁ'র একটা চরিত্রগত সাদৃশ্য আছে। অপ্রাপণীয়ের শিখরচূড়ায় কম্পনাকে স্থাপিত করে অন্তর্লীন সৃজন-বারুদের স্তুপের উপর বসে আছেন শিম্পী—অর্থীর প্রদীপশিখাটির প্রত্যাশায়। নিয়োগকর্তা লেঅনার্দোকে বললেন, বড় জলাভাব, কী করা যায় বল তো? লেঅনার্দো আঁক কষতে বসলেন—আর্নো নদীকে ভিন্ন খাতে

বইয়ে দেবেন, যা-নাকি তদানীন্তন প্রযুক্তি-বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নিছক পাগলামি। নিয়োগকর্তা বললেন, শহরে মাঝে মাঝেই মহামারী লাগে, কিছু করা যায় না? লেঅ তৎক্ষণাৎ মিলান শহরের এমন এক পুনর্বিবন্যাস-পরিকম্পনা ফাঁদলেন যা খাতা-কলমে অপূর্ব কিন্তু বাস্তবে অবাস্তব। নিয়োগকর্তা বললেন, বাবার একটা মূর্তি মিলানে বসালে কেমন হয়? লেঅ তৎক্ষণাৎ মূর্তি গড়তে বসলেন তদানীন্তন পৃথিবীর বৃহত্তম অস্বারোহী মূর্তি; তাও অশ্ব চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে না, দুটি পা থাকবে শূন্যে!

অগুস্ত-ও একই জাতের পাগল। তাকে বলা হল—মাঝারি মাপের একটা তোরগদ্বার বানাতে, সে নিজেই তার মাপকে করল দ্বিগুণ, মূর্তিসংখ্যা তিনগুণ। কতারা বললেন, এ কী? তিন বছরে শেষ করার কথা ছিল যে?

শিম্পী বললে, তাই কি হয়? দেখছেন না, কী পরিকম্পনা ফেঁদেছি?

—কিন্তু এগ্রেমেন্টে যে লেখা আছে...

—সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিন। আমি যা গড়াছি তা দেখতে একদিন সারা পৃথিবী ছুটে আসবে পারীতে!

—কিন্তু আমরা তো তা চাইনি।

—অথচ আমি যে তাই চাই!

গায়েতা—ওর দরদী পৃষ্ঠপোষক গত হয়েছেন। এখন যাঁরা ফ্রান্সের শাসক তাঁরা বললেন—হয় এক বছরের ভিতর কাজ শেষ কর, নচেৎ বৎসরান্তে সুদ সমেত টাকা ফেরত দাও। অগুস্ত কর্ণপাত করল না, প্রাণপাত করল। দ্বিগুণ উৎসাহে গড়তে থাকে নূতন নূতন মূর্তি—নরকের কুস্তীপাকে যারা কাৎরাচ্ছে।

কিন্তু একাত্ত হয়ে সে কাজটাই কি করতে পারছে ছাই? ক্রমাগত আসছে নতুন নতুন অর্ডার—নূতন নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা। রিপাবলিক অব্ চিলির প্রতিনিধি এসে ওকে অনুরোধ করল, সান্তিয়াগোতে জেনারেল লিগ্-এর একটি অস্বারোহী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চান চিলি সরকার। অগুস্ত কি দায়িত্বটা নিতে পারে?

অগুস্ত লাফিয়ে ওঠে, পারি না? বল কি? এই প্রথম অস্বারোহী মূর্তি গড়ার বায়না এল যে!

উপরন্তু প্রস্তাবটা নিয়ে যে এসেছিল সেই মাদাম ভিচুনার একটা হেডস্টাডি বানিয়ে ফেলল।

ফরাসী শিম্পী বাস্তিয়ে-লেপাজ অকালে প্রয়াত হলেন, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। দান্তিলের্স-শিম্পীর জন্মস্থানের নগর-পাল চিঠি লিখলেন—‘আমাদের কবির একটি মর্মর মূর্তি তাঁর সমাধিস্থলে বসাতে চাই। আমাদের পুঁজি অম্প। কোন ভাস্করকে এ কাজের দায়িত্ব দিলে উপযুক্ত হবে যদি—’

চিঠির বাকিটা পড়া হল না। অগুস্ত জবাবে জানালো, ‘লেপাজ এক মহান শিম্পী। সে আমার বন্ধু ছিল। দরদামের প্রশ্নই নেই। আমি নিজেই দায়িত্বটা নিচ্ছি—’

পারীর কেন্দ্রস্থলে একটি পার্কে প্রতিষ্ঠিত হবে ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত নিসর্গ চিত্রকর রুদ-লোরেনের একটি মূর্তি। নগর-নিগম এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শ্রবণমাত্র অগুস্ত আগবাড়িয়ে জানালো, ‘আপনারা যদি অনুমতি করেন তবে দায়িত্বটা আমি নিজে নিতে চাই।’

এ ছাড়াও আরও তিন-চারটি হেড-স্টাডি করছে সে। বেক্, জাঁ-পল লরেন্স এবং কারিয়া-ব্লুজ। শেষোক্ত মানুষটিকে আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। একদিন সে এসে হাজির অগুস্তের স্টুডিওতে, তার নিজের একটা হেডস্টাডির প্রস্তাব নিয়ে। অগুস্ত বিস্মিত হল যতটা, অভিভূত হল তার চেয়ে

বেশি। বেলজিয়ামে যে ব্যাপারটা ঘটে গেছিল তার পর ব্ল্যুজ্‌য়ে স্বয়ং এ প্রস্তাব নিয়ে তার দরজায় আসতে পারে এটা ভাবাই যায় না। সে স্বীকৃত হল ব্ল্যুজ্‌জের একটি আবক্ষ মূর্তি বানিয়ে দিতে। আর বানালো ভাস্কর দালুর একটি হেডস্ট্যাড। সেটা বিক্রয় করা হল না। কারণ দালুও পরিবর্তে তৈরী করে দিল অগুস্তের একটি ব্রোঞ্জ হেডস্ট্যাড। হল এক্সচেঞ্জ।

বলতে ভুলেছি, মাদমোয়াজেল মাদেলিন ব্যুফের মার্বেল মূর্তিটা অগুস্ত শেষ করতে পারেনি। ব্যুফে সেটা অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে যায়। নিতান্ত মান-অভিমানের ব্যাপার।

1883; ব্যুশে একদিন ওর স্টুডিওতে এসে হাজির। বলে, আমার একটা উপকার করবে বন্ধু?

—তোমার উপকার? কী জাতের?

-- আমার পরিচিত একজন তোমার শিক্ষা-নবিশী হতে চায়। তাকে গ্রহণ কর।

—সে কী? তুমি নিজেই তো একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ ভাস্কর। দু-চারজন শিক্ষার্থীও তো কাজ শেখে তোমার স্টুডিওতে।

—সবই মানছি, কিন্তু এ মেয়েটি রাজি নয়। বলে, শিক্ষাগুরু যদি কাউকে করতেই হয়—

বাধা দিয়ে অগুস্ত বলে, কী বললে? মেয়েটি! মেয়ে ভাস্কর? অসম্ভব! সেক্রেটারি হতে চায়, মডেল হতে চায় চেষ্টা করে দেখতে পারি। মেয়েছেলে কখনও ভাস্কর হয়?

—হয়। হয়েছে। তুমি ওকে একবার অন্তত পরখ করে দেখ; আমার অনুরোধে—

—বেশ, বাপু বেশ। কাল সকাল নয়টায় তাকে নিয়ে এস। পাঁচ মিনিটের জন্য।

পরিদর্শন কামীল রুদেলকে দেখে অবাক হয়ে গেল অগুস্ত। বছর কুড়ি বয়স, ওর আধাআধি। শুধু অপূর্ব সুন্দরী নয়, তার সর্বাবয়বে একটা ব্যাক্তিত্বের ছাপ। ব্যুশে বলে রেখেছিল মেয়েটি ঘরানা ঘরের। বাপের অগাধ সম্পত্তি। উচ্চশিক্ষিতা। ভাস্করকে সে বেছে নিয়েছে নেশা ও পেশা হিসাবে। ফলে পরিবারের সঙ্গে মতান্তর, মনান্তর এবং পরিণামে বিচ্ছেদ ঘটেছে। সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ঐ বিশ বছরের মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে একলা-চলার পথে। তাকে ভাস্কর হতে হবে। অদম্য উৎসাহে কাজ শিখছে; কিছুটা ব্যুশের পরামর্শে, কিছুটা একলব্যের একক সাধনায়।

ব্যুশে পরিচয় করিয়ে দেবার পর কামীলকে প্রকাশ্যেই সাবধান

করে দিয়ে বললে, একটা কথা প্রথমেই বলে রাখছি কামীল, পরে আমাকে দোষ দিও না। আমার বন্ধু অগুস্ত স্পষ্টবক্তা, রুচিবাদী এবং মেজাজী।

কামীল অগুস্তকে ‘ব’জু’ করে ব্যুশেকে ফিরিয়ে দিল জবাব, ওঁর বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর এবং মেজাজ-এর বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আমি ওঁর কাছ থেকে ভাস্কর্য শিখতে এসেছি। ম্যানার্স নয়।

অগুস্ত একথণ্ড কাগজ আর ক্রেয়নটা বাড়িয়ে ধরে বললে, ‘ভেনাস ডি-মিলো’কে মন থেকে আঁকতে পার?

কামীল জবাব দিল না। টেনে নিল কাগজ-পেন্সিল। পাঁচ মিনিট হয়েছে কি হয়নি অগুস্ত বলে, কই দেখি?

—আমার স্কেচ এখনও শেষ হয়নি।

—জানি। ‘ভেনাস’ কোনদিন শেষ হয় না। দেখি, কতদূর ধোঁড়িয়েছ।

কাগজটা কেড়ে নিয়ে দেখতে থাকে। কামীল নিজে থেকেই বলে, ঠিক হয়নি। আসল ভেনাস এর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।

—নাকি? কিন্তু আসল ‘ভেনাস’ কোনটা মেংর?

‘মেংর’ সম্বোধনে কামীল হেসে ফেলে। শব্দটা পুর্নলিঙ্গ। অর্থ: আচার্য! বললে, যেটা ল্যুভারে আছে, একতলার ঘরে।

—আজ্ঞে না। সেটাও নকল! আসল ভেনাস থাকে এইখানে— বলে, কোথাও কিছু নেই, কামীলের দক্ষিণস্থানে মারে তর্জনীর এক খোঁচা। এবং তৎক্ষণাৎ কেমন যেন বিহবল হয়ে যায়!

কামীল হাসল। অপ্রস্তুতের হাসি নয় কিন্তু। কপালের চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিয়ে বলল, মসুয়ে রোদ্যঁয়ারও তাহলে ভুল হয়?

—ভুল?

—নয়? আসল ভেনাস তো থাকে এইখানে—

এবার সে নিজেই মারলে অগুস্তের পাজরে তর্জনীর মোক্ষম একটা খোঁচা। তারপর নিজের বুকের উপত্যকায় হাতটা রেখে বলে, আর এখানে যে থাকে সে এ্যাডর্নিস্ কিম্বা এ্যাপোলো অথবা মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড! আমাকে শিক্ষার্থী হিসাবে স্বীকার করে নিতে হলে এটাই হবে শিম্প-গুরুর শিক্ষার প্রথম পাঠ!

অগুস্ত ব্যুশের দিকে ফিরে বলে, মঞ্জুর! এ মেয়ে ভাস্কর হবে!

পরদিন থেকেই কামীল শুরু করল তার শিপ্পশিক্ষা। সকালে এসে সে যখন জানতে চাইল—কী তার কাজ, তখন অগুস্ত্ অস্বাভাবিকভাবে বললে, গোটা স্টুডিওটা প্রথমে ঝাঁট দাও।

ধনীর দুলালীও তৎক্ষণাৎ নির্বিকারচিত্তে সম্মার্জনীহস্তায় রূপান্তরিতা হল।

দৈহিক ভারী কাজ—মাটির বস্তাকে পিঠে করে ঠাইনাড়া করা পাথরের চাঁইকে ‘হেঁইয়ো জোয়ান’ অথবা মডেল-স্ট্যাণ্ডে পেরেক-ঠোকা, মোটা-মোটা লোহার-ছড় বাঁকিয়ে আর্মেচার বানানো সবই তাকে করতে হত আর পাঁচজন পুরুষ শিক্ষার্থীর সঙ্গে। অগুস্ত্ বলে, তোমাকে হাতে-ধরে কাজ শেখানোর মতো সময় আমার হবে না বাপু। আমার কাজের ধরন-ধারণ দেখ, সব কিছু লক্ষ্য কর, নিজের হাতে সেগুলো চেষ্টা করে দেখ। শুধু কখন কী গড়ছ আমাকে দেখিও।

কামীল বলে, বেশ, তাই সই।

মাসখানেক পরে একদিন অগুস্তের হঠাৎ লক্ষ্য হল—কামীল দূরে বসে কী একটা বানাচ্ছে। বারে বারে তার দিকে চোরা-চাহনি হানছে। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল—বহু-বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা। ঐ ভাবে লুকিয়ে সে একটা কাফেতে একটি মেয়ের স্কেচ এঁকেছিল। কোঁতুল হল। এগিয়ে এসে দেখে যা ভেবেছে তাই। অগুস্তকে না জানিয়ে কামীল কাদামাটিতে তার একটা হেডস্টাডি বানাচ্ছে। বললে, কী হচ্ছে ওটা? আমার মাথা না মুণ্ডু? কই দেখি? এক নজর দেখে-কি-না-দেখে বললে, কিশু হয়নি। আবার বানাও!

কামীলের সাতদিনের পরিশ্রমটা আঙুলের বজ্রটিপুনিতে থেংলে দিল।

যেন কামীলের মুণ্ডুরই কীচকবধ ‘হল! দু-চোখ বুঁজে যন্ত্রণাটা সহ্য করল মেয়েটি।

—কী হল? কষ্ট হচ্ছে? —কাটা-ঘায়ে একমুঠো নুন ছিটিয়ে দিল আবার।

কামীল হাসে। বলে, আদৌ নয়। মোপাসাঁর প্রথম পাণ্ডুলিপি না পড়েই হিঁড়ে ফেলোছিলেন ফ্লেবায়ার। বলেছিলেন, ‘আবার লেখ। প্রথম রচনায় উচ্ছাসটা বেশি হয়।’

—মোপাসাঁ! মোপাসাঁ কে?

—জোলা-ফ্লেবায়ারের উত্তরসূরী। আপনি ওঁর Bou'e de

Suif পড়েননি? অনবদ্য!

—নামই শুনিনি মোপাসাঁর। তরুণ লেখক বুঝি? ওসব ট্র্যাশ্ পড় কেন?

—যেহেতু অগুস্ত্ রোদ্যঁয়ার নাম হয়তো যখন ফ্রান্স ভুলে যাবে তখনও গ্যি দে মোপাসাঁর নাম উচ্চারিত হবে।

অগুস্ত্ ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়: কী বললে?

কামীল ওয়ার্ক-টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, প্রুশিয়া আবার যদি ফ্রান্সকে বিধ্বস্ত করে, তবে অগুস্ত্ রোদ্যঁয়ার চিহ্নমাত্র হয়তো থাকবে না; কিন্তু কাইজার-বাহিনীর ক্ষমতা নেই মোপাসাঁর কেশাগ্র স্পর্শ করার। ফ্রান্স বিধ্বস্ত হলেও জোলা-ফ্লেবায়ার-মোপাসাঁর দল সগৌরবে বেঁচে থাকবেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থালয়ে।

অগুস্ত্ মিনিটখানেক জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর গম্ভীরস্বরে বললে, কাল থেকে আর এস না তুমি।

কামীল মিষ্টি হেসে বলে, আজকের বাকি ক-ঘণ্টাই বা কেন কুসঙ্গে কষ্ট পাবেন মেংর? আমি এখনই বিদায় হই। ব্যুশের দোষ নেই—সে প্রথম দিনই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল; বলেছিল—আপনি স্পষ্টবক্তা ও রুঢ়ভাষী! ভুলটা আমারই—আমি ভেবেছিলুম তার অনুসিদ্ধান্ত—আপনি স্পষ্টপ্রোতাও এবং সত্যভাষণ সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন! আচ্ছা চলি।

—বস। জ্যাঠামো কর না। কী যেন নাম? হ্যাঁ, মোপাসাঁর Boule de Suif টা দিও তো আমাকে? কবে বেরিয়েছে?

—আপনার ‘রোজঘুগ’-এর সঙ্গে একই বছর, আশী সালে! মেংর! কিছু মনে করবেন না—এখানেই ভাস্করের সঙ্গে কথাশিপ্পীর প্রভেদ। আমি বাজি রাখতে রাজি আছি—মোপাসাঁ আপনার নাম জানেন। কেউ রোদ্যঁয়া-প্রদর্শনী দেখতে গেছে শুনলে মোপাসাঁ কিছুতেই বলবেন না: ও সব ট্র্যাশ্ দেখতে যাও কেন?

অগুস্ত্ স্থির দৃষ্টিতে দেখল মেয়েটিকে। বেশ অনেকক্ষণ। তারপর বলল, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলবে কামীল? কে কার কাছে শিক্ষানবিশী করতে এসেছে? গুরু কে? শিষ্যই বা কে?

কামীল লজ্জা পেল। বলল, মেংর! কিছুদিন আগে ম্যাক্সমুলারের একটি গ্রন্থ পড়ছিলাম। তাতে উনি লিখেছেন, প্রাচ্যে একটা মন্ত্র আছে—যে মন্ত্র গুরুশিষ্য উভয়েই উচ্চারণ

করেন : করুণাময় ! আমাদের দুজনকেই সার্থক করে তোল !
আমরা গুরু-শিষ্য যেন পরস্পরকে অসূয়া না করি ! দুজনেই
যেন হাত ধরাধরি করে পরমপ্রাপ্তিতে বিলীন হতে পারি !



হঠাৎ ঘটনাচক্রে অগুস্তের সামনে এসে উপস্থিত হল
বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ ! বার্গাস্ অব ক্যালো !
ক্যালো-নাগরিকবৃন্দ !

শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের এক খণ্ডকাহিনী। চতুর্দশ
শতাব্দীর ঘটনা। ইংলণ্ডের তৃতীয় এডওয়ার্ড-এর
নৌবাহিনী ক্যালো-নগরীকে বিচ্ছিন্ন করেছে

ইংলিশ-চ্যানেল থেকে। স্থলবাহিনী অবরোধ করে রেখেছে
বার্ষিক তিন দিক। যে-কোনও একদিন দিয়ে ফরাসী বাহিনী
নগরে সাহায্য পাঠাতে সক্ষম হবে এই আশায় ক্যালো
আত্মসমর্পণ করেনি। দুর্ভেদ্য নগর-প্রাচীরের বাধাও অতিক্রম
করতে পারেনি ব্রিটিশ বাহিনী। দীর্ঘ এক বৎসর ক্যালোর
নাগরিকবৃন্দ যুদ্ধ করেছে—ইংরাজ সেনাদলের বিরুদ্ধে নয়,
অনাহার মৃত্যুর বিরুদ্ধে। অবশেষে ওরা একদিন নিশ্চিত
বুঝতে পারল ফরাসী সেনাদল কোন দিক দিয়েই ওদের কোন
সাহায্য পাঠাতে পারবে না। নগরীর শেষ শস্যদানাটি
নিঃশেষিত হলে তারা বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠালো
ব্রিটিশ জেনারেলের কাছে।

অবরোধকারী সেনাপতি জবাবে জানালেন, দুটি বিকল্প প্রস্তাব
আছে। তোমরাই বেছে নাও। এক : আমার বিজয়-বাহিনী
ক্যালো প্রবেশ করে আবালবৃদ্ধবনিতাকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে
দেবে। মৃতদেহগুলি ইংলিশ চ্যানেলে ফেলে দেবার পর
জনহীন ক্যালো নগরীতে আমরা নিয়ে আসব ব্রিটিশ নাগরিক।
ক্যালো হয়ে যাবে এক ব্রিটিশ উপনিবেশ। দুই : নগরের
বাছা বাছা ছয়জন নাগরিক গোটা শহরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত
করতে স্বীকৃত হবেন। নগ্নপদে, নিরস্ত্র অবস্থায় তাঁদের
পদরজে আসতে হবে বিজয়ীর শিবিরে। তাঁদের গলায়
পরানো থাকবে স্বহস্তে-লাগানো ফাঁসির দড়ি। প্রবেশ-
তোরণের সম্মুখেই আমরা ফাঁসির মণ্ডটা নির্মাণ করে রাখব।
যাতে ক্যালোবাসীর দেখতে কোনও অসুবিধা না হয়।

ক্যালো দ্বিতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। ক্যালো নগরীর সবচেয়ে
ধনবান নাগরিক ওস্তাস্ দে সেক্ত-পীয়র সর্বাগ্রে স্বীকৃত হলেন।
সম্মান ও প্রতিপত্তির বিচারে আরও পাঁচজন স্বনির্বাচনে হলেন

তাঁর পাঁচজন সহযাত্রী পীয়ের দে উইসাস্ত্, আঁদ্রো দ'আস্ত্রে,
জাকুয়ে দে উইসাঁৎ, জাঁ দ'এয়্যার এবং জাঁ দে ফীনে। এতদিন
যাঁরা ছিলেন নগরের সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিক তাঁরা রওনা
হলেন পদযাত্রায়—নগ্নপদে, সাধারণ নাগরিকের বেশে, হাতে
শহরের প্রধান প্রবেশ-তোরণের কুণ্ডিকা এবং গলায় ফাঁসের
দড়ি—স্বহস্তে পরানো। তাঁদের পরিবারবর্গও নগ্নপদে
প্রিয়জনদের পৌঁছে দিয়ে গেল নগর প্রান্তের মৃত্যুমণ্ড পর্যন্ত।
তাদের চোখে জল ছিল, না আগুন ছিল ইতিহাস সে-কথা
লিখে রাখতে ভুলেছে।

1347 সালের ঐ অবিষ্মরণীয় ঘটনাটি শাস্বত করে রাখার
প্রয়াসে ক্যালোর নগরপাল দেশ-বিদেশের যাবতীয় প্রথম
শ্রেণীর ভাস্করের কাছে প্রতিযোগিতা-মূলক 'টেওয়ার' আহ্বান
করলেন। ছয়জন শহীদের দলপতি সেক্ত-পীয়রের একটি
দণ্ডায়মান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করা হবে ক্যালোর সমুদ্রতীরে। বুশে
আপত্তি করেছিল, কামীলও বারগ করেছিল, প্রবল প্রতিবাদ
জানিয়েছিল মেরী-রোজ—হাতে যা কাজ আছে তাই পর্যাপ্ত।
আবার বোঝা বাড়ানো কেন? কারও কথায় কান দিল না
শিম্পী—যার মা বলত 'জির্জান্দবাজির জন্যই খোকনের কিছু
হবে না'। দাঁখল করল তার টেওয়ার।

সেটাই গৃহীত হল। অতএব বোঝার উপর শাক-আঁটির
জগদ্বন্দ্বল পাহাড় !

আঠাশে জানুয়ারী 1885 তারিখে সেই হল কণ্ট্রাক্টে।

মজা এই, যদিও তাকে বলা হয়েছিল শুধুমাত্র 'দে সেক্ত-পীয়র'-
এর একক দণ্ডায়মান মূর্তি বানাতে, অগুস্ত দাঁখল করল ছয়-
ছয়জনের গ্রুপ মডেল - নমুনা হিসাবে। ক্যালো নগরপাল
প্রতিবাদ জানালেন : এ কী ! ছয়জন নাগরিক তো আমরা
চাইনি ?

অগুস্ত বললে, না, না, আপনারা কেন চাইবেন ? চেয়েছিল
ব্রিটিশ সেনাপতি !

—কী আশ্চর্য ! আমরা তো চেয়েছি ছয়জনের প্রতীক হিসাবে
শুধু দলপতির একক মূর্তি।

—সেটা সত্যি আশ্চর্য ! বার্ষিক পাঁচজন প্রাণ দিতে পারল,
আর আপনি তাদের মান দিতে পারবেন না ?

—কিন্তু তাহলে আমাদের বাজেটে যে ছয়গুণ টান পড়বে ?

—পড়বে না। শুধু ঢালাই খরচ কিছু বৃদ্ধি পাবে। চুক্তিনামা
অনুসারে একটি মূর্তি নির্মাণের মজুরিই আপনি মোটাবেন !

এই হলেন অগুস্ত্ রেনে রোদঁয়া !

মেরী-রোজ বলে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে অগুস্ত্ ! একটা মূর্তির মজুরি নিয়ে ছয়টা মূর্তি গড়বে ? কী জন্য ? দেশপ্রেম ? —না, শুধুমাত্র দেশপ্রেম নয়। তার চেয়েও বড় কিছু একটা। —আর কী ? ক্যালের হতভাগ্য মানুষজনদের বাঁচাতে ছয়-ছয়জন শহীদ আত্মবলি দিলেন—এটাই তো শিল্পের শেষকথা ?

—না, রোজ, তা নয়। গল্পের শেষতর এবং শেষতম কথা দুটি তুমি জান না ! শোন বলি। ঐ ছয়জনের শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয়নি, তা জান ? ফাঁসির মধ্যে ছয়জন শহীদ উঠে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের গলায় স্বহস্তে পরানো ফাঁসের দড়ি। কাতারে কাতারে ব্রিটিশ সৈনিক, তাদের সামনে পুরোভাগে বিজয়ী সেনাপতি। আর নগর-প্রাচীরের উপর সার দিয়ে ভীড় করেছে ক্যালের নগরবাসী। এমন সময় এসে উপস্থিত হল এক অস্বাভাবিক সংবাদবহ। সেনাপতিকে স্যাঁলুট করে সম্মানে দাখিল করল স্বয়ং ইংলওয়ের সীলমোহরাঙ্কিত লেফাফা।

ইংলওয়ের তৃতীয় এডওয়ার্ড সেনাপতিকে আদেশ দিয়েছেন— ছয়জন ক্যালের নাগরিককে সম্মানে মুক্তি দিতে।

—সে কি ! কেন ?

—সেনাপতিও তাই ভাবছিল। এমন অদ্ভুত আদেশের কী হতে হতে পারে ? বৃদ্ধ সমর-নায়ক যুদ্ধটাকেই জীবনের পরমার্থ হিসাবে জানে, জানে না ‘শান্তি’ তার চেয়েও বড়। দীর্ঘ এক বৎসর ফরাসী বাহিনীর দৃষ্টিতে সেনাপতিরা ব্রিটিশ বাহিনীর ব্যুহ ভেদ করতে পারেনি ; কিন্তু সেই অসাধাই সাধন করেছিলেন এক অবলা তরুণী।

—তরুণী ! মানে ?

—ইংলওয়ের রানী ছিলেন ফরাসী। ‘ক্যালের’ তাঁর দ্বাতুলালয়। ফলে ফরাসী কামান যেখানে ব্যর্থ হল সেখানে সার্থক হলেন ফরাসী কামিনী ! ইংলওয়ের প্রেমের মর্যাদা মিটিয়ে দিয়েছিলেন রানীর চোখের জল মোছাতে। এ ভাস্কর্যের নেপথ্যে শুধু ফ্রান্সের বীরত্ব আর ইংলওয়ের মহত্বটুকুই নয়—আছে বিশ্বনিয়ন্ত্রার শ্রেষ্ঠ কীর্তির স্বাক্ষর : প্রেমের জয়গান !

গ্যুগোর মৃত্যুর পর অগুস্ত্ গ্যুগোর মূর্তিটা উপস্থাপিত করল তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছে—গ্যুগোর উইল অনুযায়ী যাঁরা

তাঁর গ্রন্থসত্ত্ব ভোগ করবে। তারা গ্যুগোর সমাধির উপর একটি



মূর্তি বসাতে চায়, এ কথা শুনে। কিন্তু তারা রাজি হল না। অগুস্তের গড়া মূর্তিটি ভাল কি খারাপ এ প্রশ্ন তারা তুললই না। বুড়োকর্তাকে না জানিয়ে চুরি করে যে মূর্তি গড়া হয়েছে সেটাকে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। তারা ভাস্কর দালুকে বলল

গ্যুগোর একটি মূর্তি বানাতে, ফটো দেখে দেখে।

অগুস্ত্ মর্মাহত হল।

কামীল বলল, মেৎর ! আপনি দুঃখ করবেন না। একদিন না একদিন এ শিল্পের দাম দুনিয়াকে দিতেই হবে। একজন প্রাচ্য মহাকাবি বলেছেন : কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুল— অগুস্ত্ ধমকে ওঠে : সব কথায় পাণ্ডিত্য ফলাও কেন বলত ?

কামীল সামলে নেয় নিজেকে। বলে, আমি দুর্গখত।

কথা হিচ্ছিল অগুস্তের স্টুডিওতে। আর সবাই কাজ ছুটি করে চলে গেছে। ওরা দুজনেই শুধু কাজ করেছে নির্বিবলিতে। অগুস্ত্ বলে, আমার গ্যুগো তোমার কেমন লেগেছে সত্যি করে বলত ?

কামীল অভিমানভরে বলে, কী দরকার ! হয়তো পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে ফেলব আবার।

—রাগটুকু তো ষোল আনা। তুমি গ্যুগোকে দেখেছ ?

—দেখোছি !

—গ্যুগো পড়েছ ?

—আদ্যন্ত। কেন ?

—গ্যেটের সঙ্গে গ্যুগোর কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছ তুমি ?

—গ্যুগোও গ্যেটের মতো নানান জাতের সাহিত্য রচনা করেছেন ; কিন্তু মহাকাব্য—

না, না, আমি ওঁদের সাহিত্য কীর্তির কথা বলছি না। বলছি জীবনযাত্রার কথা। দুজনেই লেডী-কীলার ! গ্যেটের জীবনে ফ্রীডেরিকে, লটে, মিনা, মারিয়ানে, শ্রীমতী ফন স্টাইন এবং বৃদ্ধ বয়সে এসেছিলেন উল্লরিকে। তেমন গ্যুগোর জীবনেও এসেছে নিত্য নতুন নায়িকা। দুজনের ‘ভির্ভারলিটি’ই বিস্ময়কর। ইংরাজ কবি লর্ড বায়রনের মতো।

কামীল হেসে বলে, আমি ভেবেছিলাম মেৎর পড়াশুনা করার খুব বেশি সময় পান না—

—ঠিকই ভেবেছিলে। যা-কিছু পড়েছি বিশ বছর বয়সের আগে। তারপর আমার চোখ খারাপও হল, আর মূর্তি নিয়ে মেতে উঠলাম। ইদানিং আমি দৈনিক খবরের কাগজও পড়ি না। আজকাল কে-কী লিখেছে কিছুই খবর রাখি না। কিন্তু আমি যে প্রশ্নটা করেছি তুমি তো তার জবাব দিলে না ? —প্রশ্ন তো আপনি কিছু করেননি মেৎর। একটা স্টেটমেন্ট করেছেন—গ্যেটে, য়্যুগো এবং বায়রনের ‘ভিরিলিটি’ বিস্ময়কর। পাণ্ডিত্য প্রকাশ হয়ে যাবে, নচেৎ আমি বলতাম এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই—

—কেন ?

—শিম্পী—সবাই নয়—কেউ কেউ, ক্রমাগত ‘ইম্পিরেশন’ চায়। একই নারীর কাছে সারাজীবন আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এতে দোষের তো কিছু দেখি না ; বিস্ময়েরও কিছু নেই !

—আমিও তো শিম্পী ; আমি কোন জাতের ?

—এ প্রশ্নের জবাব আপনার নিজের দেবার কথা। আমার নয়।

—না ! আমার নয় ! তোমার ! যেহেতু তুমি আমার হেড-স্টাডি বানাতে চেয়েছিলে। আমার সমস্ত চরিত্রটা না জেনে তো তুমি আমার মূর্তি বানাতে পার না !

—আপনি যত হেডস্টাডি করেছেন সকলের চরিত্র জেনেছেন ?

—নিশ্চয় নয়। তবে শিম্পীর দৃষ্টি দিয়ে আমাকে কিছু একটা আন্দাজ করতে হয়েছে। না হলে তার চরিত্রটা ফোটাতে কি করে ? আন্দাজে যদি ভুল হয় মূর্তিটা ব্যর্থ হবে—শিম্পীর দৃষ্টি সেখানে অসার্থক। এ জন্যই য়্যুগোর হেডস্টাডি করে আমি সন্তুষ্ট থাকিনি। আমাকে গড়তে হয়েছে য়্যুগোর ন্যুড !

—য়্যুগোর ‘ন্যুড’ ! কী বলছেন মেৎর !

—তুমি দেখতে চাও ?

—নিশ্চয়ই ! কোথায় আছে সেটা ?

—আছে আমার একটা গোপন স্টুডিওতে। সেখানে আর কারও প্রবেশ নিষেধ। কেউ তার খবর জানে না—বার্ডি-আলা ছাড়া।

—তবে আমাকেই বা ‘অদ্বিতীয়া’ করতে চাইছেন কেন ?

—তুমি রাজি থাকলে, সেখানে তোমার একটা ‘ন্যুড’ গড়তে চাই !

কামীল এক মিনিট চুপ করে থাকে। তারপর প্রশ্ন করে, শুনছি শুধু চোখে দেখে আপনি মূর্তি গড়তে পারেন না। দু-হাতের দশটা আঙুলে—

—ঠিকই শুনছে। তোমার আপত্তি থাকলে তোমার ক্ষেত্রে না হয় ব্যতিক্রম হবে। যেমন বাধ্য হয়ে গড়েছি য়্যুগোকে। আপত্তি আছে তোমার ?

কামীল পুরো এক মিনিট নতনেদ্রে কী ভাবল। তারপর সলজ্জে বললে, মেৎর ! আমি ভার্জিন !

—ও ! ও ! বুঝেছি ! তোমার আপত্তি আছে। কিন্তু স্পর্শমাত্র না করে যদি তোমার ন্যুড গড়ি ? **Eternal Idol** ? দেহাতীত প্রেম ?

নতনেদ্রেই কামীল বলে, আমাকে স্পর্শ তো আপনি করেছেন মেৎর ! মনে নেই ?

—হ্যাঁ. আছে। প্রথম দিনই অসতর্কভাবে তোমার বুকে হাত দিয়ে বলেছিলাম : ভেনাস থাকে এইখানে।

—না। সেটা তো দ্বিতীয় দিন ! তারও আগে। আমি প্রথম দিনের কথা বলছি।

অগুস্ত, অবাক হয়ে বলে, মানে ? তার আগেও তোমাতে-আমাতে সাক্ষাৎ হয়েছে ?

—আমি তোমাকে দেখেছি, তুমি আমাকে দেখতে পাওনি, কিন্তু স্পর্শ করেছ !

অগুস্ত ধম্কে ওঠে, কী আবেলতাবোল বকছ পাগলের মতো ?

—অবিশ্বাস্য মনে হলেও কথাটা সত্য ! শার্পেতিয়ের নববর্ষ পার্টিতে সেরায়ে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। তুমি আমার মানস গুরু—তোমার যেমন মিকেলাঞ্জেলো ! তিনশ বছর উজান ঠেলে যেতে পারলে তুমিও কি অন্ধকারের সুযোগে মিকেলাঞ্জেলোকে চুমু খেতে না, মন্-চেরি !

অগুস্ত বজ্রাহত !

উ

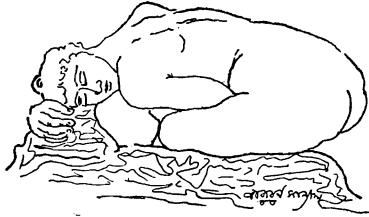
শিল্পী ব্যাশে কামীল রুদেলকে অগুস্তের স্টুডিওকে নিয়ে আসেন ১৮৪৩ সালে। এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তার পূর্বে শার্পেতিয়ের পার্টিটা তথ্য : কিন্তু মধ্যরাত্রে যে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে তা ঔপন্যাসিক সত্য, বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয়। কামীলের সঙ্গে পরিচিত হবার পর প্রথম পাঁচ বছরে রোদ্যা যে নারীমূর্তি গুলি গড়েছেন তার অনেকগুলিতেই সন্দেহাতীতভাবে কামীলের আকৃতি লক্ষণীয়। বেশ বোঝা যায় যে, সেগুলি কামীলকে মডেল করে বানানো। পর্যায়ক্রমে সেগুলি : দানেড '৪৪ ; Eternal Spring (চিরবসন্ত) '৪৪ ; এ্যাণ্ড্রামেডা, '৪৫ ; চিস্তা '৪৫ ; চুশন '৪৬ : Aurora (উষা) '৪৭ এবং Dawn (প্রভাত) '৪৭। সুতরাং আন্দাজ করা যায়, কামীলকে মডেল করে মূর্তি গড়ার কাজ শুরু হয়েছিল 'দানেদ' দিয়ে ; অর্থাৎ 'ন্যুড' দিয়ে।

এইটুকু তথ্যের ভিত্তিতে আমাকে এবার দানেদ-মূর্তি নির্মাণের কাহিনী কল্পনায় রচনা করতে দিন : 'দানেদ'-এর বর্ণনা আগেই দিয়েছি। যে-কোন কারণেই হক 'দানেদ'-এর ঐ ভঙ্গিমাটি শিল্পীর ভালো লেগেছিল—কারণ পরবর্তী দুটি ভাস্কর্যে—'এ্যাণ্ড্রামেডা' ও 'প্রভাত'-এ ঐ পোজ-এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়। 'এ্যাণ্ড্রামেডা'র সঙ্গে 'দানেদ'-এর পার্থক্য অতি সামান্য। দুটি তফাৎ নজরে পড়ছে : এ্যাণ্ড্রামেডার চুল ও চোখ খোলা নয়। আমার ব্যক্তিগত ধারণা—এটাও অবশ্য ঔপন্যাসিক সত্য—'দানেদ'-এর চোখও ১৮৪৪ সালে বন্ধ ছিল ; ফলে পার্থক্য মাত্র একটিই। Dawn মূর্তিতেও টরসো অংশে দানেদ-এর বেশ প্রভাব আছে। এবারও চুল

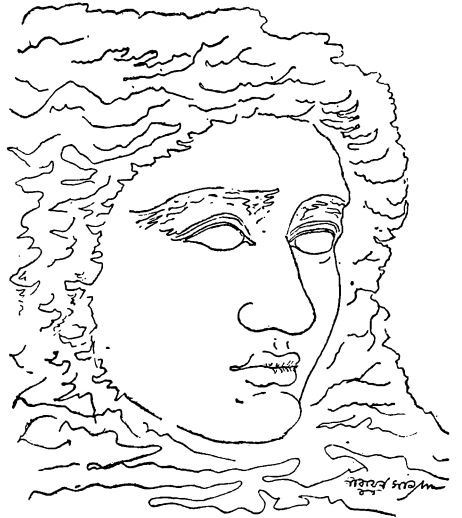
খোলা ; হাত দুটির অবস্থানে বদল হয়েছে। দেহের নিম্নাংশে তো প্রভেদ আসমান-জমিন। যে শুভপ্রতিম প্রস্তরে মেয়েটি উদ্ভাসের ভার ন্যস্ত করেছে সেটাকে যদি উদয়াচল বলে কল্পনা করতে পারেন, এবং নিজেকে ঐ স্তম্ভের বাঁ-দিকে (পশ্চিমদিকে) কল্পনা করতে পারেন, তবে অনুভব করবেন উদয়াচল অতিক্রম করে কীভাবে উষা উদিত হচ্ছেন। উষার ঘুম এখনও ভাঙেনি—আঁখি-পল্লব নিম্নীলিত ; বিগত রাত্রি-শেষের জড়িমা এখনও জড়িয়ে আছে ওর তনুদেহে। শিথিল করবী বাঁধবার সময়, সুযোগ অথবা মেজাজ এখনও ওর আসেনি।

আমরা যে Dawn (প্রভাত)-এর আলোচনা করলাম সেটি দু-নম্বর ভাস্কর্য ; তার পূর্বে একই বিষয়বস্তু নিয়ে রোদ্যা আর একটি ভাস্কর্য গড়েছিলেন—শুধু উষার মুখখানি। নাম রেখেছিলেন : Aurora (উষা)।

একই বিষয়বস্তু নিয়ে, একই নামকরণে মিকেলাঞ্জেলো গড়েছেন 'অরোরা'-র মূর্তি—মেদিচি চ্যাপেলে ; কিন্তু শুধু মুখখানি নয়, সারা দেহ। রোদ্যার এই শিল্পীটির রস উপলব্ধি করতে হলে সেটিকেও তুলনামূলক বিচার করতে হবে। অস্বীকার করব না, প্রথমদর্শনে আমার মনে হয়েছিল মিকেলাঞ্জেলো 'সন্ধ্যা' গড়ে তার নামকরণ 'ভুলে' করেছেন : উষা ! মিকেলাঞ্জেলোর 'উষা' বেশ কিছুটা বিষন্ন ; তার দ্রুতগতির উৎসর্গপুণ্ডে একটা বেদনার অভিভাব্যক্তি, তার বিমুক্ত ওষ্ঠাধরে মনে হয় যেন তার কিছু কথা এখনও বলা বাকি ! পরে মনে হয়েছে—মিকেলাঞ্জেলোর 'অরোরা' মূর্তিতে নতুন দিনের আগমনী নগ্ন, মূর্ত হয়েছে মিলন-রাত্রি অবসানের



চিত্র—40 : Andromeda—এ্যান্ড্রোমেডা (1885)



চিত্র—41 : Dawn (1887) প্রভাত



চিত্র—42 : Aurora 1520-34
(Michalangelo)
উষা—মিকেলান্জেলো



চিত্র—43 : Aurora (1885, Rodin) উষা—রোদঁয়া
রোদঁয়া—১৫



চিত্র—44 : Thought (1885) চিন্তা

বারতা। ঝৈঁরোতে যেন পূরবীর তান! “শেষ বেলাকার শেষের গানে ভোরের বেলার বেদন আনে।” সে উষা যেন ভাবছে—শারদপ্রাতে বাঁশখানি কার হাতে দিয়ে যাবে! ও তান ধরেছে: “ওকে বাঁধিবি কে রে, হবে যে ছেড়ে দিতে। ওর পথ খোলে রে বিদায়রজনীতে।”

অপরপক্ষে রোদ্যার ‘অরোরা’র—মুখখানি অমরাগিরি অঙ্ককার বিদীর্ণ করে অপাপবিদ্ধ বিস্ময়ে প্রথম ভেসে উঠেছে। যেন পূর্বদিগন্তের ঘনান্ধকার ভেদ করে প্রত্যুষের প্রথম কোঁতুল। মুখখানিকে ঘিরে আঁকাবাকা রেখা—মর্মরের মর্মর। যেন পুঞ্জীভূত কুয়াশা আর অঙ্ককারের আবছায়া। ও চোখ মেলে তাকিয়েছে; কিন্তু ওর দৃষ্টি এখনও ফোটোন—চোখ এখনও মণিহারা! ওর ওষ্ঠাধর ঘননিবন্ধ—যেন পাখির কাকলী এখনও জাগেনি।

মিকেলাঞ্জেলো আর রোদ্যার ‘অরোরা’ মূর্তি পাশাপাশি বসিয়ে আমরা যেন পুরো রবীন্দ্রসঙ্গীতখানি শুনতে পাই। যেন দুজনে ঝৈঁতসঙ্গীতে গোটা গানটা গাইছে। মিকেলাঞ্জেলোর উষা গাইছে:

“সকালবেলার আলোয় বাজে বিদায়ব্যথার ভৈরবী—

আনু বাঁশি তোর, আয় কবি ॥

শিশিরশিহর শরৎপ্রাতে শিউলফুলের গন্ধ-সাথে

গান রেখে যাস্ আকুল হাওয়ায়, নাই যদি রোস নাই র’বি ॥”

রোদ্যার ‘অরোরা’-গাইছে বাকি শেষ কটি পংক্তি:

“এমন উষা আসবে আবার সোনায় রঙিন দিগন্তে,

কুন্দের দুল সীমন্তে।

কপোতকুজনকরুণ ছায়ায় শ্যামল কোমল মধুর মায়ায়

তোমার গানের নুপুর মুখর

জাগবে আবার এই ছবি ॥”

‘চিরবসন্ত’ ও ‘চুশ্ন’ নিয়ে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৮৪-৮৬)।

চুশ্ন-টুশ্নের ছেলেমানুষী ছেড়ে, আসুন একটু চিন্তা করা যাক। Thought, অর্থাৎ ‘চিন্তা’ মূর্তিটি 1885-এ গড়া। এবার

দেখছি মেয়েটির মাথায় একটি অবগুণ্ঠন। অনেকটা নানু-দের ভঙ্গিমায়া। যেন ওর ছোড়ীদ—মেরী; যে মাথায় পরত অমন নানু-দের ক্যাপ। পাদপীঠ—সচরাচর রোদ্যা-ভাস্কর্যে যেমন হয়—ক্ষতচিহ্ন লাঞ্চিত; অসমাপ্ত ভাবে উৎকীর্ণ করা। তবু তার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। মনে হয়, যেন জলের উপর হালুকা তিরতিরেরে ঢেউ। যেন মেয়েটি চিন্তা-সলিলে আকণ্ঠ ডুবে আছে। জলধারা ওর চিবুকে বাধা পেয়ে দ্বিধাবিভক্ত। এবার মেয়েটির চোখের মণি যন্ত্র নিয়ে উৎকীর্ণ করা। প্রবহমান জলধারা ওর অনাগত সমুখ থেকে ধেয়ে এসে মাথার পিছনে অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ওর পিছনে ‘অস্পষ্ট অতীত’, সমুখে ‘অস্ফুট সুদূর যুগান্তর’!

সেই অনাগত জলধারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটি। দেখতে দেখতে মনে পড়ে যায় বনফুলের কবিতা:

“স্রোতমুখে তৃণখণ্ড! বক্ষে তার প্রেম মরীচিকা

দুগ্ধে-সুখে কাঁপে তার স্নায়ু।

আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য লিপিকা

লয়ে অঙ্গ অর্নিশচিত আয়ু।”

না! মাপ করবেন! হয়তো আদ্যন্ত ভুল ব্যাখ্যা করে চলেছি এতক্ষণ।

হয়তো ও আদ্য চায় না ‘অদৃষ্টের রহস্য লিপিকা’ পাঠ করতে। হয়তো অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি ওর কোনও কোঁতুল নেই।

ও আনমনে শুধু ভাবছে ফেলে আসা বিশ বছরের জীবনের কথাই। ওর কাঁকালে যে কানায়-কানায় ভরা ঘড়াটা ছিল তাতেই ও আজও নিমজ্জমানা। ওর মাথার উপর নানু-ক্যাপের অবগুণ্ঠন—খিন্ন-বিষন্ন দৃষ্টি হয়তো সেই কথাই বলতে চায়। কী জানি!

‘দানেন্দ’ মূর্তিটার ব্যাখ্যা করেছি—কিন্তু যেহেতু সেটাই কামীলকে মডেল করে বানানো ভাস্কর্যের তালিকায় সবার প্রথমে আছে তাই এবার আমাকে ‘দানেন্দ’-গড়ার অনুপ্রেরণার কথাটা কল্পনা করতে দিন:

৬

অগুস্তের এখন তিন-তিনটে স্টুডিও। ফরাসী সরকার ওকে যে স্টুডিওটা দিয়েছেন গ্রান্দ'বু দে ল'উনি-ভার্সিৎ-এ, সেখানে নির্মিত হচ্ছে 'নরকের দ্বার'। দ্বিতীয় একটা স্টুডিও বুলেভদ দে ভগীকাদ-এ এবং তৃতীয় একটা সে'ন-এর দ্বীপে - আইল সেন্স লুই-য়ে। প্রথম দুটির কথা সবাই জানে। তৃতীয়টি ওর গোপন স্টুডিও। সেটি দেখতে এল কামীল।

বাগানঘেরা ছোট বাড়ি। জনবিরল এলাকা। পাখ-পাখালি পাড়ায়। সে'ন-এর জলধারা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। গাছ, গাছ আর গাছ। ভারী মনোরম পরিবেশ। মুগ্ধ হল কামীল। অগুস্ত ওকে স্টুডিওর ভিতর নিয়ে গেল। বাইরেটা যেমন ছিমছাম ভিতরটা আদৌ তা নয়। মূর্তিমান বিশৃঙ্খলা। কামীল একটা ধমক দিল, এত নোংরা হয়ে থাক কি করে? এস, আমার সঙ্গে হাত লাগাও। মোটামুটি সাজিয়ে ফেলি।

—কেন? আমার তো কোন অসুবিধা হয় না।

—আমার হয়। জানলায় পর্দা নেই কেন? এস, ধর টেবিলটাকে।

সাধে কি বলে মেয়েমানুষ হচ্ছে 'নেসেসারি ঈড্‌ল্'! ওদের না হলেও চলে না; আবার ওরা ঢুকলেই সব কিছুর ওলট পালট করে দেবে! অগুস্ত 'জন্ম-এল্লোতে'—তার নকশা, ডিজাইন, মূর্তি, যন্ত্রপাতি সব ইতস্তত ছড়ানো থাকে। সাজানো গোছানো ওর ধাতে নেই। ওর আগের স্টুডিওতেও মেরী-রোজ...

মেরী-রোজ! না তার কথা আজ ও ভাববে না।

ঘর দোর মোটামুটি গুঁছিয়ে কামীল বলে, এবার তোমার

'গ্যুগো দ্য ন্যুড' দেখি।

অগুস্ত কাপড়ের আবরণটা সরিয়ে দিল।

গ্যুগো দণ্ডায়মান। এঁগিয়ে চলেছেন। এবারও সেন্ট জনের মতো তাঁর দুটি পা-ই ভূমিস্পর্শ করে আছে। গ্যুগোর ডান হাত ভাঁজ খেয়ে এসেছে বুকের কাছে, বাঁ-হাত বাঁ-পায়ের মতো সামনের দিকে ঝাঁকানো। সাধারণত আমরা যখন হাঁটি তখন বাঁ-পা সামনে থাকলে বাঁ-হাতটা থাকে পিছনে। চতুষ্পদ জীবের মধ্যে মানুষই একমাত্র বিবর্তন-প্রভাবে দ্বিপদী; অন্যান্য চতুষ্পদীরাও এই সাধারণ সূত্রটা মেনে চলে, চলমান অবস্থায়। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধকরি: উট। রোদাঁ এক্ষেত্রে চলমান গ্যুগোর ভ্রমণছন্দে সজ্ঞান ব্যতিক্রম করেছেন। স্পর্শতই তাঁর বস্তব্য—গ্যুগোর পদক্ষেপ ভিন্ন জাতের! গ্যুগোর মুখে একটা অন্তর্মুখী দার্ঢ্যের ব্যঞ্জনা। যেন স্বরাজ্যের সম্রাট! অথচ তাঁর চোখ দুটি স্বপ্নালু! নাসিকার কুণ্ডলে তাঁর দার্ঢ্য, ঘননিবন্ধ ওষ্ঠাধরে, সুদৃঢ় চিবুকে তিনি সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক এবং প্রবন্ধকার। শুধু দুটি চোখে তিনি কবি ও ঔপন্যাসিক! জাঁ ভাল্‌জাঁ অথবা কোয়ান্সিমোডোর মতো হতভাগ্যদের জন্য তাঁর দুটি চোখে বিগলিত করুণা। সত্যি কথা বলতে কি, স্কেচ করবার সাহস পাইনি। ফটো-প্লেট যুক্ত করে দিয়েছি গ্রন্থের সামনের দিকে! (প্লেট: J)

গ্যুগো মূর্তির শিল্পবিচার শেষ হলে কামীল বলে, কী গড়বে আমাকে নিয়ে?

—ন্যুড।

খিল্‌খিল করে হেসে ওঠে কামীল। বলে, ভারী নতুন কথা শোনালে। তা না হলে এই নির্জনে টেনে আনবে কেন?

কিস্তু বিষয়বস্তুটা কী ?

অগুস্তের চোখ দুটি স্বপ্নালু হয়ে ওঠে। বলে : Eternal Idol !

—তার মানে ?

—তুমি আপত্তি জানিয়েছ, তোমাকে স্পর্শ করা চলবে না।

ফলে আমার ভাস্কর্যের বস্তু : দেহাতীত প্রেম। নারীজাতির
হ্লাদিনী শক্তি। যা বীরকে করে বিজয়ী, শিল্পীকে সৃজন-
ধর্মী, কবিকে মুগ্ধ।

কামীল অধোবদনে চুপ করে রইল। তার স্পষ্ট মনে আছে,
সে একবারও বলেনি তাকে স্পর্শ করায় কোনও আপত্তি
আছে। না, একবারও বলেনি। তার দ্বিগুণ বয়সী ঐ মহান
শিল্পীকে সে কী চোখে দেখেছে, দেখছে তা মেংর বুঝতে
পারছে না ? কেন পারছে না ? নববর্ষের আগমনী মুহূর্তেই
তার ওষ্ঠধর কি নীরব ভাষণে সে কথা স্পষ্টাক্ষরে বলেনি ?
মেংরকে কি সে প্রথম দিনই জানিয়ে দেয়নি তার কুমারী-
হৃদয়ের অন্তর্লীন ভাবমূর্তি এ্যাডর্নিস্-এর, এ্যাপোলোর !
অগুস্ত্ কি বোঝে না তার এ্যাডর্নিস কে, এ্যাপোলো কোন
জন ?

অগুস্ত্ বলতে থাকে, দেহাতীত প্রেমের ব্যঞ্জনাট কী-ভাবে
ফুটিয়ে তোলা যাবে তা এখনও স্থির করে উঠতে পারিনি।
তুমি 'ন্যুড' অবস্থায় নিঃশঙ্কচিত্তে পদচারণা করতে থাকবে।
কথা বলবে না। আমি ক্রমাগত স্কেচ করে যাব। আঁকতে
আঁকতে কোন একটা ভঙ্গিমা আমার মনোহরণ করবে - যা
ফুটিয়ে তুলতে চাই, তা ধরতে পারব।

স্কেচ খাতাখানা বাগিয়ে ধরে কামীলের দিকে পিছন ফিরে
বসল অগুস্ত্। সজ্ঞানে না হলেও, দীর্ঘদিনের ন্যুড গড়ার
অভিজ্ঞতায় অবচেতনের নির্দেশে এটা ওর প্রতিবর্তী আচরণ।
পুরুষ মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে এক-একটা করে অঙ্গাবরণ খোলার
চেয়ে সেটা আড়ালেই করতে চায় সব মেয়ে। অনেকটা
শীতকালে নদীতে স্নানের মতো। চোখ বুঁজে একবার ঝাঁপ
মারতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

পিছন ফিরে ও ভাবতে থাকে ওর মূর্তিটাকে—যেটাকে ও
ধরতে চাইছে। ধ্যানের দৃষ্টিতে—

...পরিণত বয়সে রোদাঁ শিষ্যদের বলতেন, “ইন্সপিরেশন বলে
কিছু নেই ! নিরন্তর কাজ করে যাও। অভ্যাসে এমন হবে
যে, তোমার আঙুল তোমার অন্তর থেকে ভাবধারাকে ছিনিয়ে
এনে রসোত্তীর্ণ শিল্পের শিখর চূড়ায় তোমাকে আপনাই পৌঁছে

দেবে।” আমরা আপাতত কল্পনা করছি—এ উপলব্ধিতে
রোদাঁ উপনীত হয়েছিলেন 1884 সালের অনেক পরে।
তখনও তিনি আর পাঁচজন শিল্পীর মতো তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে
শিল্পকে ধরতে চাইতেন।...

অনেক-অনেক নগ্ননারীর মূর্তির কথা মনে পড়ছে অগুস্ত-এর।
'ভেনাস অব উইলোওফ্' থেকে আঙুরের 'লা-সূর্স'। না,
যোনতা-বিবর্জিত ক্যারিরা-ব্ল্যুজ-এর ন্যুড সে কিছতেই গড়তে
পারবে না—কিস্তু যোনাঙ্গ যেন দর্শককে বিপথে চালিত না
করে।...একক মূর্তি গড়বে, না মিথুন ?...পুরুষ যদি নারীমূর্তির
সম্মুখে নতজানু হয়ে...

কামীল পিছন থেকে বলল, তোমার যদি সুবিধা হয় তাহলে
দু হাতের দশটা আঙুলে আমার দেহের কণ্টর...

কথাটা অগুস্তের কানে গেল না। বললে, ঠিক আছে, ঠিক
আছে, গোল কর না।

আরও মিনিট পাঁচেক পরে কামীলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল
আবার : আমি তৈরী !

—অপেক্ষা কর। আমি এখনও তৈরী নই !

...দণ্ডায়মানা, উপবিষ্টা না শায়িতা ?...মিথুন গড়লে এমন
ভাবে গড়তে হবে যাতে কেউ কাউকে স্পর্শ করবে না।
অথচ মূর্তি দুটি ঘনিবন্ধ হওয়া চাই। পুরুষের হাত-দুটি
থাকবে নিজ দেহের পিছনে। নারীর ?

—আমার শীত করছে যে !

বাধ্য হয়ে এ-পাশে ফিরতে হল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেল অগুস্ত্।
নিরাবরণা কামীলের সর্বাবয়বে এমন একটি মোহময়ী আকর্ষণী
শক্তি যে, ওর ধ্যানের দেহাতীত প্রেমের, নিকষিত-হেমের স্বর্ণাভা
মুহূর্তে কোথায় বিলীন হয়ে গেল। শিল্পীকে যেন দু-হাতে
গলা টিপে ধরেছে ওর অন্তর্লীন কামনা-বাসনা-জর্জরিত
সত্তাটা !

এ কী হল ! এমন তো হয় না ওর !

হয়তো ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল অন্তরের প্রতিক্রিয়া ! কামীল
মোহিনী হাসল। দুটি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল অগুস্তের
দিকে ! অগুস্তের কান্না পেল ! পার্শ্বিক বৃত্তিটারই জয়
হবে ! শিল্পী অগুস্ত্কে ভুলশায়ী করবে পুরুষ অগুস্ত্ ?
সে দু-হাত বাড়িয়ে ঐ কামনা-বাসনার গলা টিপে ধরল। প্রচণ্ড
ধাক্কা মেরে পার্শ্বিক বৃত্তিটাকে ঠেলে দিল দূরে !

পরমহুর্তেই সম্বিত ফিরে এল তার! একী করেছে সে! নিজের পার্শ্ববিকৃতাকে সে তো ধাক্কা মারেনি! তাহলে ওভাবে ছিটকে দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ল কেন কামীল?

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখল—কামীল উবুড় হয়ে পড়েছে স্ট্রুডিওর একান্তে রাখা একক-শয্যার উপর। লেপ-কয়লাটা স্থপাকার হয়ে আছে তার উপর ও উবুড় হয়ে পড়েছে। ওর খোঁপাটা ঐ প্রচণ্ড ধাক্কা খুলে গেছে। আবির্ভাব কেশরাশি লুটিয়ে পড়েছে বিছানায়। চোখ দুটি বোঁজা। তা থেকে অব্যাহার ধারায় ঝরে পড়েছে জল। অনাঘ্রাতা কুমারীর দেহটা থর থর করে কাঁপছে! ভয়ে, লজ্জায়, অপমানে, অভিমানে। প্রত্যাখ্যাতা সে!

অগুস্ত্ সব কিছু ভুলে গেল। চীৎকার করে উঠল: দানেন্দ! হাইপারনেস্টা!

কামীল সভয়ে চোখ মেলল সে চীৎকার শুনে।

—নড় না! ঠিক ঐ ভাবে শুয়ে থাক!

স্কেচ বুকটাতে সে ঝড়ের বেগে আঁচড় টানতে থাকে। ফাদার এইমার্জের লাইব্রারীতে পড়োঁছিল ঐ গ্রীক উপকথাটি। লিনিসিয়ুস্-এর কাছে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে হাইপারনেস্টা ঠিক ঐভাবে ভূষ্মালীন হয়েছিল। দীর্ঘদিন ওর অবচেতন মনে লীন হয়ে ছিল সেই হতভাগিনীর প্রতি একটা সমবেদন। আজ তাকে মূর্তিমতীরূপে দেখতে পেয়েছে!

কামীল ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখে। পাগলটা কি আবার প্রহার করবে?

—চোখ খুলো না। চোখ বন্ধ করে রাখ! এখনই শেষ হয়ে যাবে আমার স্কেচ!

...আস্থা রাখুন আমার কম্পনায়: 1884 সালে যখন 'দানেন্দ' নির্মিত হয়েছিল, তখন তার আঁখিপল্লব ছিল নির্মীলিত। সেটাই যে হবার কথা। অজস্তা সপ্তদশশুহার মরণাহতা রাজকন্যা, মিকেলাঞ্জেলোর পীতা অথবা বার্গিনীর থেরেসাকে কি আপনারা চোখ খোলা অবস্থায় কম্পনা করতে পারেন?

অগুস্ত্ যে পাগল নয়, শুধু শিম্পীও নয় সে প্রমাণ কামীল পেয়েছিল সে রাতেই—আদরে, সোহাগে, ক্ষমাপ্রার্থনায়। কামীল নিজেও শিম্পী সহজেই বুঝল অগুস্তের এ অস্বাভাবিক আচরণের যৌক্তিকতা। ধাক্কাটা সে কামীলকে মারেনি, মেরেছে নিজের দ্বিতীয় সত্তাকে।



যতই কুলকুচি কর আর এলাচ চিবাও গন্ধটা লেগে থাকেই। মদ আর মেয়েমানুষের। ঘরনীর ঘ্রাণে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সের মেরী-রোজ ব্যুরেও সন্দেহ করল তার এত সাধের ডেনমার্ক কোথাও

কিছু একটা পচেছে। উদয়াস্ত খাটুনি তো অগুস্ত্ সারাজীবনই খাটছে; কিন্তু ঘরে-ফেরা মানুষটার এমন ব্যবহার তো লক্ষ্য করেনি কোনদিন। বেশ রাত করে ফিরছে মাঝে মাঝে। আর ফিরেই বলছে, ক্ষিদে নেই। তুমি খেয়ে নাও।

ক্ষিদেটা না থাকবেই বা কেন? রেস্তোরাঁয় খাচ্ছে? একা-একা? কেন? বেশ, তাও না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু ক্ষিদেও তো জাত আছে! সব ক্ষিদেই কি একা-একা মোটানো যায়?

স্ট্রুডিও থেকে ফিরে জামা-জুতো ধড়াস্-ধড়াস্ খুলে খাটে উবুড় হয়ে পড়ে। পড়েই ঘুম। আর তার পাশে জেগে বসে থাকে মেরী-রোজ। মনে মনে বলে, এত লুকোছাপা কিসের? দুয়োরাগীর বিদায়ের লগ্ন এসে গেছে! এই তো ব্যাপার? তা খোলাখুলি বলে দিলেই হয়? চারিটা সুয়োরাগীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বিদায় হই।

এখানেই ভুল হচ্ছে মেরী-রোজ-এর। 'ঘরের কোণে ভরা পাত্র' আর 'বরণাতলার উছলপাত্র' দুটোই দরকার শিম্পী অগুস্ত্-এর। গঙ্গা প্রাণদায়িনী, গঙ্গা জীবন সঞ্চারিণী; কিন্তু প্রেম যমুনার নবঘননীলাঞ্জনছায়াও যে শিম্পীর প্রয়োজন। Venus Coelestes আর Venus Naturalis! কেউ কারও কম নয়। দু-নোকায় পা-রেখে চলেছে অগুস্ত্।

কিছুদিন পরে পোতি অগুস্ত্কে জিজ্ঞাসা করল, তোর বাপ কি...?

সম্ভ্রমে প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না। প্রয়োজনও ছিল না অবশ্য। পোতি অগুস্ত্ বুঝে নিল ঠিকই। দু-হাত তুলে বলল, আমাকে জিজ্ঞাসা কর না, আমি জানি না। মেৎর যদি জানতে পারে আমি বলেছি...

পোতি অগুস্ত্ এখন বিশ-বছরের নওজোয়ান। স্ট্রুডিওর দেখভাল করার কথা তার। করে না। মডেলদের সঙ্গে ফাস্ট-নিস্ট করে, ভাব জমানোর চেষ্টা করে। মদ খায়, ফুঁর্তি করে। বাপ দেখেও দেখে না, ধরে নিয়েছে—ছেলে সংশোধনের বাইরে। তাই দায়িত্বও দেয় না কিছু ভরসা করে।

মেরী-রোজ মিনতি করে, খোকন, তুই তো জানিস, এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা—

এবার নিচু গলায় স্বীকার করে, হপ্তায় দুদিন মেংর স্টুডিওতে আসে না। বুধ আর শনি।

—বুধ আর শনি! কোথায় যায়?

—আমি তার কী জানি? তবে লক্ষ্য করেছি, ঠিক সেই-সেই দিন আমাদের স্টুডিওতে আরও একজন আসে না।

—কোনও সুন্দরী মডেল?

—সুন্দরী। তবে মডেল নয়, শিক্ষার্থী।

—কত বয়স? কতদিন কাজ শিখছে?

—বয়স আমারই মতো। মাস দুয়েক কাজ শিখছে। তুমি যেন মেংরকে বল না আমি বলেছি।

মেরী-রোজ জবাব দেয় না। বহুত শেষ কথাটা সে শুনতেই পায়নি। ডুবে গেছে চিন্তা-সমুদ্রে।

পরের শনিবার সকালে নাস্তা সেরে অগুস্ত্ যখন বার হল তখন মেরী-রোজ পিছু নিল তার। গোপনে। অগুস্ত্ যে পথ ধরল সেপথে ওর দুটি স্টুডিওর কোনটিতেই যাওয়া যায় না। দু-পকেটে দু-হাত দিয়ে-শিস্ দিতে দিতে চলল সে'ন-এর ধার বরাবর। অভিসার! তার পঞ্চাশ হাত পিছন-পিছন চলেছে তার ছায়া। বিশ্ববহর ধরে 'ছায়েবানুগত'!

‘...আপনার ঐ নীল চোখের দৃষ্টি এত প্রখর?’

‘...রাসেল্‌স-এর এই নির্জনতা আর সহ্য হচ্ছে না—তুমি চলে এস—খরচ পাঠালাম...’

‘...আমি বড় ভুলো মানুষ! এমনি করে ভুল শুধরে দিও আমার। কথা দাও আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবে না।’

একটা টালির শেড। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। অগুস্ত্ টোকা দিল দরজায়। পাল্লাটা অস্পষ্ট ফাঁক হল। অগুস্ত্ ঢুকে গেল ভিতরে। এক-ঝলক ওকে দেখতে পেয়েছিল মেরী-রোজ—ঐ সুয়েরানীকে। সুন্দরী! অস্বীকার করবে করবে না মেরী। কিন্তু পনের বিশ বছর আগে সে কি নিজেও অমন ছিল না দেখতে? ঐটুকু এক ফোঁটা একটা মেয়ে—বয়সে হয়তো পোতি অগুস্ত্-এর ছোটই হবে—সে আজ অমানবদনে কেড়ে নিতে চায় তার বিশ্ববহরের অসপত্র অধিকার?

বসে পড়ে একটা উইলো-গাছের তলায়। পথের ধারে। অপেক্ষা করে। মিনিট দশেক—মানে সে-আমলে বিবসনা

হয়ে মডেল-স্ট্যাণ্ডে উঠে দাঁড়াতে সে যতটা সময় নিত আর কি। হাতে-নাতে ধরতে হবে তো? তারপর ছুটে গেল দরজাটার কাছে। করাঘাত করল।

—কে? অগুস্ত্‌র কণ্ঠে বিরক্তি। দু-আঙুল পরিমাণ খুলে গেল পাল্লাটা।

প্রচণ্ড ধাক্কা ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকল মেরী-রোজ। একটা অস্পষ্ট আত্নাদ করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে মেয়েটা। ও অমন অদ্ভুতভাবে উবুড় হয়ে শুরোঁছিল কেন? অগুস্ত্ ওকে মেরেছে? কেন?

কামীল তুলে নেয় তার পরিত্যক্ত গাউনটা। নগ্নতাকে ঢাকে। দূরন্ত বিষ্ময়ে অগুস্ত্ বলে, এ কী? তুমি এখানে কেন? কে সন্ধান দিয়েছে?

মেরী-রোজ ধীরে ধীরে বসে পড়ে একটা কাঠের বাক্সের উপর। তার সব উদ্দীপনা যেন শেষ হয়ে গেছে। ক্লান্তকণ্ঠে বলে, আজও আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে অগুস্ত্? তুমি কৈফিয়ৎ দেবে না?

—বল, আমার পিছনে কে গোয়েন্দাগিরি করছে? পোতি অগুস্ত্?

—আমার সন্দেহ হয়েছিল, তাই তোমার পিছন পিছন এসেছি।

—কিন্তু কেন? কী চাও তুমি?

মেরী-রোজ নিঃশব্দে তার পকেট থেকে একটি চাবির গোছা বার করে বললে, এটা তোমাকে ফেরত দিতে।

—মানে! কিসের চাবি ওটা?

—তোমার বাড়ির।

—তুমি কোথায় যাচ্ছ?

—যেখান থেকে এসেছিলাম—ওয়ার্ক ডর্মিটারিতে। দর্জির দোকানে। সেই রকমই তো কথা ছিল অগুস্ত্। তাই তুমি বিবাহবন্ধনে নিজেকে জড়ান।

অগুস্ত্ এ-পাশে ফিরে দেখে কামীল কাপড়-জামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেছে। এগিয়ে এসে মেরী-রোজের হাত দুটি ধরে বলে, না! সে-রকম কথা কোনদিনই ছিল না। তুমি তো জান, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।

—তুমি কি আশা কর তোমার ঐ স্ত্রীর পরিচারিকা হয়ে...

—ও আমার স্ত্রী নয়। হবেও না কোন দিন!

—ও আমার মতো গাঁয়ের মেয়ে নয়! ও রাজি হবে কেন?

আমিই বা রাজি হব কেন ?

—এস, বাইরে এস, কথা আছে —

অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল ওকে। বললে, সন্ধ্যায় ফিরে সব কথা বুঝিয়ে দেব।

মেরী-রোজ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু-হাতের নিজের কান চেপে ধরে বলে, প্লীজ অগুস্ত্ ! ঐ বাঁধা-বয়ানটা আর ব্যবহার কর না ! যতই বোকা হই, বুঝতে আমার কিছু বাকি নেই। আমাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা কর না আর।

ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল, তার ‘প্রথম প্রেম’ ! অগুস্তের হাত বাড়ানোর ভঙ্গিটাই ছিল ভুলেভরা ! Fugit Amor !

অগুস্ত্ স্ট্রুডিও-তে ফিরে এসে দেখল পোষাকপরে কামীল তৈরী।

—এ কী ! কোথায় যাচ্ছ ?

—ও কে ?

—মেরী-রোজ ব্যুরে।

—তোমার ‘মিস্ট্রেস্’ ?

—না।

—পরিচারিকা ? মডেল ?

—না।

—তবে কী ও ?

—তুমি কী ? শিক্ষার্থী ? মডেল ? মিস্ট্রেস্ ?

—সেটাই তো জানতে চাইছি আমি ?

—এই মুহূর্তে বুঝি আর মনে হচ্ছে না—গ্যেটে, গ্যুগো আর বায়রনের ক্রমাগত নতুন নতুন ‘ইন্সপিরেশন’ কামনা করাটা স্বাভাবিক !



লিখিয়েছি। আমার আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে।

অগুস্ত অনেকক্ষণ জবাব দিতে পারল না। তারপর শাস্তকণ্ঠে বলল, হয়তো ভালই হল। সৈন্যদলে কিছু নিয়মানুবর্তিতা

শিখতে তুমি বাধ্য হবে।

মেরী-রোজ বললে, বাপিকে বিদায়-চুম্বন দাও খোকন।

পেতি অগুস্ত্ বুখে দাঁড়ালো, বাপি ! বাপি কে ? উনি আমার মেত্র। ওঁর স্ট্রুডিওতে পেট-চুক্তি কাজ করতাম বইতো নয় ! জীবনের উনিশটা বছর উনি...

বাকি কথা কটা ওর কানে যায়নি। মনে পড়ে গেল বড়দিকে। ক্লোতল্দুকে। কিন্তু সে তো পাপা রোদ্যার মতো কোনও দুর্ব্যবহার করেনি পেতি অগুস্তের সঙ্গে। যাতে সে তাকে এভাবে অপমান করতে পারে। সমস্ত রাগ চেপে সে বললে, একথা কেন বলছ পেতি ? আমি তো তোমাকে পুত্র বলে স্বীকার করে নিয়োছি। সকলের কাছে সেই পরিচয়ই দিয়ে এসেছি এতদিন।

—না দিয়ে উপায় ছিল না আপনার। খাতা-কলমে আমি ‘ব্যুরে’, রোদ্যা নই। বাস্টার্ড !

—লেঅনার্দোও বাস্টার্ড ছিলেন। তবু তিনি মাথা উঁচু করেই বেঁচে আছেন ইতিহাসে।

পেতি অগুস্ত হেসে বলে, মেত্র ! যাবার সময় তর্ক করব না আপনার সঙ্গে। সময় ও সুযোগ মতো ভেবে দেখবেন—লেঅনার্দোর বাবাও কি একইভাবে মাথা উঁচু করে বেঁচে আছেন ইতিহাসে ?

অগুস্ত্ জবাব দিতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মতো গ্রহণ করল বাস্টার্ড পুত্রের প্রসারিতকর। তাকে কেমন যেন অসহায় মনে হচ্ছে। কেমন যেন অপমানিত মনে হচ্ছে নিজেকে। শেষ পর্যন্ত মেরী-রোজ-এর দিকে ফিরে বলে, মেরী, তুমি অন্তত ওকে বুঝিয়ে বল —

মেরী-রোজ-এর দু-চোখে জল। তবু সে হাসল। বললে, আমি ? আমি বুঝিয়ে বলব ? আমি নিজেই কিছু বুঝেছি কোনদিন ? বাস্টার্ড পুত্রের আনপঢ় মা ?

পেতি অগুস্ত্ নিজের পথে রওনা হল।



দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন অফিসটাইম লোকালট্রেনের যাত্রীর মতো গুতোগুতি করে আসে।

1887। একদিন ললিতকলা বিভাগের আওয়ার-সেক্রেটারি মসুয়ে তাকুয়ে ওর স্ট্রুডিওতে এসে হাজির। বললে,

মস্যুয়ে রোদঁ! আমাদের ধৈর্যের একটা সীমা আছে।
আপনি ‘গেট অব হেল’ কবে শেষ করছেন?

—ওটা যে বাড়ির তোরণ হবে, সেই প্রাসাদের ভিত্তিপ্রস্তরও তো এখনও স্থাপিত হয়নি।

—সেটা আপনার ভাববার কথা নয়। আপনি গায়েতার আমলে চুক্তি করেছিলেন কাজটা তিন বছরে শেষ করবেন, আট হাজার ফ্রাঁ-তে। তিন বছর বহুদিন হল অতিক্রান্ত, আর এ পর্যন্ত আমরা আপনাকে সাড়ে পঁচিশ হাজার ফ্রাঁ অগ্রিম দিয়েছি।

—তবেই বুঝুন! আপনারা মেনে নিয়েছেন, ওটা চুক্তি অনুযায়ী হচ্ছে না! আট হাজার ফ্রাঁর কাজ তিন বছরে শেষ হলে, পঁচিশ হাজার ফ্রাঁর কাজে ন বছর লাগবে এটা তো সহজ অঙ্কের হিসাব!

—শুনুন মশাই! আমি শেষ কথা বলতে এসেছি—
তোরণদ্বার 1889-এর ভিতর শেষ করতে হবেই। কারণ ঐ বছর আমরা পারীতে একটি ‘এক্সপো’ করছি। ষ্টেফেল টাওয়ার জগতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হবে সেই প্রদর্শনীতে। ঐ সঙ্গে আমরা আপনার ‘নরকের দ্বার’ও উৎসর্গ করতে চাই। অগুস্ত্ বলে, এতবড় সম্মানে কোন্ না শিল্পী উৎসাহিত হবে বলুন? কিন্তু মুশ্‌কিল এই—দু’বছরে ওটা শেষ হবার নয়! অসম্ভব।

—তার মানে, অনিবার্য মামলা-মোকদ্দমার দিকে আপনি আমাদের ঠেলে দিচ্ছেন?

—আমি কি প্রাণপাত করছি না?

—না! আপনি ক্রমাগত বাইরের কাজ নিচ্ছেন। আমরা খবর পেয়েছি, এমিল জোন্নার অনুরোধে আপনি সম্প্রতি বালজাকের একটি মূর্তি গড়বার ব্যয়না নিয়েছেন। একথা সত্যি?

—মস্যুয়ে তাকুঁয়ে! আপনি ললিতকলা বিভাগের আগার-সেক্রেটারি! বলুন, বালজাকের মূর্তি গড়ার সুযোগ কোনও শিল্পী প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

—পারে। যদি সে তার পূর্বেই চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, আমাদের অভিযোগ—চুক্তিনামা না মেনে আপনি ইচ্ছা মতো মূর্তি গড়ে চলেছেন!

—এটা তো নতুন কথা শোনালেন। তার মানে?

—চুক্তিনামায় বলা হয়েছে “Monsieur Rodin, artist sculptor, in consideration of the sum of eight thousand francs, is commissioned to execute the model of a decorative door destined for the Museum of Decorative Arts : bas-reliefs to represent the DIVINE COMEDY of DANTE.”—আপনি দান্তের ডিভাইন কমিডি থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছেন! এ বিষয়ে আপনার কী বক্তব্য?

—প্রথম কথা, চুক্তিটা হয়েছিল সতেরই জুলাই 1870 সালে, এটা 1887; সব কিছুই বদলে গেছে। তিন বছরের সময়কাল, আট হাজার ফ্রাঁর অঙ্কটা, সবই। সুতরাং দান্তের ‘ডিভাইন কমিডি’কে অনুসরণ না করাটাকেও আপনারা ক্ষমা-ঘেন্না করে মেনে নিন না কেন?

—কেন? কোন যুক্তিতে? কেন আপনি দান্তেকে অনুকরণ করবেন না।

—অনুকরণ?

—বেশ, না হয় অনুসরণ?

—অথবা ছায়াবলম্বন?

—আচ্ছা না হয় তাই হল, ছায়াবলম্বন।

—কিন্তু ‘পেনাম্ব্রাবলম্বন’।

—‘পেনাম্ব্রাবলম্বন’! সেটা কী?

—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন কি—পারীতে যে শত শত মূর্তি আছে তার কোনটি কার অনুকরণ, অনুসরণ অথবা ছায়াবলম্বন? তাহলে ‘পেনাম্ব্রাবলম্বন’ শব্দটা আপনাকে বুঝিয়ে দেব।

তাকুঁয়ের মনে হল অগুস্ত্ তাকে অপমান করছে। শিল্প সম্বন্ধে তার জ্ঞানকে। বললে, না, আমি আপনাকে সে-কথা বুঝিয়ে দেব না। আপনি বরং বুঝিয়ে দেবেন আমাদের উকিলকে—কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে!

...পারীর শত শত মূর্তি আপনি-আমি দেখিনি। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের সম্বন্ধে নেওয়া দরকার—শিল্পের ক্ষেত্রে কোনটা অনুকরণ, কোনটা অনুসরণ, কোনটা ছায়াবলম্বন এবং কোনটাই বা ‘পেনাম্ব্রাবলম্বন’।

আসুন ‘জিস্ দে মে গঙ্গা বহতি হৈ’ সে দেশেই ফিরে আসি!

ট

শিল্পে অনুকরণ : সার্থক, অক্ষম, কদর্য/
অনুসরণ/ছায়াবলম্বন :

শিল্প-সাহিত্য-ললিতকলায় ‘অনুকরণ’ যে সর্বদাই
পরিত্যজ্য একথা নিশ্চয়ই বলব না। গুপ্ত-যুগের বুদ্ধমূর্তির
অসংখ্য সার্থক অনুকরণ শিল্প হিসাবে স্বীকৃত—চোল-শৈলীর
নটরাজ মূর্তির হুবহু অনুকরণ আমরা সযত্নে সাজিয়ে রাখি।
সেটা যত মূল্যবান ততই আদরণীয়। একই কথা
মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড অথবা ভেনাস ডি-মিলোর মিনিয়চার
প্রসঙ্গে। ‘পদ্মার ঢেউ রে’ কেউ গাইলে আমরা শচীন
দেব বর্মনের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ প্রত্যাশা করি, ‘রানার’ গানে
হেমন্তর। শিল্পী যদি মৌলিকতা দেখাতে যান অমনি
আমরা বলি : ঐখানটায় কানে বাজল। কার্ডালো, আবন
অথবা জীবানন্দে যথাক্রমে ভূমেন রায়, অহীন্দ্র চৌধুরী অথবা
ভাদুড়ীমশায়ের অভিনয় অনুকৃত হতে দেখলে আমরা প্রেক্ষাগৃহ
ছেড়ে উঠে যাই না। মৌলিক অভিনয়ে হয় তো আরও খুশি
হই, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সার্থক অনুকরণ স্বীকৃত।

ক্ষেত্রবিশেষে শিল্পী নিজের অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করে
বসেন। সে বড় বিড়ম্বনায়। একটি উদাহরণ দিই। প্রখ্যাত
ইতিহাস-বেত্তা এবং মহাভারতের ভাষ্যকার ত্রিপুরারী চক্রবর্তী-
মশাই ছিলেন আমার ভগ্নিপতি। সূধীজনমাত্রেই জানেন, তাঁর
স্মৃতিশক্তি ছিল—যাকে ইংরাজীতে বলে ‘ফেনামেনাল’,
বাঙলায় শ্রুতিধরপ্রতিম। অষ্টাদশপর্ব মহাভারত ছিল তাঁর
কণ্ঠস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে দীর্ঘকাল তিনি মহাভারত পাঠ
করেছেন—কোনদিন বই হাতে যাননি। একদিন অন্তরঙ্গ
সুযোগে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, চক্ৰোত্তমমশাই, আপনি এতবড়
রোদ্যা—১৬

পাণ্ডিত, কিন্তু মৌলিক কিছু লেখেন না কেন ?

জবাবে তিনি বলেছিলেন, সে বড় বেদনার কথা নারায়ণ ; ঐ
ফরাসী নীতিবাক্যটা আমি জানি : *Scripta manent,
verba volant* (রচনা স্থায়ী হয়, বক্তৃতা হারিয়ে যায়) !
দুঃখের কথা বলি শোন : একবার পীড়াপীড়িতে মার্কিন
মুলুকের একটি পত্রিকায় আমি একটি মৌলিক প্রবন্ধ
লিখেছিলাম। পরে দেখা গেল তাতে বাট্রাণ্ড রাসেল,
টয়েনবি, রাধাকৃষ্ণ থেকে আমি হুবহু নকল করেছি ! কী
লজ্জার কথা ! মায় পাণ্ডুয়েশান মার্কিং পর্যন্ত মিলে গেছে !
বিশ-ত্রিশ বছর আগে সে প্রবন্ধগুলি পড়েছি—আমি জানতাম
না যে, চিন্তাধারাগুলি পর্যাঙ্কুর পর পর্যাঙ্কুর আমার মস্তিস্কের গ্রে-
সেল-এ পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে !

এ জাতীয় অজ্ঞাতসারে অনুকরণ একটা দুর্লভ ব্যতিক্রম। তার
কথা থাক।

শিল্পে—যে-কোন শিল্পে—অনুকরণ ‘সার্থক’ হবে কিনা বুঝে
নিতে একটিই এ্যাসিড-টেস্ট। শিল্পী পূর্বস্বীকৃতি দিয়েছেন
কি না যে, তিনি অনুকরণ করছেন। অর্থাৎ মৌলিকসৃষ্টি
বলে চালাবার ধোঁকাবাজি যেখানে নেই। আজ আমাদের
বিচার্য ভাস্কর্য। তাই ভাস্কর্য থেকেই একটি উদাহরণ দিই—
খবরটা সম্প্রতি জেনেছি ডেস্‌মণ্ড ডয়েগ-এর কৃপায় (*The
Sunday Telegraph, 14.8.83*)। নেপালের কাঠমণ্ডুতে
জগু-বাহাদুর রানার একটি অশ্বারোহী মূর্তি আছে যা কলকাতায়
অবস্থিত আউটরাম মূর্তির অনুকরণে। ডয়েগ-এর ‘অনুকরণে’
আমি এখানে তা সন্নিবেশিত করেছি। আউটরামের মূর্তির
ভাস্কর জে. এইচ. ফোলে। জগু-বাহাদুরের মূর্তিটি নির্মাণ

করেছেন ফোলের শিষ্য টি বুক্‌স্‌। মূর্তিটির নির্মাণকাল 1881 সাল !

এক্ষেত্রে বুক্‌স্‌ মৌলিকতার কোনও দাবী করেন নি ! আউট-রামের বদলে জঙ-বাহাদুরকে বসিয়েছেন একই ভঙ্গিমায়। অর্থাৎ তো হুবহু অনুকরণ। তা সত্ত্বেও যেহেতু এখানে শিল্পী স্পর্শাক্ষরে স্বীকার করেছেন যে, তিনি একটি মৌলিক সার্থক সৃষ্টির অনুকরণ করছেন, তাই এটিও রসোত্তীর্ণ শিল্প। সার্থক অনুকরণ।

অক্ষম অনুকরণ তাকে বলি, যেখানে শিল্পী স্বীকার করেছেন যে, তিনি অনুকরণ করতে চান, কিন্তু বর্ণিকাভঙ্গের অক্ষমতায় তিনি সার্থক হতে পারেননি। আপনার আমার কাচের শো-কেসে রাখা ভেনাস ডি-মিলো অথবা তাজমহলের মিনিয়েচার তার উদাহরণ। ঔরঙ্গাবাদে অবস্থিত ‘বিবিকা মক্‌বারা’ তাজমহলের একটি অক্ষম উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যর্থতায় দুঃখ করতে পারি, দোষারোপ নয়।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দেখা যায় শিল্পী স্বীকার করতে চান না যে, তিনি অনুকরণ করেছেন। ভঙ্গিটা নকল করে ভাব দেখান যেন মৌলিক সৃষ্টি। সাহিত্যে এর ভূঁই ভূঁই উদাহরণ আছে। কিন্তু আজকে আমাদের বিচার্য ভাস্কর্য। তাই কলকাতা শহরের দুটি ভাস্কর্য উদাহরণ হিসাবে দাখিল করি : কার্জন পার্কের দক্ষিণপ্রান্তে শিল্পী দেবীপ্রসাদকৃত রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এবং হাইকোর্ট-এর দক্ষিণপ্রান্তে রমেশচন্দ্র পালকৃত বিপ্লবী সূর্য সেন। জ্ঞাতসারে রমেশচন্দ্র দেবীপ্রসাদের মূর্তির ভঙ্গিমা অনুকরণ করেছিলেন, অথবা হিপুৱারী চক্রবর্তীর মতো অজ্ঞাতে করেছিলেন তা জানি না—কিন্তু আমরা যা পেলাম তা আপত্তিকর।

শিল্পী দেবীপ্রসাদ তাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রটুকুমতো ধরতে পেরেছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টি মূর্তি সেকথা প্রমাণ করেছে। সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মী, স্পর্ষবস্তা, নির্ভীক, সভা-মণ্ডপে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি চিরকাল বলে এসেছেন বক্তৃ-কণ্ঠে। তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় সেই দার্ঢ্যের সোচ্চার প্রকাশ। তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি বাধ্যয় : **We shall unsettle the settled fact !**

কিন্তু সূর্য সেন ?

সারাজীবনে তিনি কোন জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন বলে জানা নেই। তর্জনী হেলনে ও’ভাবে শ্রোতৃবৃন্দকে স্বমতে আনবার

চেষ্টা তিনি কোনদিন করেননি। সশস্ত্রবিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছেন মাস্টারদা, গোপন ষড়যন্ত্র করেছেন, দেশমাতৃকার বেদীমূলে হৃদপিণ্ডটি অর্ঘ্য দিতে ইচ্ছুক মুষ্টিমেয় তরুণকে কানে কানে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন—নীরবে, নিভৃতে তাদের পরিচয় সযত্নে মুছে ফেলে দিয়ে গেছেন যাবতীয় চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ থেকে। তাঁর ক্ষেত্র ভিন্ন, পদ্ধতি ভিন্ন, আদর্শ ভিন্ন ! রাষ্ট্রগুরুর ভঙ্গিমায় তাঁর অনুকরণ শিল্পগত রসভাস। এটি অক্ষম অনুকরণ।

সূর্য সেনকে কী ভাবে গড়লে ভাল হত ? সে কথা বিচার করার দায় আমাদের নয়। সে দায় শিল্পীর, যিনি ধ্যানের দৃষ্টিতে সূর্য সেনের জীবনদর্শনটি ধরবেন। এবং মন্ত্রীমশাই-এর, যিনি মূর্তির মিনিয়েচার মডেল অনুমোদন করবেন (তাকু’য়ে-প্রতিম ব্যুরোক্রাটরা এদেশে এসব বিষয়ে ‘ষড়যন্ত্রীমশাই’ হবার সুযোগ পান না)। কথাটা আরও পরিষ্কার হবে যখন আমরা রোদাঁয়ার ‘বালজাক’ নিয়ে আলোচনা করব।

এবার ‘কদর্য’ অনুকরণ !

তার একটি কলঙ্কিত দৃষ্টান্ত কলকাতা শহর বুক করে ধরে রেখেছে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ! ঐ অশ্রাব্য মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং পরেও সংবাদপত্র ও সাময়িকীতে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। মড়ার উপর নুতন করে খাঁড়ার ঘা দেওয়া অসৌজন্যের পরিচায়ক। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার একই কথা বলতে হচ্ছে; কারণ যুগ-যুগ-জিও মন্ত্রে ঐ একই জাতের হঠকারিতা চলছে, বোধকারি চলবেও ! মনুমেন্টের লাজে-রাঙা মুক থেকে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত আশ্বেদকর তার ‘মনুমেন্টাল’ উদাহরণ !

যেহেতু আউটরামের মূর্তিতে শৌর্যবীর্যের প্রকাশ শিল্প-জগতে স্বীকৃত তাই শ্যামবাজার পাঁচমাথার মূর্তির ভাস্কর তার হুবহু নকল করে বাজিমাং করতে চাইলেন ! একবারও ভেবে দেখলেন না, যুগটা পালটে গেছে। আউটরাম যে-যুগের মানুষ সে-যুগে অশ্বারোহণ ছিল বীরত্বের দ্যোতক। তাই শ্রীসুনীল পালের বাঘাযতীনে যে আপত্তি ধোপে টিকবে না, সে আপত্তিটা এ ক্ষেত্রে উঠবেই। শ্যামবাজারে খাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত তিনি 17.1.41 তারিখে ভারত ত্যাগের পর এবং 17.8.45 তারিখে ব্যাঙ্কক ত্যাগের মধ্যে কবে কোথায় সামরিক বেশে ঘোড়ায় চেপেছেন ? অসংখ্য বাহনে তাঁকে আবৃত্ত হতে হয়েছে : সিডান-বর্ড মোটর, ট্রেন, উটের পিঠ, প্লেন, জীপ, ওয়েপন



চিত্র—46 : রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ,
(দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী)



চিত্র—45 : জগৎ-বাহাদুর, কাঠমণ্ডু, নেপাল
(ফোলে'র শিষ্যকৃত)



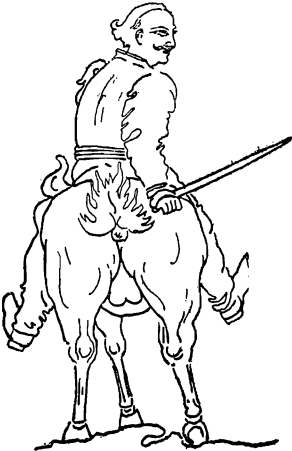
চিত্র—47 : শহীদ সূর্য সেন
(রমেশচন্দ্র পাল)



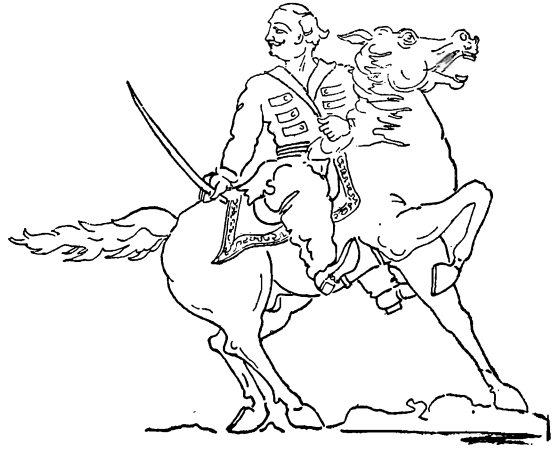
চিত্র—49A : আউটরাম (ফোলে, অশ্বের দক্ষিণ-পশ্চাদৃশ্য)



চিত্র—49B : আউটরাম (ফোলে, অশ্বের সম্মুখদৃশ্য)



চিত্র—49C : আউটরাম (ফোলে, অশ্বের পশ্চাদৃশ্য)



চিত্র—49D : আউটরাম (ফোলে, অশ্বের দক্ষিণ-সম্মুখদৃশ্য)

কোরিয়ার, ট্রাক, ফাইটার-বমার-হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক, জাহাজ, মায় সাবমেরিন ;—কিন্তু ঘোড়া ! কবে ? কোথায় ? পান-বিড়ির দোকানের ক্যালেন্ডার এবং পূর্তমন্ত্রী অথবা পৌরকর্তাদের উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া কোথায় তিনি অশ্বারূঢ় ?

পূর্বএশিয়ায় চাপেননি, তবে কলকাতায় একবার চেপেছিলেন। সংবাদপত্রে তখন কার্টুন ছাপা হয়েছিল। G.O.C-কে বলা হয়েছিল ‘গক্ !’ দুর্ভাগ্য এই হবু-কল্লোলিনী কলকাতার—পৌরকর্তাদের কল্যাণে সেই বাঙ্গাচিহ্নটিই শাস্ত হয়ে রইল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে।

কী অশ্ব, কী অশ্বরোহী—এ ভাস্কর্যের কোথাও কোন ছন্দ নেই, মাত্রা নেই। অশ্বের সম্মার্জনী-বিনিমিত লেজটি অনুকরণ-ব্যর্থতার চরম উদাহরণ। ঐ ছন্দ বা rhythm কাকে বলি ? সেটা বুঝে নিতে হলে যে-মূর্তির এটি কদর্ঘ-অনুকরণ সেই অশ্বরোহী আউটরামের দ্বারস্থ হতে হবে।

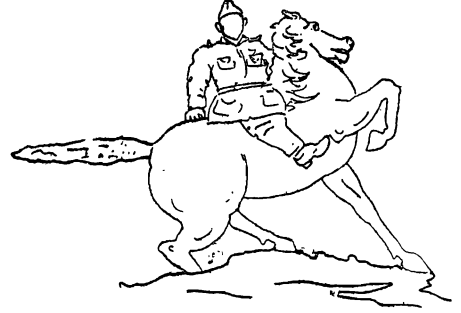
সেটি এককালে ছিল পার্ক-স্ট্রীটের মোড়ে। বর্তমানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নির্বাসিত। নিতান্ত সৌভাগ্য আমাদের—কোন অতি-উৎসাহী জাতীয়তাবাদী পূর্তমন্ত্রী ওটির ৬গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটাননি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গিয়ে মূর্তিটিকে দেখবেন—ঘুরে ফিরে দেখবেন—স্মৃটিকখণ্ডের আলোকবিচ্ছুরণের মতো এক-এক দৃষ্টিকোণ থেকে তার এক-এক আবেদন।

“ঘোড়াটিকে দেখলেই মনে হয় ভয় পেয়ে অথবা চালকের নির্দেশে সে টগবগিয়ে ছুটছে। বিশেষত লেজটি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে ডেউ খেলানো যে, দেখলেই মনে হয় ঘোড়াটি পূর্বমুহূর্তে দ্রুতবেগে ছুটছিল।...ঘোড়ার ঘাড়ের বক্রতা বা কার্ভ এবং ডান পায়ের বক্রতা বিপরীতমুখী।...অশ্বরোহী ঘোড়ার মুখের উষ্টোদিকে তাকিয়ে আছেন। এখানেও সুন্দর কণ্ট্রাস্ট।...ঐ ভাস্কর্যে একটি প্রাণচঞ্চল অশ্বারূঢ় মূর্তিকে এমন বালিষ্ঠ ও জীবন্তভাবে গতিশীল অবস্থায় দেখানো হয়েছে যে, তাকে সহজেই পৃথিবীর এ ধরণের শ্রেষ্ঠ অশ্বরোহী মূর্তি বলা যায়।” (জীবেন্দ্র কুমার গুহ ॥ সুন্দরম্ পত্রিকা ॥ আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৬৪)

মূর্তিটির কৃতিত্ব—যতি ও গতির সামঞ্জস্যবিধানে।

অনুকরণকারী মৌলিকতার অলীক দাবীতে আউটরামের মূর্তিতে কিছু অদলবদল করে তাঁর অশ্বরূঢ়কে উপস্থাপিত করলেন। আউটরাম রাশ টেনে আঙ্কনন্দিত গতিচ্ছন্দে ধাবমান অশ্বটিকে

বুখে পিছন ফিরেছেন ; অথচ ইনি পাশ ফিরেছেন। শিল্পী এই মৌলিকতাকে দেখাতে গিয়ে তাঁর এ্যানার্টমি জ্ঞানের চরম অজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখলেন। অশ্বরোহী যখন পাশ ফেরে তখন ‘টরসো’—মাজা ও বুক—অনিবার্যভাবে একটা পাক খায়। অনিবার্যভাবে টান পড়ে কয়েকটি মাংসপেশীতে (external oblique, rectus abdominis, latissimus dorsi, iliac spine প্রভৃতি)। এখানে তা খেল না। তাই মনে হচ্ছে মূর্তির ‘পেলিভিক-গার্ডল’-এ বুঝি একটা ‘য়ুনিভার্সাল



চিত্র—৪৪ : শ্যামবাজার মোড়ে অশ্বরোহীর মূর্তি

জয়েন্ট’ আছে ! তা না থাকলে কোনও মাংসপেশীতে টান না পড়ে নিম্ননাভি ও উর্ধ্ব-নাভি অংশ ওভাবে নব্বই ডিগ্রি মোড় খায়না। ‘যদ্যুৎ’ মাছি মারলে এ কেলেঙ্কারিটা হত না ! আউটরামের দক্ষিণহস্তে ছিল তরবার (বর্তমানে ভেঙে গেছে), বাঁ-হাতে ঘোড়ার লাগাম ও চাবুক। একেবারে সম্মুখ দৃশ্যে মনে হয় যেন একটি তেপাল্লা টেবিল।

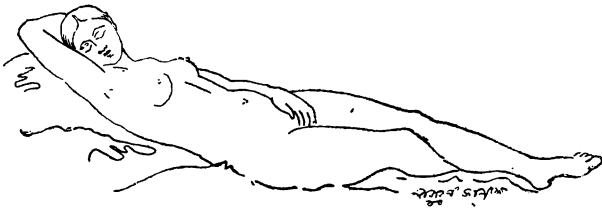
গতি সেখানে অপ্রকাশ। একটু পাশে সরে গেলেই মনে হয় অশ্ব তীর বেগে ছুটছে। আবার অশ্বের পাশে, অর্থাৎ অশ্বরোহীর সম্মুখে এলে কম্পোজিশনটি যেন গাথক ওগী-খিলানে বিধৃত একটি ঈলিপ্স বা উপবৃত্ত।

যে প্রসঙ্গে এতকথার অবতারণা আউটরামের ঐ ব্রোঞ্জ মূর্তির সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে একটি অতিব্যথাত তৈলচিত্রের। অশ্বরোহীর ভাঁজ হুবহু এক। যদিও সেখানে অশ্বের সম্মুখস্থ দুটি পা-ই ছিল শূন্য। চিত্রকর—থিওডোর গোরিকন্ট ; চিত্রটির নাম : ‘অফিসার অব দ্য ইম্পিরিয়াল গার্ড’ (1812)। আরও মজার কথা, থিওডোরের ঐ অশ্বরোহী মূর্তির সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে লুই দাভিদ-এর আঁকা ‘নেপলিয়ন’ (1800) তৈলচিত্রের। সেই বিশ্ববন্দিত তৈলচিত্রটি (Bonaparte au Mont Saint-Bernard) বর্তমানে আছে ভার্সাই সংগ্রহশালায়।

এতকথা বলছি বোঝাতে যে : থিওডোর পূর্বসূরী দাভিদ্-এর অনুকরণ করেছিলেন কিনা জানি না, করে থাকলে তা সার্থক অনুকরণ। এবং আউটরামের ভাস্কর ফোলে থিওডোর বা দাভিদ্-এর অনুকরণ করেছিলেন কিনা জানি না, করে থাকলে তাও সার্থক অনুকরণ! ব্রুক্‌স্‌ কাঠমণ্ডিতে ফোলের আউটরামের সত্ত্বান অনুকরণ করেছেন এবং সেটিও সার্থক অনুকরণ, অথচ বুঝতে অসুবিধা হয় না – পিছন ফেরা আউটরামকে পাশ ফিরিয়ে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে যা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তা অনুকরণ নয়, ‘হনুকরণ’ : aping!

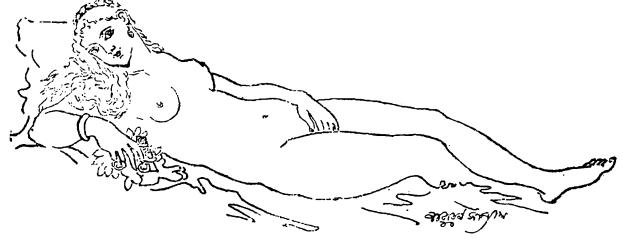
‘অনুকরণ’ ছেড়ে এবার ‘অনুসরণ’ এবং ‘ছায়াবলম্বনের’ প্রসঙ্গে আসি।

ক্ষেত্র বিশেষে কখনও কখনও শিল্পী কোনও ক্লাসিকাল চিত্রাধারাকে নূতন রূপ দিতে তাঁর সৃষ্টিকে ক্লাসিকাল আঙ্গিকে বা রসের মোড়কে মুড়ে উপস্থাপিত করেন। ব্যাখ্যার চেয়ে উদাহরণে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। নবীন সেনের ‘রৈবতক’, ‘কুরুক্ষেত্র’ ‘প্রভাস’, মহাভারতের অনুসারী; কিন্তু মাইকেলের ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য রামায়ণ-অনুসারী নয়! কী আঙ্গিকে, কী মেজাজে, কী রস-পরিবেশনে। যদিও চরিত্রগুলি এবং ঘটনা পরম্পরা সবই রামায়ণের। পাশ্চাত্য শিল্প থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। জর্জনে (1478-1510) এবং তিজিয়ানো (1477-1576) দুজনেই ভেনিসীয় চিত্রকর। জর্জনের শায়িতা ভেনাস সামান্য বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দিত! তাহলে তিজিয়ানো (টিটিয়ান) নিজের ভেনাসটি গড়তে জর্জনে-ভেনাসের ভঙ্গিটা জ্ঞাতসারে কেন নকল করলেন? একমাত্র দক্ষিণ হস্তের উপস্থাপনা ছাড়া আর সবই তো আদ্যন্ত নকল?



চিত্র—50 : নিদ্রিতা ভেনাস, জর্জনে (Giorgione 1502?)
ভঙ্গিমার ক্ষেত্রে, কম্পোজিশনে এই তথাকথিত অনুকরণটি করা হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। সেটা না করলে

তিজিয়ানোর প্রতিবাদটা সোচ্চার হত না। বস্তুটা এত জোরদার হত না। কী বস্তু? জর্জনের ভেনাস নিদ্রাগত। সে তার নগ্নতা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। অর্থাৎ শিল্পী জর্জনের ধারণায় অনাবৃত নারীদেহের সৌন্দর্য ‘অবজেক্টিভ’—সূর্যোদয়, প্রজাপতির পাখা অথবা প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো একটি দর্শনযোগ্য নান্দনিক অনুভূতির উপাদান। : তিজিয়ানো তার দৃঢ় প্রতিবাদ করতে চাইলেন। তাঁর বস্তু : ন্যূড-এর আবেদন



চিত্র—51 : সুপ্তোখিতা ভেনাস, তিজিয়ানো (Titian, 1538)

ভিন্ন জাতের। দর্শক যতটা আনন্দ পাবে দেখে, দ্রষ্টব্যও ততখানি আনন্দ পাবে দেখিয়ে। আদরস একতারায় বাজে না; বাজে খঞ্জনীতে। কে-কাকে বাজাচ্ছে ধরা যায় না। দুজনে দুজনের স্পর্শে রোমাঞ্চিততনু হলে বলব : খঞ্জনী বাজছে। দুইয়ে মিলে একের একতানই আদরসের নান্দনিক অনুভূতির আদিকথা। শিল্পী তখনই সার্থক যখন সৃষ্টি-শিল্প বলবে, “মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে, তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।” এই তত্ত্বটিকে উদঘাটিত করতে তিজিয়ানো জর্জনে-ভেনাস-এর অনুসরণ করলেন; শুধু আঁখি পল্লব দুটি উন্মোচিত করে দিলেন। এটুকু পার্থক্য যেন সোচ্চারে বলল, সৃষ্টিমগ্না ভেনাস তখনই সার্থক যখন সুপ্তোখিতা হয়ে সে নিজেকে

প্রশ্ন করবে; “কে পরালে মালা?”

আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি রোদ্যা ক্লাসিকাল বিষয়বস্তুকে নিয়ে সমকালীন চিত্রাধারায় কী ভাবে তাদের নবরূপায়ণ করেছেন। রোদ্যার অরফিউস্‌, ক্যারিয়াটিড, প্রডিগাল সান, জন, ঈভ, ইত্যাদি এ-জাতের উদাহরণ। নরকের দ্বারেও রোদ্যা দাস্তের নবরূপায়ণ চেয়েছিলেন। অনুকরণ, অনুসরণ বা ছায়াবলম্বন নয়—‘penumbra-অবলম্বন’।

চ

কামীল ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে উঠছে। তার দাবী— মারী-রোজকে একটা পেনশনের ব্যবস্থা করে বিদায় দিতে হবে এবং কামীলকে 'মাদাম রোদ্যা' উপাধিতে ভূষিতা করতে হবে। অগুস্ত্ প্রস্তাবটার আধাআধি মেনে নিয়েছে। পারীর উপকণ্ঠে—প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে ম্যুদঁ-শহরতলীতে বেলভু নামে একটি বাগানবাড়ি কিনে মারী রোজকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পুরানো দিনের ভাস্কর্যগুলিও সেখানে স্থানান্তরিত করেছে। মারী-রোজ আপত্তি করেনি। এমনিতেই তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ; ডাক্তারে বলেছে মুক্ত আবহাওয়ায় তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে। আসলে তা নয়, অনিবার্য নিয়তিকে যখন রোখা যাবে না তখন দূরে সরে যাওয়াই তো মঙ্গল। কামীলের প্রেমে বিভোর অগুস্তের চোখের সামনে হামে-হাল হাজির থাকারই বা কী সার্থকতা ?

ওদিকে পোঁতি অগুস্ত্ সেনাবিভাগের নিয়মানুবর্তিতায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনি ! ফিরে এসেছে। স্টুডিওতে যোগদান করেনি তা বলে। মাঝে মাঝে গোপনে এসে মেরী-রোজ-এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায়। তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পাথেয়।

মেরী-রোজকে চোখের আড়ালে পাঠালো বটে কিন্তু কামীলকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হল না অগুস্ত্। ফলে কামীল অভিমান করে আছে।

তাকুঁয়ে মামলার ভয় দেখিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মামলা দায়ের করতে সাহস পেল না লালিতকলা বিভাগ। হেতুটা বিচিত্র। 1889 সালের বসন্তকালে অগুস্ত্ আর 'মনে' একটি যৌথ

প্রদর্শনীর আয়োজন করল 'এক্সপো' মণ্ডপের অনতিদূরে— পারীর জর্জেস্ পোঁতি গ্যালারিতে। রুদ মনের সত্তরটি চিত্র আর অগুস্ত্ রোদ্যার ছত্রিশটি ভাস্কর্যের যৌথ প্রদর্শনী। আশ্চর্য ! সারা পৃথিবী ভেঙে পড়ল সেই প্রদর্শনী দেখতে। যারা এক্সপো দেখতে আসে তারা প্রথমেই খোঁজ করে : মনে-রোদ্যা প্যাভেলিয়ানটা কোথায় ?

উদ্বোধনের দিন সে কী ভীড় ! দেশী-বিদেশী শিল্পীর কেউ আর বাকি নেই। এদগার দেগা, পল সেজান, অগুস্ত্ রেনোয়ার্, কামীল পিসারো, ব্যুশে, দ্রোলে, ম্যালার্মে, জোলা—কে নয় ? অস্বজেন গ্যলোম এখনও বোয়া-আর্ৎ-এর ডিরেক্টর ; তিনি এলেন ক্লিমসো-কে সঙ্গে নিয়ে। ক্লিমসো তখনও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হননি ; কিন্তু সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনীতিক হয়েছেন। লালিতকলা মন্ত্রী আন্তোনি প্রুস্ত্ এবং তাঁর লেজুড় হিসাবে বিভাগীয় আগার সেক্রেটারি তাকুঁয়েও এসেছেন। এসেছেন মাদোঁলিন ব্যুফে এবং আনাতোল ফ্রাঁস। হঠাৎ কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এসে বাড়ির ছাদে ফ্ল্যাগ্‌স্টাফে ফ্রান্সের তেরঙা-ঝাঙাটাকে খাটাতে থাকে। কী ব্যাপার ? ব্যাপার গুরুতর : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আসছেন প্রদর্শনী দেখতে এবং তাঁর সঙ্গে আসছেন ইংলণ্ডের এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্—তখন সাতচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় যুবরাজ। মনে-অগুস্ত্ উচ্ছ্বসিত। ওদের প্রদর্শনী যে এতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে তা ওরা নিজেরাই ভাবেনি। প্রসঙ্গত, উদ্বোধনের শুবলগ্নে দুজন অনুপস্থিত : মেরী-রোজ ব্যুরে এবং কামীল ক্লদেল। প্রথমজন অনিমন্ত্রিত, দিন গুজরান করছে ম্যুদঁ গাঁয়ে ; দ্বিতীয়-জন অভিমানে।

দেখ-দেখ করতে করতে ছয় ঘোড়ার স্টেট-ক্যারেজ এসে থামল প্রদর্শনীর দোর গোড়ায়। ভীড় দুপাশে ফাঁক হয়ে গেল। প্রিন্স অব ওয়েলসকে নিয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সাদী কার্নো গ্র্যাণ্ড-স্টেয়ার্স দিয়ে উঠে এলেন। অয়াজন গ্যালোম বয়ঃ-জ্যেষ্ঠ এবং পারীর শ্রেষ্ঠ শিম্পবিদ্যালয় বো-আর্ৎ-এর (বোধকরি গ্যালোমের স্মরণে নেই—অগুস্ত তিনবার পরীক্ষা দিয়েও সে শিম্পপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকার পায়নি) ডিরেক্টর। সে এগিয়ে এসে দুই মহান শিম্পী—রোদ্যাঁ আর ‘মনে’-কে পরিচয় করিয়ে দিল। দুজনে করমর্দন করল রাষ্ট্রপতি ও যুবরাজের সঙ্গে। রাষ্ট্রপতি কোঁতুক করে বললেন, শুনোছি তোমরা দুজনে নাকি সরকারী এক্সপোর ভীড় পাংলা করে ছেড়েছ? তাই সরেজমিনে তদন্ত করতে এসেছি। কই, কী সব ঐঁকেছ আর গড়েছ আমাকে দেখাও; ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।

যুবরাজ এডওয়ার্ড চমৎকার ফ্রেণ্ড বলতে পারেন। যোগ করেন, ভুল বুঝবেন না আমাদের। আপনাদের দীর্ঘ সময় নিয়ে গড়া শিম্পসম্পদ আমরা স্বপ্ন সময়ে দেখে নিতে বাধ্য হচ্ছি। সেজন্যই আপনাদের সাহায্য চাইছি। না হলে আমরাও বুঝি, ব্যাখ্যায় শিম্পের রসাতাস ঘটে।

সাদী কার্নো রসিক ব্যক্তি। বলেন, বিলক্ষণ! সময়ের খামতি হয়েছে বলেই না সাহায্য চাওয়া? নইলে—রাজনীতির কারাবারে চুলদাড়ি পাকালুম আমরা, শিম্প বুঝি না? কোন আহাম্মক বলছে দেখিয়ে দাও—এখনই তার গর্দানা নেব।

হাস্য পরিহাসে প্রদর্শনীকক্ষ সরগরম হয়ে ওঠে।

ঘুরতে ঘুরতে ওঁরা উপস্থিত হলেন ক্যালের ছয়জন নাগরিকের সম্মুখে। মূর্তিগুলি অনেকদিন শেষ হয়েছে; কিন্তু ছয়-ছয়টা মূর্তির ঢালাই-এর খরচ যোগাড় হয়নি বলে ক্যাল-নগরানগম মূর্তিগুলি এখনও ডেলভারি নেননি। প্রেসিডেন্ট দীর্ঘসময় মূর্তিগুলি দেখলেন। প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর উচ্ছ্বাসিত হয়ে বললেন, ম্যাগ্নিফিক! ক্যালের নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবে!

অগুস্ত এ সুযোগ ছাড়ল না। বললে, মস্যুয়ে প্রেসিডেন্স! সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। ক্যালের নগরপালককে বহুবার তাগাদা দিয়েছি; কিন্তু মূর্তিগুলি তিনি ডেলভারি নেননি।

—সে কি! কেন?

—ঠিক জানি না। বোধকরি অর্থাভাবে।

ইংলণ্ডের যুবরাজের সম্মুখে এ-কথা বলায় বোধকরি একটু আহত হলেন সাদী। বললেন, ঠিক আছে। আমি দেখব। চিরবসন্ত, আদম-ঈভ, দানেন্দ, চণ্ডলা প্রেম, চিন্তা, উষা প্রভৃতি খুবই প্রশংসিত হল। কিন্তু ওঁরা আবার ধাক্কা খেলেন স্যুগোর সামনে এসে।

ক্লিমসো বললেন, এ-শিম্প ফ্রান্সের মহান ঐতিহ্যের অপমান! স্যুগো আজকের ফ্রান্সে একজন ডোমি-গড। তিনি ন্যুড? অগুস্ত একটা বাও করে বললে, যেমন এ্যাপোলো ছিলেন মহান গ্রীসের একজন ডোমি-গড! তিনি ন্যুড।

—এটা গ্রীস নয়। ফ্রান্স!

—আজ্ঞে না। এটা দেশ-কালের বন্ধনমুক্ত শিম্প। ভাস্কর্য। জবাবে কী একটা কথা বললেন প্রেসিডেন্ট। সেটা অগুস্তের কানে গেল না। কারণ সেই মুহূর্তে সে তাকিয়েছিল প্রবেশ-দ্বারের দিকে। হঠাৎ দু-হাতে দুই অতি সম্মানিত অতিথিকে সরিয়ে সে প্রেসিডেন্ট আর যুবরাজের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল প্রবেশদ্বারের দিকে। ওর এই অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে সবাই স্তম্ভিত।

এক অতিবৃদ্ধ ল্যাঠ ঠুক ঠুক করতে করতে তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। অগুস্ত দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাতখানা ধরল। দুজনে কী কথা হল শোনা গেল না। অগুস্ত হাত তুলে প্রেসিডেন্ট আর যুবরাজকে দেখালো। বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ওঁদের দুজনকে যোঁথ অভিবাদন করে বললেন, ছাত্রের অসৌজন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। আমার নাম ওরেস্ লেকক্ দ্য বোয়াবোদ্রান।

প্রেসিডেন্ট তাঁর করমর্দন করে বললেন, আপনার দান ফ্রান্স কোনদিন ভুলবে না।

—আমার দান?

—নয়? অগুস্ত রোদ্যাঁ যা গড়েছেন তা অনবদ্য; কিন্তু আপনি যে অগুস্ত রোদ্যাঁকে গড়েছেন!

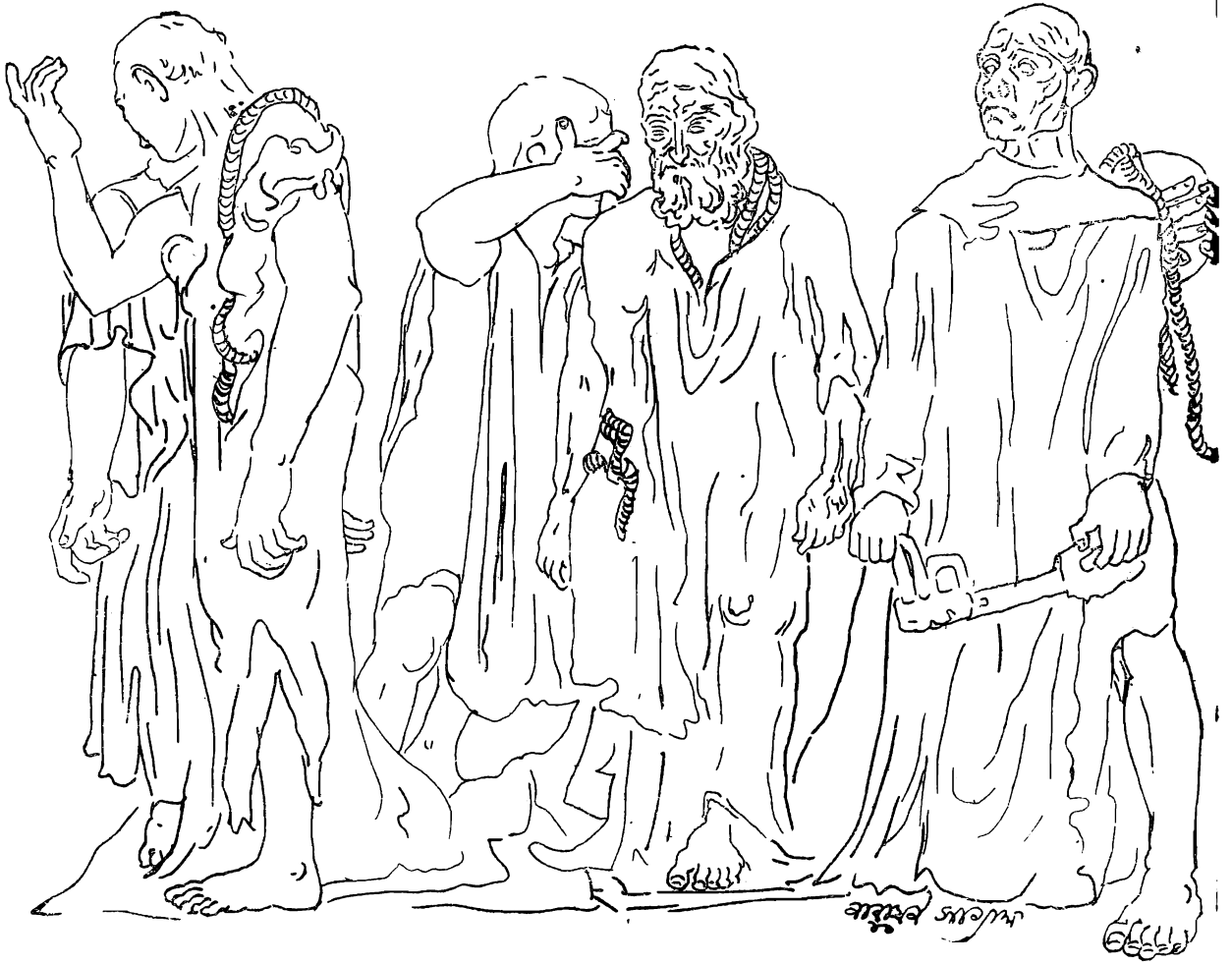
লেকক্ পুনরায় ‘কার্টিস বাও’ করলেন।

—কত বয়স হল মস্যুয়ে লেকক্?

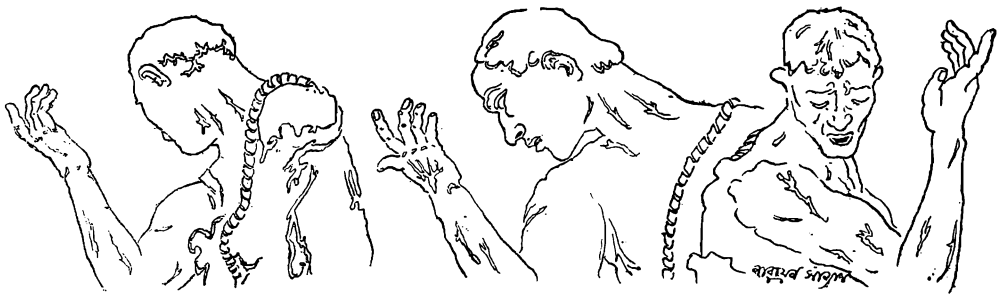
—স্যুগো আর আমি সমবয়সী। তার মানে সাতাশী।

—এবং তার মানে শতবার্ষিকীর জন্য আমাদের আরও তের বছর অপেক্ষা করতে হবে?

—যদি না তিজিয়ানোর মত নিরানব্বইয়ের শেষ লেংথে হুঁচট খাই!



চিত্র-52 : ক্যালের নাগরিকবৃন্দ (1884-86)



চিত্র-53 : Pierre de Wissar (চিত্র-52-তে ডানহাত তোলা মূর্তিটি)

এই প্রদর্শনীর পরেই ফরাসী সরকার শিল্পী হিসাবে রোদ্যাকে দিলেন এক মহা সম্মান, যা পেয়েছিলেন এদুয়াদ্ মানে, মৃত্যুর ঠিক আগেই : ক্যাভেলিয়ে দে লা লিজিঅঁ দ'অনর।

তা নিয়েও বিরোধ। যে হেতু অগুস্তের কুর্তায় সেটি শেলাই করে এ'টে দিল মেরী-রোজ। এই একটি বিদ্যায় সে সকলকলাপারক্ৰমা কামীলের উপর টেকা দিতে পারে। ফলে কামীল সে সম্মান-ভোজসভায় এল না।

এই সম্মানপ্রাপ্তির মাস খানেক আগে নান্নিসিতে চিত্রকর ক্লদ লরেন-এর মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট সাদী কার্ণো।

পরের বছর, 1893 সালে, সোসাইটি নাশনাল দে ব্যো-আৎ-এর ভাস্কর্য বিভাগের অনারারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হল অগুস্ত্। দুবার দুর্গেশ দুমা—যিনি ব্যো-আৎ-স্-এর দ্বারে খাড়া ছিলেন ওর কৈশোর কালে, এবার প্রতিবাদ করতে পারলেন না। এতদিনে তিনি কবরের তলায়।

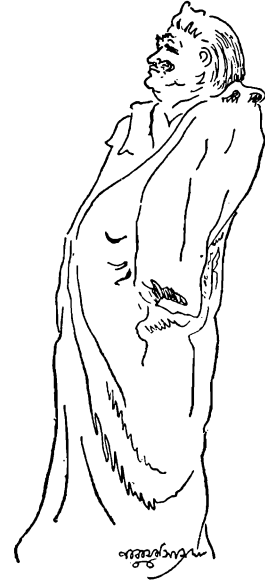


চিত্র—54 : Jean d'Aire (চিত্র-52-তে চাবি-হাতে
আঁদের পিছনে মাথায়-হাত দেওয়া মূর্তিটি)

আরও দু-বছর পরে, 3. 6. 1895 তারিখে ক্যালের 'পালে দ রিশল্যু' প্রাসাদের সম্মুখে ক্যালের ছয়জন শহীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

বালজাকের মূর্তিটি কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হল। এমন মূর্তি ওরা চায়নি। এটা কি একটা মূর্তি হয়েছে? সামনে থেকে 'স্নো-ম্যান', পাশ থেকে সীলমাছ আর পিছন থেকে কাটা ওক-গাছের গুঁড়ি! বালজাক কোথায়? ওর হাত দুটো নেই কেন? বালজাক কি পা দিয়ে লিখতেন? এত এত খরচ করছে কি শুধু একটা পাশ-বালিশের খোল বানাতে? আর ঐ ভুঁড়িটা? পোয়াতি বালজাকের খালাস হতে আর ক'মাস?

অগুস্ত্ মূর্তিটা ফিরিয়ে নিয়ে এল। অগ্রিম যা নিয়েছিল সুদ সমেত ফিরিয়ে দিল। ম্যালার্মে আর ব্যুশে এল ওকে সমবেদনা জানাতে। অগুস্ত্ এক কথায় ওদের থামিয়ে দিল। বললে, মূখগুলো জানে না—কী পরিশ্রম আমি করেছি বালজাককে ধ্যানের দৃষ্টিতে ধরতে। সর্বসমেত আঠারোটা মূর্তি আমি গড়েছি বালজাকের। বাকি সতেরটা আমার স্টুডিওতে। বালজাকের ন্যুড-ও গড়েছি। বালজাকের দাঁজকে আমি খুঁজে বার করেছিলাম, লোকটার বয়স আশীর ওপারে। বালজাকের দেহের মাপ সেই দাঁজর কাছ থেকে সংগ্রহ করা। ওঁর উচ্চতা, বুক, পেট, কলার-এর মাপ এক মিলিমিটার এদিক-ওদিক হয়নি। কিন্তু তাঁর দেহটা নয়, আমি ধরতে চেয়েছিলাম তাঁর আত্মাকে। শিল্প যদি সামান্যও বুঝে থাকি, তবে বিশ্বাস কর, আমি তা ধরতে পেরেছি। বাড়ি ফিরে ডায়েরিতে লিখে রেখ—রোদ্যার নিজস্ব মতে বালজাক তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি!



চিত্র—55 : বালজাক, দণ্ডায়মান (1897)

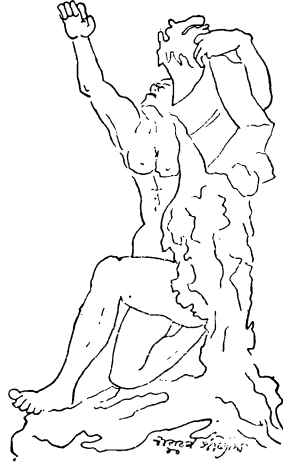
পরের সপ্তাহে ইতালি থেকে একটা ছোট্ট চিঠি পেল ডাকে : প্রিয় অগুস্ত্,

আমার ত্রয়োদশতম উপন্যাস Germination (অঙ্কুর) প্রকাশ মাত্র ফ্রান্সের তা-বড় তা-বড় পণ্ডিত উঠে পড়ে লেগেছেন বইটাকে বাজেয়াপ্ত করানোর জন্য। বইটাতে আমি দেখিয়েছি

মিলমালিকদের অত্যাচার আর ব্যাভিচারের দৃশ্য। ফ্রান্স
নির্মম সত্যটা সহ্য করতে পারছে না। হয়তো শীঘ্রই বইটা
বাজেয়াপ্ত হবে। তাই দ্রুতগতিতে লিখে চলছি চতুর্দশতম
উপন্যাস : The Earth (মাটি)। তাতে দেখাব, জমি
মালিকদের অত্যাচার আর ব্যাভিচারের দৃশ্য। আগেরটা

বাজেয়াপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তো এটাকে নতুন করে বাজেয়াপ্ত
হবার জন্য প্রকাশ করতে হবে ! এতকথা লিখছি জানতে—
বালজাক প্রত্যাখ্যাত হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি কী ভাস্কর্য ধরেছ ?
এখন তো তুমি আর ‘পাকে-চক্রে বিদ্রোহী’ নও !

এমিল জোলা ॥”





রোদ্যার মতে বালজাক তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ; সমালোচকদের মতে বালজাক সবচেয়ে বিতর্কিত শিল্পী। মূর্তিটি শিল্পজগতে অনেক পরে স্বীকৃতি পায়। রোদ্য্য এখানে বালজাকের আত্মাকে—সমকালীন ফরাসী সমাজ সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বালজাকের অবদানের মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন—আলেকজান্ডার দুমার ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ভিক্টর য়ুগোর রোমাণ্টিক বাতাবরণে বালজাক হচ্ছেন নূতন ভাবধারার ভগীরথ। তাঁর থেকেই জন্ম নিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর নূতন মূল্যবোধ—সামাজিক অবক্ষয়কে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা, তার বীভৎস নগ্নরূপ সমাজের সামনে হাজির করা। যে ধারায় পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছিলেন এমিল জোলা, ফ্লবেরার, ম্যলার্মে, বোদলের, মোপাসাঁ এমনকি তারও পরবর্তীকালে আঁদ্রে জিদ্। বালজাককে সমকাল বুঝতে পারেনি—তিনি যেন একটা ‘আইসবার্গ’ তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিভার সাতভাগের একভাগ মাত্র পরিদৃশ্যমান। আলোচ্য মূর্তিতে তাই বালজাককে শিল্পী একটা গাউন পরিয়ে দিয়েছেন। বালজাকের হাত পা-বুক-পেট দেখানোর কোনও প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। সেই রহস্যময় অজ্ঞাত দেহাকৃতির উপর সাতের-এক ভগ্নাংশে মুখটুকু মাত্র জেগে আছে! তাঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটি ম্যাজেস্টিক—রাজকীয়!

শ্রী চিন্তামণি কর তাঁর ‘স্মৃতিচিহ্নিত’তে (প্রথম সংস্করণ পৃঃ ২৩) বলছেন, “অদূরে রোদ্য্য-কৃত বালজাক-এর বিখ্যাত বিরাট মূর্তিটি দেখা যাচ্ছিল। এই অদ্ভুত বিকটদর্শন মূর্তিটি সকলের মনে প্রথমে শিল্পীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ

জাগায়। মনে প্রশ্ন আসে,—বালজাককে এমন অদ্ভুত করে সৃষ্টি করার কারণ কী? ঠিক এই একই প্রশ্ন ওঠাতে, যাঁরা এই মূর্তিটি শিল্পীকে গড়তে দিয়েছিলেন, তাঁরা গ্রহণের অযোগ্য বলে এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রোদ্য্য যে দৃষ্টিতে বালজাককে দেখেছেন তার সঙ্গে পরিচিত হলে মূর্তিটি আর এত অদ্ভুত লাগবে না। বালজাক রোদ্য্যর কাছে মস্তিস্ক-সর্বস্ব লোক। তাঁর লেখার ওজস্বিতা এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। মূর্তিটিকে একটি ড্রেসিং গাউন দিয়ে গলা পর্যন্ত আবৃত করে দেওয়ায় লক্ষ্য পড়ে কেবল মুখের উপর! যেন বিরাট একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর তার মাথাটি মিশরীয় স্ফিংসের ন্যায় মহনীয়ভাবে উন্নত।”

শিল্পী পরিতোষ সেন বালজাক-প্রসঙ্গে বলছেন (প্রতিক্ষণ ২. ৭. ৮৩ পৃঃ ৭৫) “বুলেভার্ড মৌপারনাম এবং রাসপাই-র সন্ধিস্থলে এক বিরাট রোজের মূর্তি প্রায় আট-দশ ফুট উঁচু বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। রোদ্য্য কৃত বিখ্যাত বালজাক-এর মূর্তি। বিকালের মোলায়েম সোনালী রোদ মূর্তিটির মাথায় পড়েছে। বারিক অবয়ব রূপোলী ছায়ায় ঢাকা। ঘাড়-অঙ্গি কাঁকড়া চুলওয়ালা অত্যন্ত ক্ষমতাবান পুরুষের মুখমণ্ডলটি এক বিরাট প্রতিভার এবং দানবীয় শক্তির আধার হয়ে চেষ্টানাট বৃক্ষের সারির পটভূমিকায় বিজয় গোরবে মাথা তুলে আছে। রোদ্য্যর চোখে বালজাক শুধু এক বিরাট স্বাধীন চিন্তাশীল লেখকই নন, তিনি তাঁর চেতনায় তামাম বিশ্বসংসারকে এক বিশেষ মননের সূত্রে রেখেছিলেন বেঁধে। পক্ষান্তরে, যে ভাষ্যময় সমস্যাটির সুরাহা রোদ্য্য করতে চেয়েছিলেন, এ মূর্তিটিতে সেটি হল এই যে, বালজাকের মতো এক প্রয়াত

জাতীয় সাহিত্যিক বীরপুরুষকে সাধারণের দরবারে একটি জলজ্যান্ত মানুষের আকারে হাজির করা। এবং সেটি তাঁকে করতে হয়েছে নিছক শারীরিক ভাষায় এবং যাতে করে ফুটে উঠেছে লেখকের ব্যক্তিগত অতি-আনন্দবাদ (hedonistic) দর্শন। বালজাক ছিলেন বেঁটেখাটো মোটোসোটা, ভুঁড়িওয়া লা লোক। তা সত্ত্বেও, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বলশালী মুখমণ্ডল এক দানবীয় শক্তির আধার—তবু তাঁকে অতিমানব বানাবার কোন চেষ্টা এই অসাধারণ ভাস্কর্যটিকে দুষ্ট করেনি। যেমনটি করছি আমরা রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, নেতাজী এবং আরো অনেকের ক্ষেত্রে।”

এ ভাস্কর্যের সার্থকতা ওখানেই। বালজাকের যে ভাবমূর্তি তা এখানে বিধৃত।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে :

আট-দশ-পনের বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় দু-তিন দিনে একটি ‘ফিচার’ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী প্রখ্যাত ভাস্কর রামকিষ্কর বেজকে কলকাতার রাস্তায় মূর্তিগুলি ঘুরিয়ে দেখান এবং ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় একটা ইন্টারভু নেন। হাইকোর্টের দক্ষিণদিকে প্রতিষ্ঠিত শহীদ স্কুদিরামের মূর্তিটি দেখে রামকিষ্কর নাকি বলেন, ‘আমি হলে ওর হাতে একটা বোমা দিয়ে দিতাম।’

তথ্যটি লিপিবদ্ধ করছি সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর। তারিখ বলতে পারব না, কাটিংও রাখিনি। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত ভাস্করের ঐ

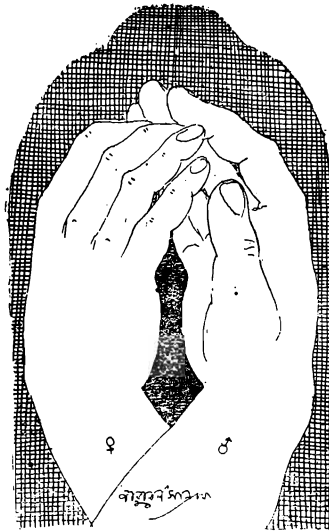
উষ্টিটি আমাকে এতই আঘাত দেয় যে, আজ এতবছর পরেও দৈনিকে প্রকাশিত ঐ একটি মাত্র পংক্তির বেদনাকে আমি ভুলতে পারিনি !

আমার তো মনে হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর পথভাস্কর্যের মধ্যে স্কুদিরাম একটি বিরল উদাহরণ যা অনবদ্য ও সার্থক। বোমা ছোঁড়ার জন্য স্কুদিরামকে আমরা মনে রাখিনি—বোমা-পেটো তো আজও পাড়ায় পাড়ায় ছুঁড়ছে কিশোর তরুণেরা তথাকথিত ‘দাদা’দের নির্দেশে ! স্কুদিরামকে আমরা মনে রেখেছি তার মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস আর দেশপ্রেমের জন্য—ফাঁসির দড়ির দিকে নির্ভয়ে গলা বাড়িয়ে দেবার জন্য। স্কুদিরামের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এদেশের আকাশে বাতাসে ভাসছে একটা গানের কলি : ‘বিদায় দে মা, একবার ঘুরে আসি।’

ভাস্কর শ্রী তাপস দত্ত যদি মূর্তিটার হাতে হ্যাণ্ডকাফের বদলে বোমা দিতেন তাহলে আমার মতে, সেই গানের রেশটা হারিয়ে যেত ; মনে পড়ত শুধু মারাত্মক ভুলটাই ‘বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম ইংল্যান্ডবাসী।’

তাপস দত্ত সে ভুল করেননি। তাই মূর্তিটির মধ্যে অনুরাগিত হয় সেই মৃত্যুঞ্জয়ী পংক্তিটা—দশমাস দশদিন পরে মাসির কোলে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি।

পথভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আঙ্গিক সৌসাদৃশ্যের চেয়েও বড় কথা চরিত্রটির ভাবমূর্তির সার্থক ও সঠিক রূপায়ণ।



ছ

এরপর বেলজিয়াম ও হল্যান্ডে অগুস্তের শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হল। রাজকীয় মর্যাদায় ঐ দুটি দেশ অগুস্তকে নিমন্ত্রণ করল। সুযোগ বুঝে

কামীলও পেশ করল তার চরমপন্থ। এই অভিযানে সেও সহযাত্রী হতে চায়। অগুস্ত-এর ছাত্রী, মডেল বা মিস্ট্রেস হিসাবে নয়, মাদাম রোদ্যার পরিচয়ে। আশা করোঁছিল, মেরী রোজ যখন বিতারিত তখন এবার অগুস্ত রাজি হয়ে যাবে। হল না। সে বিবাহ করবে না, সে সংসার চায় না, সন্তান চায় না—

—তাহলে আমাকে এতদিন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন কেন ?

—মিথ্যা আশ্বাস ! কবে আশ্বাস কথা দিয়েছি যে, তোমাকে বিবাহ করব ?

—তোমার আচরণই সে কথা বলেছে !

—আর মেরী-রোজ বুঝে ?

—চুলোয় যাক্ সে ! আমরা তোমার-আমার সম্পর্কের কথা বলছি !

অগুস্ত শেষের কবিতা পড়েন। তখনও লেখাই হয়নি সেটা। তবু ওর মনে পড়ল গাঁয়ের বাড়িতে প্রতীক্ষা করে আছে যে যোবনোত্তীর্ণ মেয়েটি—সকালসাবে যে ঝাড়পোঁছ করছে তার মূর্তিগুলির—তার কথা।

: যে আমাকে দেখিবারে পায় অসীম ক্ষমায়, ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি...

অগুস্ত বললে, আমার ছাত্রীর পরিচয়ে যদি সঙ্গে যেতে চাও তাহলে তৈরী হয় নাও। নচেৎ এখানেই প্রতীক্ষা কর আমার জন্য।

—না। আর অপেক্ষা নয়। শিল্প-শিক্ষার্থী হিসাবে এসেছিলাম। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার। এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

—পাগলামি কর না কামীল !

—পাগলামি ! পাগল এখনও হইনি। যদি কোনদিন হই তবে জেন, তুমিই সে জন্য দায়ী !

সব বন্ধন ছিন্ন করে কামীল চলে গেল একলা চলার পথে।

1900 ; বিংশ শতাব্দীর আগমনী গাইতে ফ্রান্স আবার একটি অতি বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে—‘এক্সপোজিশন যুনিভার্সেল’ বা সংক্ষেপে ‘এক্সপো।’ অগুস্ত আবেদন করল প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের কাছে, ভাল একটা প্লট চেয়ে। সে তার স্টল বানাবে। ললিতকলা বিভাগ নেড়া নন—যে বারে বারে যাবেন বেলতলায় ! গতবার, 1889-এ প্রদর্শনীর সরকারী-স্টলের জৌলুষ স্নান হয়ে গিয়েছিল রোদ্যা-মনের বেসরকারী যোঁথ আক্রমণে। এবার তাই রোদ্যাকে ওঁরা দিতে চাইলেন ছোট্ট একটি স্টল—প্রদর্শনীর একান্তে। অগুস্ত বুঝল সবই। রাজি হল না সেই স্টলটা নিতে। পরিবর্তে প্লেস দে ল্য’লমা-র ফাঁকা মাঠে অগুস্ত গড়ে তুলল পৃথক একটি প্যাভেলিয়ান। ডোরিক কলাম আর এণ্টারেচার—গ্রীক স্থাপত্যের বহিরাবরণ। জায়গাটা মনোরম, সেন-এর ধারে, প্লেস দে লা কঁকদের কাছাকাছি। আশী হাজার ফ্রাঁ খরচ হল প্যাভেলিয়ানটি বানাতে—তার ভিতর ষাট হাজার ফ্রাঁ ধার দিল ব্যাঙ্ক। মাথার চুল পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হল অগুস্তকে। এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলে—মূর্তিগুলি বিক্রয় না

হলে—দেনার দায়ে তাকে দেউলিয়া হতে হবে। তা হোক—
অগুস্ত্ মরণপণ একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে। মেরী-রোজ
মুদ্রতে, কামীল চলে গেছে, তবে ওর শিক্ষার্থীরা আছে
সাহায্য করতে।

এবার তার একক প্রদর্শনী। সর্বসাকুল্যে একশ একাত্তরটি
ভাস্কর্য।

আশ্চর্য! এবারও তার প্রদর্শনী অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করল।
ডেনমার্কের রাজপ্রতিনিধি একাই আশী হাজার ফ্রাঁ-র ভাস্কর্য
ক্রয় করলেন—জানালেন, কোপেনহেগেন সংগ্রহশালায় এজন্য
পৃথক একটি রোদ্যা-কক্ষ নির্মাণ করা হচ্ছে। মার্কিন
যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়া সংগ্রহশালা ক্রয় করল ‘থট’;
আর শিকাগো কিনল ‘দ্য কিস্।’ এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন
সংগ্রহশালা থেকে নানান অর্ডার পেল : বুদাপেস্ট, ড্রেসডেন,
প্রাগ ও লণ্ডন।

ধনবানদের মধ্যেও অরিজিনাল রোদ্যা সংগ্রহের একটা হিড়িক
পড়ে গেল যেন। এত অর্ডার আসছে, এত ভাষায় আসছে
যে, কী-ভাবে সরবরাহ করবে ভেবে পায় না। প্রদর্শনী
দেখতে এলেন যুরোপের বিশিষ্ট সব দর্শক। রাশিয়ার
দ্বিতীয় জার নিকোলাস; ইংলণ্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ড, প্রিন্স
অব্ ওয়েল্‌স্; ফ্রান্সের নবীন রাষ্ট্রপতি লোবে। যুবরাজ
অর্ডার দিয়ে গেলেন এক কপি ‘জন দ্য ব্যাপতিস্ট’-এর।
সাউথ কেন্টসিংটন (বর্তমান নাম ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট)
সংগ্রহশালার জন্য। এ বিশ্বমেলায় দুজন বাঙালীও উপস্থিত
ছিলেন তাঁদের রচনায় কিন্তু রোদ্যার উল্লেখ পাইনি : স্বামী
বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশচন্দ্র।

এলেন না শুধু একজন। ওরেস লেকক্। একদিন সন্ধ্যায়
অগুস্ত্ নিজেই গেল তাঁর স্টুডিওতে। শুনল, লেকক প্রয়াত
হয়েছেন কয়েক মাস আগে। খবরের কাগজে হয়তো
সংবাদটা ছাপা হয়েছে, হয়তো হয়নি। ও কাগজ পড়ে না।

অগুস্ত্ এখন পারীর বাসিন্দা। কামীল সরে গেছে ওর জীবন
থেকে। মেরী-রোজ মুদ্রতে একাই থাকে। পেতি-অগুস্ত্
মাঝে মাঝে সেখানে হানা দেয়। টাকা পয়সা যা পারে হাতিয়ে
আবার কয়েক মাসের জন্য গা-ঢাকা দেয়। পুরোপুরি
বোহিমিয়ান।

একদিন কাফেতে আহারাতি সেরে বের হয়ে আসছে হঠাৎ

একটি বৃদ্ধ মাথার টুপিটা খুলে ওকে সসন্ত্রম অভিবাদন করল;
মস্যুয়ে রোদ্যা, আমাকে চিনতে পারেন? অগুস্ত্ ওকে
আপাদমন্তক দেখে নিল একবার। ময়লা বেশবাস—প্যাণ্টলুন,
তাম্বি মারা জুতোর ভিতর থেকে বুড়ো-আঙুলটা উঁকি দিচ্ছে।
মাথা নেড়ে বলল, না।

—আমি বানু’ভ্যা!

—বানু’ভ্যা! কে বানু’ভ্যা? কোথায় আমাকে দেখেছেন
বলুন তো?

বৃদ্ধ হাসল। বলল, মনে না থাকারই কথা। আপনি
আমার হাত ধরেই একদিন পেতি একোলে ভর্তি হতে
গিয়েছিলেন—মস্যুয়ে লেককের—

—তুমি বানু’ভ্যা! তবে তখন থেকে ‘আপনি’, ‘মস্যুয়ে’
বলছ কেন?

—তুমি এখন কত বড়! তাছাড়া তোমার ছোড়াঁদের প্রতি যে
অন্যায়...

—সে সব পুরানো কথা থাক বানু’ভ্যা। তুমি কী করছ
বল? ছবি আঁক?

হাসল শিম্পী। বলে, না ছবি নয়, পোস্টার। তবে
আমি কিন্তু ব্যু-আর্’স থেকে ডিগ্রি নিয়েই পাশ করেছিলাম!
তুমি আমাদের গর্ব! সবাইকে বলি অগুস্ত্ রোদ্যা আমার
বাল্যবন্ধু! ওরা বিশ্বাস করে না।

অগুস্ত্ ঐ বৃদ্ধের ভিতর সেই হারানো বানু’ভ্যাকে একটুও
খুঁজে পাচ্ছিল না। তার একটা জরুরী কাজও ছিল। বললে,
কিছু মনে কর না বানু’ভ্যা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।
তুমি কি আমার কাছে গোটা পঞ্চাশ ফ্রাঁ ধার নেবে?

আবার হাসল বানু’ভ্যা। বললে, নেব। কিন্তু তুমি আমার
একটা উপকার করবে বন্ধু?

অগুস্ত্ সতর্ক হয়। কী না-জানি চেয়ে বসে বানু’ভ্যা। সে
কিন্তু তেমন কিছু চাইল না। বললে, যে ভদ্র কায়দায় তুমি
আমাকে আজ পঞ্চাশ ফ্রাঁ ভিক্ষা দিচ্ছ অর্মানি করে আর একটি
হতভাগিনীকে সাহায্য করতে পার? তাকে তুমি ভালই
চেন।

—কে? কার কথা বলছ?

—মাদমোয়াজেল লীজা। পেতি একোলে যে মডেল হতে
আসত!

—লীজা বেঁচে আছে? তুমি তার ঠিকানা জান?

—জানি! ভারী আত্মমৰ্যাদাজ্ঞান তার। ভিক্ষা সে নেবে না। অথচ...

ঠিকানাটা নোট বুক টুকে নিয়ে অগুস্ত্ বানু'ভ্যার কাছে বিদায় নিল।

পরের দিনই খুঁজে খুঁজে সে পৌঁছালো বেশ্যাপাড়ায়। অভিজাত জনপদবধূদের পল্লী নয়। উপচে পড়া নর্দমা, কাদা, মড়া-বেড়ালের বাচ্চায় আকীর্ণ এ'দোস্য এ'দো গলি। একটা গুদামঘরের একান্তে চটের থলি-টাঙানো এক চিলতে খুপারি। বাড়িউলি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ কোণটায় থাকে লীজা-বুড়ি!

অগুস্ত্ দেখল বুড়িটাকে! কত বয়স হবে? অগুস্তের এখন ষাট, তাহলে ওর ছিয়াত্তর-সাতাত্তর হবার কথা। ঘোলাটে দুটি চোখ মেলে বুড়ি তাকালো, ডান হাতটা ভ্রূর উপর তুলে। গায়ে শর্তাঙ্কন একটি প্রাক্তন ফ্রক। খালি পা! চুলগুলো শনের দাড়ি: কাকে চাই?

—মাদমোয়াজেল লীজাকে।

—এখানে ও নামে কেউ থাকে না।

—আপনার নাম কি?

—মাদাম ডেফার্জ! লীজাকে কেন খুঁজছ? তার কাছে আর ছবি নেই।

—ছবি? কিসের ছবি?

—অরিজিনাল আঙুরে, কামীল কোরো, দেলাক্লোয়ের নুড-স্কেচ।

—হঁ্যা, হঁ্যা, তাকেই খুঁজছি আমি। সে কোথায় থাকে বলতে পারেন?

—তোমার নাম কি?

—রোদ্যাঁ। অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ।

বুড়ি কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালো। অগুস্তের দুটি হাত টেনে নিয়ে বললে, তুমি! অগুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ! মাদমোয়াজেল লীজার খোঁজে এসেছ? কেন? কেন? কেন?

—সে আমার প্রথম মডেল। তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

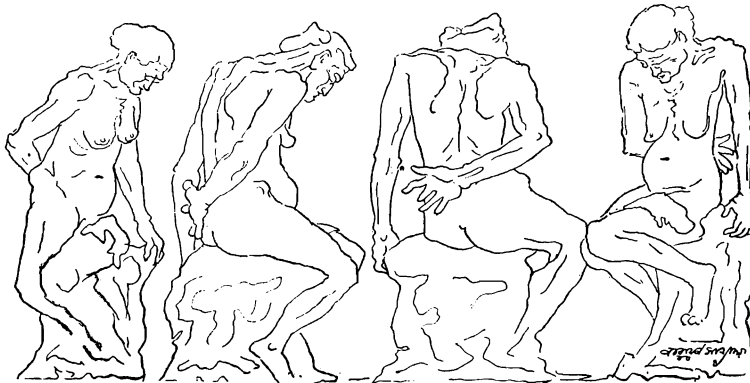
বরবর করে কেঁদে ফেলল বুড়ি। ভাঙা তোড়ঙ্গ হাৎড়ে বার করে আনল একটা এ্যালবাম। তার প্রায় সব পৃষ্ঠাই শূন্য। বললে, সব স্কেচ খেয়ে ফেলেছি, অগুস্ত্। পেট বড় অবুঝ; কিন্তু তোমার স্কেচখানা প্রাণে ধরে বেচতে পারিনি!

গত দশ বছর ধরে সে তিল তিল করে তার সপ্তয় বিক্রয় করেছে একটি মাত্র পেট চালাতে। ভিক্ষা সে করবে না, করবে না কোন উজ্জ্বল—এই তার পণ! কামীল কোরোর স্কেচাদিনী শক্তি ছিল সে! আঙুরে দেলাক্লোয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে অনাবৃত ভেনাসের বেশে! সে কি পারে কোন উজ্জ্বল করতে? বিবাহ হয়েছিল তার। মসুয়ে ডেফার্জ। সে সৈন্যদলের জন্য হেলমেট বানাতো। বছরখানেক বিবাহিত জীবনের পরই ডেফার্জ মারা যায়। লীজার জন্য সে কিছুই রেখে যেতে পারেনি। শুধু রেখে গিয়েছিল ঐ নামটা, মাদাম ডেফার্জ!

অগুস্ত্ বলল, তোমাকে ভিক্ষা অফার করার স্পর্ধা আমার নেই। কিন্তু তোমাকে মডেল করে মূর্তি বানাতে তুমি মজুরি নেবে না কেন?

স্বস্তিত হয়ে গেল লীজা—যমের অরুচি এই বুড়িকে মডেল করে কী বানাবে গো তুমি?

: She who Once was the Helmet-Maker's Beautiful Wife! (সেই মেয়েটি যে এককালে ছিল শিরস্ত্রাণ-নির্মাতার সুন্দরী স্ত্রী)



এ

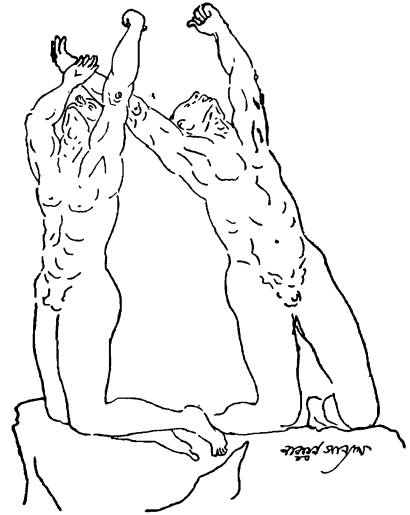
THE PRODIGAL SON (1889) :

অমিতব্যয়ী পুত্র :

কাহিনীটি প্রায় সকলেই জানেন। বাইবেলের গম্প। লুক-কথিত সুসমাচারের পঞ্চদশ অধ্যায়ে মূল কাহিনীটি আছে : এক বাপের ছিল দুই ছেলে। ছোটটি একদিন বাপকে বললে, সম্পত্তিতে আমার ভাগের পাওনাটা আমাকে মিটিয়ে দাও। বাপ তাই দিলে। অর্মান ছোট ছেলে টাকার বাণ্ডল বগলে নিয়ে দূর দেশে রওনা দিল। সেখানে নানাভাবে ফুর্তি-ফার্তা করে টাকাগুলো দিলে উড়িয়ে। পরে সে-দেশে যখন দুর্ভিক্ষ হল তখন তারও পুঞ্জি ফুরিয়েছে। নানান দুঃখ-খান্দার মধ্যে পড়ে ছোকরার চৈতন্য হল। ভাবলে, এবার সে দেশে ফিরবে। বাপকে গিয়ে বলবে, বাবা ! আমি অন্যায্য করেছি। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তোমার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছি, আমি আর তোমার পুত্র বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করছি। আমাকে তোমার ভৃত্যদলে সামিল করে নাও। যে কথা সেই কাজ। দেশে ফিরে বাপকে তাই বললে। শূনে বাপ বললে, বাছা ! ও কথা বল না। তুমি যে নিজ মুখে পাপ স্বীকার করলে, আবার ভালো হবার জন্য প্রতিজ্ঞা করলে এতেই আমি তৃপ্ত। পুত্রের পুনর্মিলনের আনন্দে সে মহা ভোজের আয়োজন করলে। তাই শূনে বড় ছেলে অভিমান করে বললে, বাবা, তোমার ছোট ছেলে তার সম্পত্তির অংশ উড়িয়ে-পুড়িয়ে ফিরে আসতে তুমি আজ যে রকম আনন্দ করছ ; কই আমাকে উপলক্ষ্য করে তুমি তো কখনও এমন ভোজ দাওনি ? বাপ শূনে বললে, বাছা ! তুমি তো জীবন-ভর আমার সাহচর্য পেয়েছ ! আমার যা কিছু রইল তা তো

তোমারই। কিন্তু এই যে হারানিধি ফিরে এল এতে আনন্দ করব না ?

কাহিনী তো এই। ভাস্কর্যে কী দেখাচ্ছে ? অমিতব্যয়ী পুত্রটি বাপের কাছে ফিরে এসে সব অপরাধ স্বীকার করছে নতজানু ভঙ্গিতে, দুই হাত উর্ধ্ব আকাশের দিকে তুলে সে বিলাপ করছে। ওর বাঁ-হাত মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত মুঠি খোলা। বলা বাহুল্য, চিত্র . ১ -তে একই মূর্তিকে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আঁকবার চেষ্টা করেছি ! পুরুষ মূর্তিটির দেহ



চিত্র—১৫ : The Prodigal Son (1889) প্রডিগাল সন সুগঠিত। তারুণ্যে ভরপুর। মুখখানি অর্ধসমাপ্ত, চোখ দুটি বোঁজা এবং অধরোষ্ঠ বিমুক্ত। এ মূর্তিতে আপত্তির বিষয়

একটাই : রোদ্যা এ মূর্তির পরিকল্পনায় কোনও মৌলিকতা দেখাতে পারেননি। ‘পলাতক প্রেম’ (Fugit Amor, চিত্র : 26)-এর নায়ককেই দেখতে পাচ্ছি নতুন নামে। একই মূর্তি, উপবেশনের ভঙ্গিমায়। পূর্ব উদাহরণে যাকে মনে করা গেল—প্রেমিকার সন্ধানে উদ্ভ্রান্ত, এবার তাকেই মনে করতে বাধ্য হচ্ছি অনুশোচনায় আকাশের দিকে হাত তুলে আত্ননাদ করছে। যত বড় শিল্পীই হোন রোদ্যা, আমাদের মনে হয়েছে : এটি ‘সৌখিন মজদুরী’ !

গোয়াড়ী-গঞ্জে পাল মশাইকেও দেখেছি—কার্তিক সংক্রান্তিতে দেব সেনাপতির যথেষ্ট খন্দের না হলে সেই কার্তিক মূর্তিতেই বুকের কাছে মাটি ধরিয়ে আর ময়ূরটার পেখম ছেঁটে, রাজহাঁসে রূপান্তরিত করে মাষী পঞ্চমীর আগেই বাজারে ঝেড়ে দিতে ! রোদ্যা-সাহেব ! হক্ কথা কয়ে ফেললাম বলে গৌসা কর না জানি।

METAMORPHOSES ACCORDING TO

OID : (1886) : অভিনেদের রূপান্তর :

একটি জটিল এবং বিতর্কমূলক শিল্প। আমি যখন এটিকে প্রদর্শনীক্ষেত্রে নিরীক্ষণ করছিলাম তখন আমার পাশে ছিলেন মধ্যবয়সী এক দম্পতি। ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গীকে ইংরাজিতে বললেন, ভারতীয় মন্দিরে এ জাতীয় মৈথুনরত মিথুন অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু ইউরোপীয় ভাস্কর্যে...

ভদ্রলোক তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি নিঃসন্দেহ যে, এটি মৈথুনরত মিথুন ? আমি কিন্তু দুটি স্ত্রীলোককে দেখতে পাচ্ছি। সম্ভবত ‘লেস্‌বিয়ান ইন্টিমেসি’ !

আমিও সে-কথা এতক্ষণ ভাবিছিলাম। আপাতদৃষ্টিতে এটি ‘মৈথুনরত মিথুন’ বলে মনে হলেও উপস্থাপিত দুটি চরিত্রই স্ত্রীলোকের। নিচে বাধাদানকারী মূর্তিটি নিঃসন্দেহে নারীর—সনাত্তিকরণের বক্ষস্থ অঙ্গ দুটি অবশ্য দু-হাতে ঢাকা পড়েছে ; কিন্তু তার পেলব দেহাবয়ব একটি যুবতীর, প্রায় কিশোরীর। অপূর্ব লাভগাময়ী, অসহায়ী সে। অপরপক্ষে উপরের ফিগারটির দেহসৌষ্ঠব পুরুষালী ; কিন্তু তার দক্ষিণগুণ সন্দেহাতীতভাবে বলে দেয় সে একটি ‘আমেজন’—স্বরূপা ! পুরুষভাবাপন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব নারী।

কী বক্তব্য শিল্পীর ?

ক’লকাতা ও দিল্লি—উভয় প্রদর্শনীতে এই এক্সিবিট-এর

রোদ্যা—১৮

ক্রমিক-সংখ্যা ছিল ৩০. উভয় ক্যাটালগেই ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে : “This statue of two women embracing actually illustrates an episode in the famous Greek pastoral by Longus in which one of the protagonists is a man. It betrays Rodin’s



চিত্র—57 : Metamorphoses According to Ovid (1886) অভিনেদের রূপান্তর

lack of attention to the sexual appearance of the figures in his amorous groups” (“এ ভাস্কর্যে দেখা যাচ্ছে আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি রমণীকে ; এটি লঙ্গাস-বিরচিত একটি প্রখ্যাত লোকগাথা অনুসরণে নির্মিত। সেই কাহিনীতে মূল চরিত্রের একজন ছিল পুরুষ। মিথুন ভাস্কর্য-গুলি নির্মাণকালে মূর্তির যৌনাঙ্গ বিষয়ে রোদ্যা কী-জাতের অন্যান্যনস্ক হয়ে পড়তেন এ ভাস্কর্য তারই একটি প্রমাণ)।

আমার ম্যানিয়া বলুন আর যাই বলুন, ব্যাখ্যাটা কিছতেই মেনে নিতে পারিনি। রোদ্যার অনেকগুলি মিথুন মূর্তি প্রদর্শনীতে দেখেছি, অনেক-অনেক আলোচনাচিত্রও দেখেছি—কিন্তু ভ্রমক্রমে পুরুষমূর্তির ‘টরসো’-তে নারীস্তন কোথাও যুক্ত হতে দেখিনি। মুগ্ধহীন মূর্তি দেখেছি, হাত-পা-হীন ধড় দেখেছি—কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিল্পী সজ্ঞানে, কোন একটি রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সেগুলি ইচ্ছা করেই গড়েছেন। ‘অন্যমনস্কতা’ বা ‘lack of attention’-এর জন্য এ জাতীয় ভ্রান্তি তো কখনও নজরে পড়েনি। প্রসঙ্গত বলি, প্রাথমিক পর্যায়ে রোদ্যা বালজাক মূর্তিতে দুটি হাত বানিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শিষ্য বোর্দেল মতামত প্রকাশ করেছিলেন, হাত দুটি বাদ দিলেই যেন ভাল হয়। রোদ্যা কিছূক্ষণ চিন্তা করে শিষ্যের সঙ্গে একমত হন এবং ড্রেসিং-গাউন থেকে বেরিয়ে-থাকা দুটি হাত কজি থেকে কেটে বাদ দেন।

আলোচ্য-ভাস্কর্যের এ 'টুটি' যদি রোদ্যার অন্যমনস্কতা বা অনবধানতা-জনিত কারণে হয় তাহলে তাঁর কোনও শিষ্য কেন কখনো বলল না, “মেথ্র! আপনি ভুলে পুরুষমূর্তির বুকে নারীস্তন গড়েছেন!” এ-ভাস্কর্য নির্মিত হবার পর ত্রিশ বছরের উপর রোদ্যা তো বেঁচেছিলেন! নাকি ধরে নেব, ত্রিশ বছর ধরে তাঁর শিষ্যদলও ভুগছিলেন একই অসুখে: “**lack of attention to the sexual appearance of the figures...**”?

রোদ্যার উপর যে-কথানা গ্রন্থ যোগাড় করতে পেরেছি তাতে এ ভাস্কর্য নিয়ে কোনও আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। অগত্যা স্মারক পুস্তিকার নির্দেশ মতো সন্ধান করেছি। ওঁরা নামকরণ করেছেন: **Daphnis & Lycinion**. জানা গেল, লঙ্গাস তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের এক প্রখ্যাত গ্রীক লেখক। গদ্যে রচনা করেছিলেন **Daphnis and Chloa** কাহিনী। ডাফনি (এ্যাপোলো-তাড়িতা হতভাগিনী **Daphne**, যে বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছিল সেনয়, এ পুরুষ: **Daphnis**) সিসিলির একজন মেঘচারক। **Chloa** হচ্ছেন ডিউমটার, গ্রীক শাসাদেবী—গ্রীক-ইন্দ্র জিগুস-এর ভগ্নী তথা পার্সিফোন-এর জননী। লঙ্গাস-এর রচনা আমি পড়িনি; আন্দাজ করছি **Lycinion** ঐ কাহিনীর অপর কোনও চরিত্র। সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে ‘লঙ্গাস’-কাহিনীতেও আছে একটি পুরুষ ও একটি রমণী—দুটিই নারী নয়।

অথচ লক্ষ্য করছি, ফাইডন প্রকাশনা এ ভাস্কর্যের নাম দিয়েছেন (প্লেট: 52) ‘**The Metamorphosis of Ovid**’; নিউ ইয়র্ক-এর ‘দ্য মডার্ন লাইব্রেরী’ রোদ্যার উপর যে প্রামাণিক গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন সেখানে ভাষ্যকার **Louis Weinberg**ও এ ভাস্কর্যের নাম দিয়েছেন ‘**Metamorphoses According to Ovid**’, ফরাসী-ভাষায় মূল নামকরণ কী করা হয়েছিল জানি না। যাই হোক এবার ঐ সূত্র ধরে অগ্রসর হওয়া গেল।

অভিদ (43 B.C.—17 A. D) লাতিন কবি; তাঁর **Metamorphosis** (রূপান্তর) পঞ্চদশখণ্ডে রচিত বিরাট কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যের উপজীব্য অরফিউস্ এবং ইউরিডিস্কে (ইংরাজি উচ্চারণে ইতিপূর্বে আমরা যাকে ‘ইউরিডিস্’ বলেছি) মর্মন্তুদ কাহিনীটি। কাহিনীর প্রথমার্শ ‘অরফিউস্’ ভাস্কর্য আলোচনাকালে (পৃ: ৫১) আমরা জেনেছি। শেষার্শ

কবি বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় শুনুন:

“অভিদের ‘রূপান্তর’ কাব্য থেকে তা বিবৃত করছি। পাতাল থেকে সন্তপ্ত চিত্তে পৃথিবীতে ফিরে অরফিউস্ আর তিন বছর বেঁচেছিলেন। এই তিন বছরে, বহু রমণীর যাচনা সত্ত্বেও, তিনি কোনো স্ত্রীসংসর্গ করেননি, দ্বিতীয় দারগ্রহণও তাঁর পক্ষে অচিন্তনীয় ছিলো। এ-সময়ে তাঁর প্রণয়পাত্র ছিলো শুধু বালকেরা—থেশীয়দের তিনি বোঝাতেন যে, সেটাই ‘শ্রেয়তর পথ’। কিন্তু এই উপেক্ষা-অপমান থেশীয় নারীদের পক্ষে অসহ্য হলো, ক্রোধে ও লালসায় উন্মাদ হয়ে তারা দল বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে অরফিউস্কে বধ করল।” (বুদ্ধদেব বসু, ‘রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা’, পৃ: 209)।

অভিদ-বর্ণিত এই অংশটির স্বচ্ছন্দ ও ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন কবি বুদ্ধদেব বসু ঐ গ্রন্থে—রল্ফ হামফ্রীস-এর ইংরাজি থেকে। শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে বিরহী অরফিউস্ নির্জন অরণ্যপর্বতে একদিন বীণা বাজিয়ে গান গাইছে; বৃক্ষ, শিলা, সিংহ ও পশুপক্ষীরা তন্ময় হয়ে শুনছে। সহসা দূর থেকে তাকে দেখতে পেল ঐ প্রত্যাখ্যাতা রমণীর দল। প্রতিহিংসায় উন্মত্তা হয়ে তারা সদলবলে কবি অরফিউস্কে আক্রমণ করল:

“কেউ ছুঁড়লো মাটির ঢেলা,

কেউ পাথর,

কেউ বা ভেঙে নিলো গাছের ডাল,...

...গেলো ডুবে তার মধ্যে বীণাধ্বনি,

আর তাই অবশেষে পাথরগুলো—

রক্তে লাল, গায়কের রক্তে লাল—”

কবি অরফিউস্ প্রতিরোধের চেষ্টাই করল না। প্রতিবর্তী-প্রেরণায় “বিনতিতে হাত বাড়িয়ে দিলো কবি, মুখটা ঢাকলো”। যোথ নিষ্ঠুর আক্রমণে কবি অরফিউস্ প্রাণ দিল বিনা প্রতিবাদে—আর তারপর:

“তার জন্য অশ্রুপাত করলো পাঁথরা, আর জন্তুর পাল,

আর কঠিন শিলা, আর যত বৃক্ষ চলে আসত তার গান শুনতে

—সকলে হলো শোকাক্ত।

যেমন নারীরা চুল ছেঁড়ে মনের দুঃখে

তেমনি পাতা ঝরিয়ে দিলো বৃক্ষেরা,

নদীরা স্ফীত হলো অশ্রুধারায়, বনদেবী ও জলকন্যারা

হলো কৃষ্ণ বেশে শোকময়ী।” (বুদ্ধদেব বসু)

আপাতত যুক্তির খাতিরে ধরে নিন ‘ফাইডন প্রেস’ই ঠিক বলেছেন, স্মারক-গ্রন্থের সংকলক তাঁর lack of attention—এ (অনবধানতায়) এটিকে lack of attention (অনবধানতা) বলেছেন। তাহলে কী দাঁড়ায়?

রোদ্যাঁ কাব্য-কাহিনী ‘রূপান্তর’-কে ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী। সেক্ষেত্রে দুটি শিল্পগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তাঁকে। প্রথম কথা, একাধিক প্রতিহিংসা-পরায়ণার মূর্তি ভাস্কর্যে জটিলতার সৃষ্টি করবে—দৃশ্যকাব্য হিসাবে ‘গ্রুপ’ এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়। এ সমস্যার সমাধান সহজ: নিষ্ঠুরা রমণীকুলের প্রতীক হিসাবে একটি মাত্র রমণীমূর্তি নির্মাণ করা। সে হবে বলশালিনী। ‘আমেজন’-স্বরূপা! দ্বিতীয় সমস্যা: একটিমাত্র নারীকে দেখাতে হবে একজন পুরুষকে হত্যা করছে! দৃশ্যকাব্যে সেটা কীভাবে দেখানো সম্ভব? দর্শনযোগ্য ভাস্কর্য হিসাবে তা যে নিতান্ত বেমানান। হয়তো এই সমস্যা সমাধানে রোদ্যাঁ অভিদ-এর কাব্যের নামকরণটি কাজে লাগালেন: ‘রূপান্তর’! অর্ফিউস্-এর রূপান্তর ঘটালেন। অর্ফিউস্—হোক সে পুরুষ—এখানে কীসের প্রতীক? বিরহবেদনার, কবিতার, সঙ্গীতের—যা কিছু সুকুমার, রমণীয়, পেলব তার! তাই অর্ফিউস্ রূপান্তরিত হল ধর্মিতা রমণীতে! আর তাই Louis Weinberg শিল্পটির নামকরণ করেছেন “Metamorphoses According to Ovid” (অভিদ ‘অনুসরণে’ একাধিক রূপান্তর; ফাইডন প্রকাশনার ‘অভিদের রূপান্তর’ নয়)। আর তাই আমরা শিল্পে দেখছি অর্ফিউস্ একটি ভূপাতিতা ধর্মিতা রমণী—প্রায় কিশোরী! বিনতিতে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে প্রতিবর্তী-প্রেরণায়। উপরের ত্রেণীয় রমণী একজন প্রায়-পুরুষ ‘আমেজন’ (যদিও তার দক্ষিণস্তন আছে)। তার প্রকাশমান স্তন সত্ত্বেও সে মূর্তির সর্বাবয়বে একটা পুরুষোচিত কাঠিন্য।

এ ব্যাখ্যাটি মানতে পারছেন?

হয়তো এখনও আপনি মানতে রাজী নন।

বেশ, আসুন, তাহলে অর্ফিউস্ তত্ত্বের মূলে প্রবেশ করা যাক। বার্তাও রাসেল (A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, N.Y.—11th ed, p. 17) বলছেন প্রাক-হোমার যুগের গ্রীকদর্শনে ছিল দুটি ধারা—ব্যাঙ্কাসতত্ত্ব এবং অর্ফিউস্-তত্ত্ব। ‘ব্যাঙ্কাস’ হচ্ছেন ইন্ড্রিয়জ কামনা ও মদিরার দেবতা—যেমন আমাদের কামদেব।

অর্ফিউস্-তত্ত্ব বলে, সুখ নয়, ‘আনন্দ’ই আমাদের লক্ষ্য। এ তত্ত্ব আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসী—‘The Orphic Philosophers believed in the transmigration of souls; they taught that the soul here after might achieve eternal bliss or suffer eternal or temporary torment according to its way of life here on earth.’ ফলে ইন্ড্রিয়জ কামনা-বাসনার—‘যাবজ্জীবং সুখং জীবৎ’ নীতির সঙ্গে তার বিরোধ। “Orpheus is said to have been a reformer who was torn to pieces by frenzied Maenads actuated by Bacchic orthodoxy.” (শোনা যায়, ব্যাঙ্কাসের মতাবলম্বী ক্ষিপ্ত পুরোহিতেরা অর্ফিউস্কে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।) সূতরাং ঐ আমেজনসদৃশা নারী ধর্মাস্ত্র ব্যাঙ্কাস-মতাবলম্বী নিষ্ঠুর পুরুষ পুরোহিতের প্রতীক।

প্রশ্ন হতে পারে, রোদ্যাঁ কি এ তত্ত্ব জানতেন? বার্তাও রাসেলের গবেষণাগ্রন্থ তো তখনও প্রকাশিত হয়নি? তা ঠিক! কিন্তু ঐ ব্যাঙ্কাস-তত্ত্ব আর অর্ফিউস্-তত্ত্ব কি শাস্ত্রত সত্য নয়? রোদ্যাঁর সমকালেও ফরাসী দেশে বোদলে’র, জোলা, ম্যালামে, মোপাসাঁ ব্যাঙ্কাস-তত্ত্বের ধ্বজাধারী আর শাস্ত্র-সৌন্দর্যের দরদী প্রবক্তা টলস্টয় রাশিয়ায় প্রায় সমকালে বসে লিখছেন What is Art? মোপাসাঁর আত্মিক অবক্ষয়ে হাতুতাশ করছেন!

প্রসঙ্গত বালি, জার্মান কবি মারিয়া রিল্কে রোদ্যাঁর এ ভাস্কর্য দর্শনের পর অর্ফিউস্-এর উপর রচনা করেছিলেন একগুচ্ছ অনবদ্য কবিতা। রিলকের পরিচয় এ-গ্রন্থের অন্যত্র বিস্তারিত দেবার চেষ্টা করেছি। কবি রিল্কে এই চরম বিয়োগান্ত কাব্যেও একটি আশার বাণী শোনাতে চেয়েছেন। যেন ব্যাঙ্কাস-পূজারীদের নীরক্স অন্ধকারেও জ্বলছে বেথল্হেম-এর সেই পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল তারকাটি। রিলকের কবি-কম্পনায় ত্রেণীয় রমণীদের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা শুদ্ধ করতে পারেনি অর্ফিউস্-এর শাস্ত্রত সঙ্গীত:

“অবশেষে যখন তোমাকে ধ্বংস করে দিল ক্রুর প্রতিদানে

তোমার অমরধ্বনি বিহঙ্গমে, বৃক্ষে রয়ে গেলো,

রয়ে গেলো সিংহে ও শিলায়।

তুমি গান গাও এখনো সেখানে।”

(অনুবাদ: বুদ্ধদেব বসু)

জ

একদিন অগুস্ত্ স্ট্রিড-তে কাজ করছে, ওর ছাত্র বোর্দেল এসে বলল, মেংর্, একটি বৃদ্ধা আপনাকে খুঁজছেন।

—কী নাম? জানতে চাইল অগুস্ত্।

—নাম বলতে চাইছেন না।

অগুস্ত্ বিরক্ত হল। হাত থেকে কাদা-মাটি ধুয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে—ওর ‘আগন্তুক-চেয়ারে’ বসে আছে একটি বৃদ্ধা। মলিন বেশভূষা, কোটরগত চোখ, বোধকরি দু-বেলা ভরপেট খেতেও পায় না। অগুস্ত্কে দেখে বৃদ্ধা আসন ছেড়ে উঠল না, প্রশ্ন করল, তুমিই অগুস্ত্ রেনে রোদ্যঁ?

বয়সে অবশ্য অগুস্তের চেয়ে না-হোক দশ বছরের বড়। তবু ‘তুমি’ সম্বোধনটা কানে বাজল। বললে, হ্যাঁ, কী চাও?

—কিছু না। তোমাকে দেখতে এসেছি। আমাকে চিনতে পারছ না, নয়? আমি ক্রোতিল্দ্!

রীতিমতো অবাক হয়ে গেল অগুস্ত্। কত বছর পরে? পঞ্চাশ? না কি তারও বেশি?

—অগুস্ত্ রোদ্যঁ একজন মস্ত বড় শিল্পী একথা দশ বছর ধরেই জানি। নাম-সাযুজ্যে সে যে আমাদেরই অগুস্ত্ এটা এতদিন বিশ্বাস হয়নি। সম্প্রতি একটা কাগজে তোমার সর্গক্ষপ্ত জীবনী পড়ে বুঝলাম, তুমিই সে!

—তুমি কোথায় থাক? কী কর?

—আমার কথা থাক। মেরী কোথায়? কোথায় বিয়ে হল তার? ছেলোঁপিলে...

অগুস্ত্ হাত তুলে ক্রোতিল্দ্কে থামিয়ে দেয়। বলে, তুমি চলে যাবার বছর তিনচারের মধ্যেই ছোড়দি মারা যায়।

ক্রোতিল্দ্ দুঃখ জানালো। বললে, আর মা?

—মা যখন মারা যায় তখন আমি ব্রাসেল্ন্স্ এ; 1871 সালে।

—ও!...মায়ের সমাধিটা কোথায়? একদিন ফুল দিয়ে আসব।

—মায়ের কোনও সমাধি নেই। কোথায় তাকে সমাধিস্থ করা হয়েছে আমি নিজেই জানি না। তবে তুমি পাপার সমাধিতে গিয়ে—

এবার ক্রোতিল্দ্ হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। হেসে বলল, পাপা রোদ্যঁর সমাধি কোথায় জানবার কোঁতুল আমার আদৌ নেই।

—এখনও তোমার রাগ পড়েনি দেখছি। অথচ আমাদের মধ্যে একমাত্র পাপা রোদ্যঁর সঙ্গেই তোমার রক্তের সম্পর্ক!

আবার ম্লান হাসল ক্রোতিল্দ্। বললে, সেটাও তোমার ভুল ধারণা অগুস্ত্। পাপা রোদ্যঁর সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই—

—মানে?

—তুমি তখন ছোট ছিলে! তাই বুঝতে না, পাপা রোদ্যঁ কেন আমাকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু আমার মাতার চুল দেখেও কি বুঝতে পার না যে, আমি আদৌ রোদ্যঁ নই?

অগুস্ত্ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকে। সতাই এ আশঙ্কা তার কোনদিন হয়নি। ক্রোতিল্দ্ প্রসঙ্গান্তরে যায়, বিয়ে করেছে? তোমার ছেলোঁপিলে কী!

—আমি বিয়ে করিনি ক্রোতিল্দ্।

নিজেই অবাক হল। ওকে ‘বড়দি’ বলতে পারল না বলে।

ক্লোতিল্দু হয়তো সেটা খেয়াল করল না। আবার প্রশ্ন করে, আর থেরেস-পিসি ?

অগুস্ত্ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারল না। তাই তো ! থেরেস-পিসি ? তাকে শেষ কবে দেখেছে ? সেই তিরিশি সালে—পাপা রোদ্যাকে সমাধিস্থ করার সময়। তারপর থেরেস পিসি ওদের সংসার ছেড়ে চলে যায়। কী আশ্চর্য ! অগুস্ত্ অকৃতজ্ঞের মতো তাঁর কোনও সন্ধানই নেয়নি এতদিন। বুড়ি বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না।

—বুঝিছ ! পিসির কোনও খোঁজই নাও না। এটা ভালো নয়, অগুস্ত্। মানছি, তুমি ব্যস্ত মানুষ, মানছি, তুমি মস্ত শিল্পী, আত্মভোলা মানুষ ;—কিন্তু থেরেস-পিসি তোমার মায়ের মতো। একদিন গিয়ে খোঁজ কর বুড়িটার। অগুস্ত্, দুনিয়া বড় পাজি জায়গা—বিশেষ বুড়িদের কাছে। পিসি বেঁচে থাকলে এখন আশির কোঠায়। তার ছেলেরা যদি তাকে খরচপাতি না দেয় —

অগুস্ত্ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, কথা দিচ্ছি—আজ-কালের মধ্যেই পিসির খোঁজ নেব। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে সে কথা পিসিকে বলব ?

—না ! আমার কথা পিসি ভুলে গেছে। নতুন করে তাকে দাগা দিয়ে কী লাভ ? আচ্ছা আমি চলি। তোমার কাজের কিছুটা ক্ষতি করে গেলাম।

বুড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

অগুস্ত্ ডান হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে ওয়ালেটটা বার করে আনে। সসজ্জাচাে বলে, তোমাকে কি গোটা পঞ্চাশ ফ্রাঁ ধার দেব ?

ক্লোতিল্দু আবার বসে পড়ে। বলে, না। দুটো কারণে ! ধার নিলে শোধ দিতে পারব না। বোধকারি ‘ধার’ শব্দটা সৌজন্যবোধে ব্যবহার করলেও তুমি অন্য কিছু ‘মীন’ করছ—তাই নয় ? দ্বিতীয়ত তোমার কাছ থেকে হাত পেতে কিছু নিলে আর কোনদিন এমনিভাবে দেখা করতে আসতে পারব না। সজ্জাচ হবে। তুমিও ভাববে বুড়িটা আবার এসেছে ‘ধার’ চাইতে ! বললাম না, দুনিয়া ভারি পাজি জায়গা—বিশেষ বুড়িদের কাছে—হয়তো আবার কোনদিন তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করবে,—সে পথটা খোলা রাখাই ভালো, নয় কি ?

অগুস্ত্ আর দ্বিধা করল না। বুড়ির হাতটা টেনে নিয়ে বললে,

বুড়ি ! থেরেস-পিসিকে যদি অর্থ সাহায্য করতে পারি, তাহলে তোমার হাতেও কি আমি কিছু গুঁজে দিতে পারি না ? যতই কালো হোক তোমার মাথার চুল ! তোমাকে বুড়ি বলেই তো এতটাকাল জেনে এসেছি।

চোখ দুটো জলে ভরে এল ক্লোতিল্দু-এর। বললে, এর পর আর কোনও কথা হতে পারে না। বহুত দিন দুই না-খেয়েই আছি ভাই ! দে—

অগুস্ত্ একশ ফ্রাঁ গুঁজে দিল ক্লোতিল্দু-এর বলিরেখাঙ্কিত মুঠিতে।

ক্লোতিল্দু বিদায় হল। আর কখনও ক্লোতিল্দুকে সে দেখেনি জীবনে।

থেরেস-পিসির সঙ্গে দেখা করল পরদিনই। সাক্ষাৎকারটা ওর মনে দাগ কাটল। দু-দুটো অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। একটা ওর প্রবেশ মুহূর্তে, একটা নিগমন মুহূর্তে।

থেরেস-পিসি বেঁচে আছে। আছে তার সাবেক ডেরায়। ছেলেরা তাকে দেখে না। তবে ওর প্রাক্তন নিয়োগকর্তা—শিল্পী ড্রিলিং—অবিবাহিত অবস্থায় যখন মারা যান তখন তাঁর গভর্নেস-এর জন্য বেশ কিছু টাকা উইল করে দিয়ে যান। সে-টাকার সুদ থেকেই বুড়ির চলে যায়। এতসব কথা অগুস্ত্ আদৌ জানত না।

কলিং-বেল-এর দড়িটা ধরে টানতে বুড়ি নিজেই এল, খুলে দিল দরজা। খুনখুনে বুড়ি হলে কী হয়, এখনও তার হাঁটা চলার ক্ষমতা আছে। দৃষ্টিও ভালো। দর্শনমাত্র চিনতে পারল ওকে। পাঁজর-সর্বস্ব বুকে টেনে নিয়ে বলল, এতদিনে এ বুড়ির কথা মনে পড়ল পাগল ছেলেটার ?

অগুস্ত্ অবাক হয়ে দেখাছিল থেরেস-পিসির বৈঠকখানার দেওয়ালটাকে। চারটে দেওয়ালেই নানান জাতের পেপার-কাটিং সাঁটা। খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্রিকা থেকে অংশ-বিশেষ কেটে-কেটে দেওয়ালটা ভরাট করা হয়েছে। দশ-পনের বছর ধরে।

—এ কী করেছ পিসি ! সারা দেওয়াল জুড়ে...

—হ্যাঁ ! যদি কখনও জানতে চাস্ কোন্ পত্রিকা কীভাবে তোর মুণ্ডুপাত করেছে তাহলে লাইব্রেরীতে যেতে হবে না—এই বুড়ির বাড়িতে এলেই তা দেখতে পাবি !

আশ্চর্য কাণ্ড। রোদ্যার শিল্প বিষয়ে যেখানে যা ছাপা

হয়েছে সব সংগ্রহ করেছে বুড়ি। কাঁচ দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে সঁটে রেখেছে! 'আবোল-তাবোলে'র বুড়ির বাড়ি যেন! বুড়ি ওকে নিয়ে গিয়ে বসালো। ড্রিংক্স বানিয়ে আনল। নিজের হাতে বানানো 'কুকি' আর 'কেক' খাওয়ালো। পুরানো দিনের অনেক অনেক গম্প করল বুড়ি অগুস্ত্ কায়দা করে জানতে চাইল বুড়ির অর্থাভাব আছে কিনা। থেরেস্-পিসি সরাসরি অস্বীকার করল। বলল, ড্রিলিং যা দিয়ে গেছে তাতে আমার দিবি চলে যায়। মেরী-রোজ কেমন আছে বল?

—ভালো।

—পাগলিটাকে নিয়ে এলি না কেন?

—সে পারীতে থাকে না। মুদঁতে থাকে।

—বুঝি! বুড়ি হয়ে গেছে। তাই না? নতুন ছুঁড়ির তালে আঁছিস?

—আঃ পিসি! তোমার মুখের কোনও আড় নেই!

—তা তো বটেই! তোরা ছোকছোক ছুকরি খুঁজতে পারিস্, আর আমরা বলতে পারি না! তা সে যাই হোক, সে কি আরও মুটিয়েছে? না কি একই রকম আছে?

—কেন? হঠাৎ মোটা হওয়ার প্রসঙ্গ আসছে কেন?

বুড়ি নিঃশব্দে উঠে গেল। কাগজে-জড়ানো একটা প্যাকেট এনে বলল, মেরীর জন্য একটা পুল-ওভার বানিয়েছিলাম। অনেকদিন হল। তুই এটা নিয়ে যা।

অগুস্ত্ প্যাকেট খুলে জামাটা দেখল। শিম্পকার্খের প্রশংসা করল; আবার কাগজে গুটিয়ে রাখল। থেরেস্ বলে, পেতি অগুস্ত্ কেমন আছে?

অগুস্ত্ সরাসরি মিথ্যা কথা বলে বসে। কী লাভ বুড়িকে দাগা দিয়ে? বলল, পেতি-অগুস্ত্ সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে।

সে কখন কোথায় থাকে খবর পাই না।

থেরেস্ অনেকক্ষণ জবাব দিল না। কী যেন ভাবছে সে।

তারপর মনিস্থির করে বলল, তুই কিন্তু ওর প্রতি অবিচার করোছিস! ছেলেটা বিগড়ে গেল তোরই জন্যে!

—কেন বৃথা ভাবছ, পিসি! সে মোটেই বিগড়ে যায়নি!

আরও কিছুক্ষণ গম্পগাছা করে অগুস্ত্ বিদায় হল। পিসি বললে, একদিন মেরী-রোজকে নিয়ে আসিস্। অনেকদিন দেখিনি।

অনেকটা পথ ফিরে এসে অগুস্ত্-এর হঠাৎ খেয়াল হল পুল-

ওভারটা সে নিয়ে আসতে ভুলেছে। একবার মনে করল, যাক, দু-চারদিন বাদে মেরী-রোজকে নিয়ে পিসির সঙ্গে দেখা করতে আসবে। মেরীকে শুধু সাবধান করে দিতে হবে—পেতি-অগুস্ত্ আর কামীলের কথা যেন পিসিকে কিছু না বলে। তারপর মনে হল, না, বরং ফিরে গিয়ে পিসির কাছ থেকে তার দেওয়া উপহারটা নিয়েই আসা যাক। পিসি না মনে করে—অগুস্ত্ তার স্নেহের দানটা অবহেলা করেছে। অগুস্ত্-এর এখন যা রোজগার তাতে ঐ উপহারটার আর্থিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তাই ভুল বোঝা-বুঝির আশঙ্কা আছে। অনেকটা পথ আবার উজান বেয়ে ফিরে এল অগুস্ত্। কিন্তু উপহারটা ফিরিয়ে আনা হল না। দ্বিতীয়বার কলিং-বেলের দড়িটা ধরে টানতে গিয়েও হাতটা টেনে নিল। থেরেস্-পিসি ঘরের ভিতর কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। পুরুষকণ্ঠ। পিসি বলছে, গতমাসে তোকে বিশ ফ্রাঁ দিয়েছি, মায়ের কাছ থেকেও নিশ্চয়ই তুই কিছু আদায় করেছিস্। কিন্তু এভাবে তো চলবে না খোকন! সব কিছু যদি তুই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিস্...

পুরুষকণ্ঠটা চিনতে বিলম্ব হল না। পেতি-অগুস্ত্ বলল, ঐ তোমাদের এক রোগ দিদা! মায়েরও ঐ এক সানাই-এর পোঁ! 'মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিচ্ছিস্!' আরে বাপু! একটা মানুষের সারা মাসের খরচ কি কম? বাজার যে আগুন! ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতোয় মেৎ-এরই অপমান! সবাই যে জেনে বসে আছে—এই শর্মা মহান শিম্পী অগুস্ত্ রেনে রোদ্যার অমহান বেজন্মা-পুত্র!

মাথা নিচু করে ফিরে গেল অগুস্ত্। সে খোঁজ-খবর না নিলেও পেতি-অগুস্ত্ মাস-মাস ক্যারিয়াটিড্-দিদার খোঁজ নিয়ে যায়!

বাপ-কো বোটর সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে!

একদিন স্ট্রুডিওতে বসে একা একা কাজ করছে—রাত বেশ গভীর—হঠাৎ কার ছায়া পড়ল সামনে। অগুস্ত্ ঘুরে দেখে একটা লোক কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে। বয়স সাতাশ-আঠাশ, সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত প্রোজ্জল চেহারা, কুচকুচে এক জোড়া কালো গোঁফ আর তার সঙ্গে মানানসই এক জোড়া ঘন নীল চোখ প্রথমেই নজর কাড়ে। অগুস্ত্ ধমকে ওঠে, ঢুকলে কী করে হে? পাঁচিল টপ্কে?

লোকটা হাসল। বললে, আজে না ! শিম্পীর দ্বার অব্যাহতই ছিল।

—অ ! খোলা দরজা পেলে যে কোন মানুষের ঘরে ঢুকে পড়তে বুঝি সঙ্কোচ হয় না ?

—আজে না। যদি দরজাটা হয় ‘নরক’-এর, আর যে-কোন মানুষটা হয় ‘অগুস্ত’ রেনে রোদ্যা’।

—বটে ! বুঝি তো বেশ কপচাচ্ছ ! মস্যুয়ের কী করা হয় ? নাম ?

—কবিতা-টবিতা লেখা-টেখা হয়। নাম : রেইনার মারিয়া রিল্কে। আমি জার্মান।

অগুস্ত নির্বিকার। মোপাসাঁ, মার্ক-টোয়েন, অথবা বার্নার্ড শ’ নামগুলো শুনেও সে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশ্ন করেছে : কী করে হে লোকটা ? ফলে, রেইনার মারিয়া রিল্কে’র নাম সে জানবে না। রিল্কে তখনও আদৌ বিখ্যাত হয়নি। অগুস্ত বলল, অ। কবিতা-টবিতা লেখা হয় বুঝি ! তা মরতে এখানে কেন ?

—মরলে তো সেই ‘নরকের দ্বারে’ই যমদূতেরা টেনে নিয়ে যাবে, তার চেয়ে জীবন্তে চলে আসাই ভালো নয় ? বিশেষতঃ, আপনিও যখন কবিতা লেখেন—আপনি সে হিসাবে আমার সগোত্র।

অগুস্ত টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মাঝরাতে এ কোন্ পাগল এল জ্বালাতে ! বলে, আমি মিকেলাঞ্জেলো নই ! কবিতা আমি বাপের জন্মে লিখিনি ! কী বকছ হে ছোকরা !

—লিখেছেন। কলমে নয়, ছেনি-হাতুড়িতে। আমার স্ত্রী আপনার ছাত্রী, ফ্রাউ ক্লারা ওয়েস্কফ্। তার মুখেই শুনেছি—

—আরে-আরে-আরে ! তাই নাকি ? ক্লারা তোমার বউ ? সে-কথা এতক্ষণ বলছ না কেন ? এস, বস এ টুলটায়।

রিল্কে বহু সাহিত্য-সভার আসরে সাদর আমন্ত্রণ পেয়ে বসেছে ; এই প্রথম সে আসনলাভ করল ক্লারার স্বামী হওয়ার গৌরবে। জাঁকিয়ে বসে বলল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নরকের দ্বারস্থ হয়েছি মেৎস ! আমি আপনার একটা জীবনী লিখছি !

—কী লিখছ ? জীবনী ? আমার ? পণ্ডিত ! প্রকাশক জুটেবে না।

—আপনার ধারণাটা ভুল মেৎস। জার্মানির একজন শ্রেষ্ঠ

পাবলিশার ঐ জনাই আমাকে খরচপাতি দিয়ে পারীতে পাঠিয়েছে।

—বল কি ! তবে তো তুমি বড় জ্বর লেখক হে ?

—আজে না। আপনি বড় জ্বর বিষয়বস্তু !

অগুস্ত কিছুদিনের মধ্যেই এই সুদর্শন কবিপ্রকৃতির প্রাণচঞ্চল যুবকটিকে ভালোবেসে ফেলল অগুস্ত। তার বাণ্ডিত পিতৃহৃদয় বোধ করি এটাই চাইছিল। পরের সপ্তাহে অগুস্ত তাকে নিয়ে গেল ম্যুর্ডতে। মেরী-রোজকে বললে, এই দেখ, একটা পাগলকে ধরে এনেছি। এ ছোকরা আমার জীবনী লিখতে চায়।

মেরী-রোজ-এর বাণ্ডিত মাতৃহৃদয়ও ওকে পেয়ে উৎলে উঠল। রিল্কেও তার হারানো মায়ে’র স্নেহ ফিরে পেল যেন।

রিল্কে—জার্মানির উদীয়মান কবি (যাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক এদমঁদ জালু একদিন লিখেছিলেন, “আমার মনে হ’ল এই প্রথমবার আমি একজন কবির সঙ্গে কথা বলছি। অর্থাৎ আমার পরিচিত অন্য কবিরা, যতই মহৎ হোন, যেন শুধু তাঁদের অন্তরস্থলে কবি, কিন্তু কাব্য-রচনার বাইরে আমার সঙ্গে একই জীবলোকের বাসিন্দা।... কিন্তু রিল্কে’র কথাবার্তা আমার সামনে এমন এক জগৎ খুলে দিল, যাতে প্রবেশলাভ আমার ভরফে এক অলৌকিক ঘটনা ! ”) স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল অগুস্ত রোদ্যার সচিবের পদ—বিনা বেতনে। তিন-তিনটে ভাষায় তার অধিকার—জার্মান, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরাজি। অগুস্ত-এর কাছে তখন বাণ্ডল-বাণ্ডল চিঠি আসে—নানান ভাষায়। একে তো চিঠিপত্র লেখা ওর ধাতে নেই, তায় জার্মান-ইংরাজি জানে না। ফলে অ-জবাবী চিঠির আত্মপস্ জমে উঠছে ওর টেবিলে। তার মধ্যে বেশ কিছু ওর ভাস্কর্যের অর্ডার—যার পাঠোদ্ধার করতে পারলে ওর অর্থাগম বৃদ্ধি পায়।

রিল্কে বিষয়বস্তু অনুসারে ফাইল খুলে চিঠিগুলি শ্রেণীবদ্ধ করল—জরুরী, অ-জরুরী, মামুলি ছেঁড়াকাগজের খুড়ির যাত্রী। তারপর বসল জবাব লিখতে। কবি হল করণিক !

রিল্কে’র চিঠি পেয়ে কে-একটা দাড়িওয়াল লোক সম্ভবিক এসে হাজির হল ইংল্যান্ড থেকে। ভারী মজাদার কথা বলত লোকটা—কথার পিঠে কথা। যা শুনলেই হাসি পায়, আবার হাসতে গিয়ে থমকে যেতে হয় ; মনে প্রশ্ন জাগে : ওটা সত্যই

হাসির কথা তো ? দাঁড়াও, দাঁড়ি-ওয়াল লোকটার নাম মনে করি। দু-দুটো হেডস্টাডি বানিয়ে নিয়ে গেল সে, হাজার পাউণ্ড খরচ করে। একটা মার্বেল, একটা রোঞ্জ। সে লোকটাও বইটাই লেখে। রিলুকে বলেছিল নাটকই নাকি বেশি ! ও হ্যাঁ, নামটা মনে পড়েছে এতক্ষণে। দাঁড়িওয়াল লোকটার নাম—কে-এক : জর্জ বার্নার্ড শ !

শ-এর সঙ্গে রোদ্যার সাক্ষাৎকারের বিবরণ দু-তরফের জীবনী-কারের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে ; ফলে আমাকে কম্পনার আশ্রয় ততটা নিতে হবে না।

রিলুকে ডাকে একখানা ইংরাজিতে লেখা চিঠি পেয়েছিল, রোদ্যাকে লেখা মিসেস বার্নার্ড শ-য়ের চিঠি। মিসেস শ লিখছে, ‘আমার স্বামী একজন প্রখ্যাত লেখক এবং তিনি আপনার ভাস্কর্যের বিশেষ অনুরাগী। আমার ইচ্ছা তাঁর একটি প্রতিকৃতি বানাবো ; কিন্তু তিনি জিদ্ ধরেছেন মেংর অগুস্ত্ রোদ্যা ছাড়া আর কারও কাছে মাথা পাতবেন না। কারণ হিসাবে তিনি বলছেন, যদি রোদ্যার সমকালে জীবিত থাকার সুযোগ সত্ত্বেও তিনি আর কোনও ভাস্করকে দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি তৈরী করান তাহলে ভাবীকাল তাঁর আজীবনের সাহিত্যকীর্তি অস্বীকার করে বলবে—‘বার্নার্ড শ লোকটা ছিল বুদ্ধার বেহন্দ !’

অগুস্ত্ জানতে চায়, ওর বউ যা দাবী করেছে তা সত্যি ? কী নাম যেন—হ্যাঁ, বার্নার্ড শ লোকটা লেখে-টেখে ?

—কী বলছেন মেংর ! জি. বি এস. বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক !

—‘জি. বি. এস’ কী ?

—ঐ তো ! জর্জ বার্নার্ড শ !

—কিন্তু আমার হাতে যে এখন অনেক কাজ ! ঐ নরকের দ্বারটা...

রিলুকে মেংরকে না জানিয়ে মিসেস শ-কে লিখে দিল, আপনি কোনও ফরাসী ব্যাঙ্কে হাজার পাউণ্ড জমা করে দিয়ে কর্তাকে নিয়ে এখানে চলে আসুন। এমন দুর্ভাগ্যবশত মণিকাণ্ডন যোগটা ঘটতেই হবে।

বার্নার্ড শ দিন পনেরের মধ্যেই সস্ত্রীক চলে এল ফ্রান্সে। পারীর উপকণ্ঠে ম্যুদঁ গাঁয়ে। অগুস্ত্ খুশি হল। বসল মূর্তি গড়তে। শ’ এর রচনায় জানতে পারি, অগুস্ত্ তাঁর আট-দশটি

মূর্তি গড়ে আর ভাঙে। কোনটাই শিল্পীর পছন্দ হয় না। দু-একবার শ’ বাধা দিয়ে বলেছে, এ মূর্তিটা তো চমৎকার উৎরেছে। এটাকেই দিন না ?

অগুস্ত্ চটে উঠে বলেছে, তুমি কী বোঝ হে শিল্পের ? ‘চমৎকার’ হয়েছে কি ‘ছাই’ হয়েছে বুঝব আমি !

একটা কথা। অগুস্ত্ যখন কারও হেডস্টাডি করত তখন স্টুডিওতে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশাধিকার থাকত না। ইংলণ্ডের তাঁর এক বান্ধবীর হেডস্টাডি ওকে দিয়ে বানিয়ে ছিলেন ; কিন্তু অগুস্ত্ স্বয়ং কিং-এম্পারারকে স্টুডিওতে ঢুকতে দেয়নি ! রিলুকে তাই মিসেস শ-কে আগেই বলে রেখেছিল—সিটিং-এর সময় সে যেন ভুল করেও স্টুডিওতে না ঢুকে পড়ে। কিন্তু অগুস্ত্ই এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে বলল, তা কি হয় ? মিসেস শ পাশে না থাকলে আমার মডেল-এর মুখ গোমড়া দেখাবে !

একদিনের ঘটনা :

শ : আমার আশঙ্কা হয় আপনি কোনদিনই আমার মূর্তিটা শেষ করবেন না। আর কতদিন লাগবে ?

অগুস্ত্ . তোমার প্রকাশক যখন আগাম-টাকা উশুল করতে তোমায় তাগাদা দেয়, জানতে চায় আর কতদিন লাগবে—তখন তুমি তাকে কী জবাব দাও ?

শ : কিন্তু এখানে যে ব্যাপারটা উষ্টো হচ্ছে। আমি আপনাকে পারিশ্রমিক দিচ্ছি, যদিচ দেবার কথা আপনার, আমাকে।

অগুস্ত্ : কেন ? আমি তোমাকে টাকা দেব কেন ?

শ : বাঃ ! আমার মতো দুর্ভাগ্যবশত মডেল-এর জন্য সিটিং চার্জ দেবেন না ?

অগুস্ত্ : দেব ! যাবার দিনে তোমার হাতে তুলে দেব অগুস্ত্ রোদ্যার স্বহস্তে গড়া একটা প্রতিকৃতি ! তুমিই বলেছ, না হলে ভাবীকাল বলবে, ‘শ লোকটা ছিল বুদ্ধার বেহন্দ !’

শ—আমি ও-কথা বলিনি। বলেছে আমার স্ত্রী, শার্লট।

অগুস্ত্—সে তো একটা গ্রামাফোন ! তাই তো সিটিং-এর সময় তোমার কাছে ওকে থাকতে দিই। মানুষ হলে দিতুম না।

আর একদিনের ঘটনা :

অগুস্ত্ : তোমার চেহারা খানিকটা ‘শয়তান’-এর আদল আছে।

শ : আপনার ভুল হচ্ছে মেংর ! ‘উপমা’ নয়, ওটা

‘লুপ্তোপমা’ হবে, আমি স্বয়ং শয়তান !

অগুস্ত্ : না ! পুরোপুরি নয়। তোমার চেহারায় যে খানিকটা ‘যীসাস্’-এর আদলও আছে !

শ জ্বরী দিকে ফিরে বলে, আমার ডায়েরিটা দাও তো। ঐ শেষ কথাটা মেত্রকে দিয়ে লিখিয়ে নেব।

অগুস্ত্ বলে, সেটি হচ্ছে না ! লিখলে শেষ-কথার আগের কথাটাও লিখে দেব।

মাসখানেক পরে লণ্ডনে ফিরে যাবার পর জর্জ বার্নার্ড শ অগুস্ত্কে একটি বই উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়—মরিস্-এর লেখা ‘পার্টিব স্বর্গ’, চসার-এর উপর লেখা গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদ। তার প্রথম পাতায় লেখা ছিল—

“I have seen two masters at work,

Morris who made this book,

The other is Rodin the great

Who fashioned my head in clay,

I give this book to Rodin,

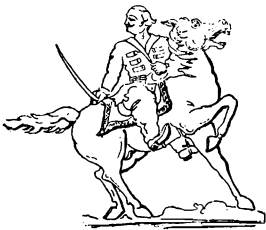
Scrawling my name in a nook

Of the shrine their works shall hallow

mine

When mine are dust by the way !”

বার্নার্ড শ-কে যাঁরা চেনেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন, এ-জাতের বিনয় তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। অগুস্ত্ তার জবাবে বার্নার্ড শ-কে যে উপহার পাঠায়, তাও চমকপ্রদ : শার্লট শ-এর অনেকগুলি স্কেচ। শ জানতো না তার জ্বরী এই স্কেচগুলি অগুস্ত্ কোন সুযোগে এঁকোঁছিল। ছবি তলায় অগুস্ত্ লিখে দিল : **Homage a’ sympathique Madame Charlotte Shaw.”**



তারপর এলেন সুইডেনের রাজা এবং জাপানের ফরাসী এ্যাম্বাসাডার। অগুস্ত্ এখন ম্যুর্দ গাঁয়ের বাসিন্দা। সেখানেই আসতে হচ্ছে মহান অতিথিদের। এইসব মহামান্য অতিথিদের সম্মুখে মেরী-

রোজবার হত না—বারণ ছিল অগুস্তের। অতিথিদের সেবাযত্নের আয়োজন সে করত নেপথ্য থেকে—কিন্তু ডিনার-টেবিলে

পরিবেশন করত পরিচারিকা। গ্রাম্য কোঁতুহলে মেরী-রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত রাজা-রাজড়াদের। হঠাৎ একদিন সে গ্রীসের রাজার সামনে পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে অগুস্ত্ তাকে পরিচয় করিয়ে দিল : মাদাম রোজ।

রাজা সসম্মানে এগিয়ে এলেন করমর্দনের উদ্দেশ্যে।

মেরী রোজ মাটিতে মিশে গিয়ে বলে, না, না, রাজামশাই... আমি সামান্য পরিচারিকা মাত্র।

সে রাতে মেরী রোজ ধমক খেল অহেতুক।

এরপর এলেন স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর—সপ্তম এডওয়ার্ড। যুবরাজ হিসাবে যিনি এর আগেও এসেছিলেন ওর প্রদর্শনী দেখতে। কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রয়াণে তিনিই এখন ব্রিটিশ কিং-এম্পারার—যে সাম্রাজ্যে তাঁর আমলে সূর্যও অস্তমিত হবার অবকাশ পেত না। কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট জানতে চাইলেন, আপনার ‘নরকের দ্বার’ শেষ হয়েছে ?

—না, য়োর ম্যাজেস্টি। শেষ হয়েছে হচ্ছে না। ওর মাথায় তিনটে ছায়ামূর্তি বানাচ্ছি এখন। এই তিনটিই শেষ ভাস্কর্য।

সম্রাট কোঁতুহলী হলেন। অগুস্ত্ তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখালো বাগানের একান্তে রাখা আছে প্রকাণ্ড ‘নরকের দ্বার’।

পরিদর্শন যে কাণ্ডটা ঘটেছিল সেটাও বাদ দিতে মন সরছে না। ঘটনাটা জানা যায় সম্রাটের দিনপঞ্জিকা থেকে : “সকালবেলা রোদ্দ্যার বাগানে পায়চারি করছি। বেলা নয়টায় সিটিং দিতে হবে ; হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। হঠাৎ ইচ্ছে হল নরকের উপরে ছায়ামূর্তি তিনটিতে কাছ থেকে দেখব। দেহরক্ষীকে বলতেই সে কোথা থেকে একটা মই নিয়ে এল। আমি মই বেয়ে উঠছি, দেহরক্ষী মইয়ের পায় দুটো ধরে রেখেছে—কোথাও কিছু নেই হঠাৎ বুনো মোষের মতো ছুটে এল রোদ্দ্যা, চেপে ধরল আমার ঠ্যাঙজোড়া ! ওর কাছ থেকে দৈহিক আক্রমণ আসতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। দেহরক্ষী এ্যাক্টেশনে অপেক্ষায় আছে আমার আদেশের। রোদ্দ্যা বললে, নেমে আসুন, য়োর ম্যাজেস্টি। এখনি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন। ঐ ছায়ামূর্তির কাঁধে একটা রবিন রেডব্রেস্ট ডিম পেড়েছে। আজ মাসখানেক তাই আমার কাজ বন্ধ আছে।...

“আমি তখন মনে মনে ভাবছি—তুচ্ছ ব্রিটিশ কিং-এম্পারারের বদলে স্বয়ং ওরেস্ লেকক যদি আজ মই বেয়ে উঠতেন তাহলেও

কি রোদ্যা তাঁর ঠ্যাঙ-জোড়া চেপে ধরত?...এ কোন্ দেশে এসে পড়লাম?—যেখানে অগুস্ত্ রোদ্যার ‘নরক’ গড়া মূলতুবি রাখতে হয় ‘রবিনর্গিন্স’র ‘স্বর্গ’ গড়ার খাতিরে?”

সপ্তম এডওয়ার্ড-এর পরে ওর তিন হবু-খদ্দের—মার্কিন মুলুকের তিন ধনকুবের : টমাস রায়ান, যোসেফ্ পুলিৎজার এবং ই হ্যারিমান। কিন্তু গোটা মহাভারত আপনাদের শোনাবার অবকাশ এখানে নেই। ..

একদিন অগুস্ত্ বললে, রিলকে, তুমি তো আমার ‘নরকের দ্বার’ দেখে কোনও মতামত প্রকাশ করলে না? বস্তু তাগাদা দিচ্ছে ওরা, তুমি কী বল? ওটা সুসমাপ্ত?

রিলকে বললে, দর্শক হিসাবে বলব : হ্যাঁ। কবি হিসাবে : না!

অগুস্ত্ কৌতূহলী হয়। হেসে বলে, কেন? কবিবরের দৃষ্টিতে কোথায় বাধছে?

—ওটা নিখুঁত ‘নারকীয় নরক-দ্বার’ হয়েছে, সার্থক ‘স্বর্গীয় নরকের দ্বার’ নয়।

স্বর্গীয় নরকের দ্বার! আশ্চর্য! লেককুও তো তাই বলেছিলেন! বলেছিলেন, “অগুস্ত্, তুই যখন ওটা শেষ করবি তখন আমি থাকব না; তবু ও-পার থেকে আমি দেখব, তুই ‘প্যাণ্ডোরার মণি-মঞ্জুষা’ ঠিক সময়ে বন্ধ করতে পেরেছিচ্ কি না।”

অগুস্ত্ প্রশ্ন করে, কী হলে ওটা ‘স্বর্গীয় নরকের দ্বার’ হবে?

—তা আমি কেমন করে জানব? সেটা শিল্পীর বলার কথা : দর্শকের নয়। কাউন্ট লিও টলস্টয় তাঁর ‘What is Art’-এ যে কথা বলেছেন—‘a redeeming feature’, তা এ শিল্পে অনুপস্থিত। নীরকু অঙ্ককারই নরকে প্রত্যাশিত—কিন্তু নীরকুতম অমারাগ্রিও তো নিস্প্রভাত হয় না, মেৎর!

—কী চাও তুমি? ঠিক কী চাও?

—নীরকু অঙ্ককারে ছোট্ট একটা ‘তারা’। দ্য স্টার অব্ বেথ্লেহেম।

অগুস্ত্ মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করে। বলে, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না রিলকে। যদিচ আমি খ্রীস্টান তবু অত ধর্ম-ধর্ম বাতক আমার নেই। মিকেলাঞ্জেলো সিস্টিন চ্যাপেলে যে নরকের ছবি এঁকেছেন সেটা ‘সেটান’-এর গড়া; দান্তের ‘ডিভাইন কমেড’-র নরক গড়েছে

মের্ফিস্টোফেলিস্! আমার নরক মানুষের গড়া—তোমার আমার হাতের কাজ! খ্রিষ্টিয়ানিটির স্থান নেই এখানে।—আপনি গুলিয়ে ফেলছেন মেৎর! আমি ধর্মের কথা বলেছি, শুবুন্ধির কথা বলেছি—খ্রিষ্টিয়ানিটির কথা নয়।

—দুটোই কি সমার্থক নয়?

—না। ম্যাক্সম্যুলার-এর একাল ভলুম বই এপর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে : The Sacred Books of the East—প্রাচ্যের বহু ধার্মিকের কথা তিনি শুনিয়েছেন, যাঁরা খ্রীস্টান নন, অধিকাংশই যীসাস্-এর পূর্বসূরী।

—ঠিক কী বলতে চাইছ আমাকে বুঝিয়ে বল তো?

—আপনি ঐ নরকের দ্বারের মাথায় একজন মানুষকে গড়ুন। সে ভাবছে! ভাবছে, আর ভাবছে! চিন্তা করছে—কী ভাবে ঐ নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

—মিকেলাঞ্জেলো যেমন মের্দিচ চ্যাপেলে গড়েছিলেন চিন্তামগ্ন ডিউক অব আরবিনোর মূর্তি?

—না! ডিউক ভাবে তার ডিউকডাম্-এর কথা। সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার কথা সে ভাবে না।

—তবে কি দান্তের মূর্তি! মহাকবি দান্তে বসে ভাবছেন?

—না, না, না! কবিও নয়! আমি চাইছি—নিতান্ত সাধারণ মানুষ। অত্যন্ত বলিষ্ঠগঠন, পেশীবহুল। অভিজাত নয়, কবি নয়, পণ্ডিতও নয়। সে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শক্তিশালী, সে দরদী অথচ সর্বহারা!

—দরদী অথচ সর্বহারা! সে কার প্রতীক?

কবি রিলকে অনেকক্ষণ জবাব দিল না। সে ভাবছে, ভাবছে, আর ভাবছে। তারপরে ধীরে ধীরে বললে, মেৎর! আমার কবি-কল্পনায়—তার ঠাকুর্দা ছিল সম্পন্ন মালিক চাষী, বাপ ছিল ভাগচাষী, সে নিজে জীবন শুরু করেছিল মজুর-চাষী হিসাবে—বর্তমানে সে কারখানার শ্রমিক।

এবার অগুস্ত্ ভাবতে বসল। সে ভাবছে, ভাবছে, আর ভাবছে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কবি! তার মানে তুমি কি চাইছ যে, আমি ওখানে আমার সেলফ্-পোর্ট্রেট গাড়ি?—একথা কেন বলছেন?

—আমার ঠাকুর্দা ছিলেন নর্মাণ্ডর একজন সম্পন্ন মালিক-চাষী। পাপা রোদ্যা প্রথম জীবনে ছিল ভাগচাষী, মধ্য-জীবনে মজুর-চাষী, শেষ জীবনে সরকারী বেতনভুক সামান্য পিওন। আমি জীবন শুরু করেছি দিন-মজুর হিসাবে আর

শেষ করছি 'নরকের দ্বারে।'

রিল্কে বলে, তাহলে আপনার মানসপুত্রকেই বসিয়ে দিন নরকের প্রবেশ-তোরণের উপরে: 'দ্য থিংকার'। সে ভাবছে! ভাবছে! ভাবছে—কেমন করে এই মানবিকতার অবক্ষয়কে রোখা যায়। যন্ত্রদানব তিল তিল করে শ্রমজীবীদের কজা করছে—গাঁয়ের সরল সুখী আনন্দঘন মানুষকে ঘাড়ে ধরে টেনে আনছে কারখানার কুলিবস্তির কুস্তীপাকে—

অগুস্ত্ হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। রিল্কে দুটি হাত তুলে নিয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বলে, কবি! এই অবক্ষয় থেকে মানুষের কি আর পরিগ্রাণ নেই?

—সে কথাই তো ভাববে আপনার মানসপুত্র: দ্য থিংকার!

—না, না, না! আমি শিপ্পের কথা বলছি না! বাস্তব দুনিয়ার কথা বলছি!

—আমিও তো তাই বলছি মেংর! আপনি...আপনি কার্ল মার্কস্-এর নাম শুনেছেন?

—কার্ল মার্কস্! না। কী করে লোকটা?

—1883-তে তিনি মারা গেছেন। তাঁর একটা মহাগ্রন্থ আছে, 'দাস্ ক্যাপিতাল'। আমি আদ্যন্ত পড়েছি। আপনি এইমাত্র যে প্রশ্নটা করলেন, তিনি তারই উত্তরটা খুঁজেছেন। ভেবেছেন—সারা জীবনভর শুধু ভেবেছেন!

—ভেবে কোনও কুলিকিনারা বার করতে পারেননি?

—আমি জানি না মেংর। লেনিন বলে, হ্যাঁ পেরেছিলেন।

—লেনিন! লেনিন কে? কী করে লোকটা?

—আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। আপনার আমার মতই নিছক পাগল একটা। তবে তফাৎ আছে। আমি গড়তে চাই নতুন কবিতা, আপনি গড়তে চান নতুন ভাস্কর্য, আর ও গড়তে চায় একটা নতুন সমাজ। আর, কী করে লোকটা? আপাতত সাইবেরিয়ার বন্দীশিবিরে মাটি কোপায়!



একদিন দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল রিল্কে। ও স্বপ্নে দেখেছিল—একদল চোর এসে মেংর-এর মূর্তিগুলো পাচার করছে। একে একে উধাও হয়ে যাচ্ছে—সুজঁ, উষা, দানেন্দ, দ্য কিস্! রিল্কে প্রতিবাদ করতে পারছে না—হাত-পা বাঁধা

অবস্থায় তাকে ওরা ফেলে দিয়েছে ঐ নরকের কুস্তীপাকে।

দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাওয়ায় ও স্বস্তি পেল। উঠে এক গ্লাস জল খেল। পকেট-ঘড়িটা ছিল টেবিলের উপর। ডালা খুলে দেখল, রাত দেড়টা। হঠাৎ ওর মনে পড়ল—সন্ধ্যায় সে নিজেই সবার শেষে স্টুডিও ছেড়ে এসেছে এবং মনে হচ্ছে স্টুডিওর দরজাটা বন্ধ করে আসতে ভুলেছে। হয়তো সেই অবচেতনের আশংকাটাই জন্ম দিয়েছে এ দুঃস্বপ্নের। রিল্কে উঠে পড়ে, ওভারকোটটা গায়ে চাপায়। তাকে তখন একবার দেখে আসতে হবে স্টুডিও তালাবন্ধ আছে কি না।

ম্যুদ'-র এ বাড়িটা দ্বিতল। এক তলার সবটা স্টুডিও আর গুদাম। তারই একান্তে তিনটি গেস্ট-রুম। একটিতে বর্তমানে রিল্কে থাকে। বাকি দুটি তালাবন্ধ। বিশিষ্ট অতিথি কেউ এলে ঘর খোলা হয়। মেংর আর মেরী-রোজ থাকেন দ্বিতলে—ড্রইং, ডাইনিং, লিভিং-রুম সবই দ্বিতলে।

ফেব্রুয়ারী মাস। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রিল্কে দরজা খোলার আগে ভালো করে সর্বাস্র ঢাকলো গরম পোষাকে। তারপর চণ্ডা বারান্দা দিয়ে চলল প্রাসাদের পূর্বপ্রান্তে স্টুডিওর দিকে।

দূর থেকেই নজর হল—যা ভেবেছে তাই! স্টুডিও-র দরজাটা হাট করে খোলা! এই ঠাণ্ডায়! রিল্কে একটা মাঝারি মাপের পাথরের চাঁই তুলে নিল হাতে। প্রয়োজনে সেটাই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। স্টুডিও-র দরজার কাছাকাছি পৌঁছে সে দেখল ভিতরে মোমবাতি জ্বলছে। অতি সন্তর্পণে খোলা দরজা দিয়ে সে উঁকি দিল।

না, চোর নয়। মালিক। একটা গরম ড্রেসিং গাউন গায়ে মেংর ক্রমাগত পদচারণা করছেন। তার হাত দুটি পিছনে—দুটো হাতই কাদা-মাখা। ওয়ার্ক-টুলে কী একটা অসমাপ্ত মূর্তি। অগুস্ত্ মাঝে মাঝে সেটার দিকে তাকাচ্ছে, মাঝে মাঝে সরে যাচ্ছে জানলার ধারে। কাচের জানলা, সারি সারি শিক শুধু সে জানলায়। কাদামাখা দুটো বলিষ্ঠ হাতে কখনও বা ঐ শিক চেপে ধরছে—দেখছে তারাভরা নৈশ আকাশটাকে। তারপর আবার ফিরে আসছে স্টুডিওর মাঝামাঝি। শুরুর হচ্ছে তার পদচারণা, ছোট ছোট, গুঁঠিত, নম্র, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃত্তে, ঘুরছে আর ঘুরছে;—যেন পিঞ্জরাবদ্ধ শাদু'ল। রিল্কে কোনও সাড়া দিল না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি ফিরে গেল তার শয্যা।

দিন কতক পরে একদিন হঠাৎ অগুস্ত্ ওকে ধমক দিল,
কবিতা টাঁকতা লেখা হচ্ছে আজকাল? না-কি পুরোপুরি
মাছিমাঝে কেরানি হয়ে গেলে?
রিল্কে হেসে বলে, নাঃ, ইতিমধ্যে' লিখিনি কিছু।
ইন্স্পিরেশন পাই না।

—ইন্স্পিরেশন! মাই ফুট! শিম্পের জগতে ইন্স্পিরেশন
বলে কিছু নেই! বুঝলে? হাঙেড পারসেন্ট পারস্পিরেশন!
ক্রমাগত কাজ করে যাও। গড় আর ভাঙ, গড় আর ভাঙ—
যতক্ষণ না নিজেকে সন্তুষ্ট হবে! অভ্যাসে এমন হবে যে,
তোমার হাত দুটো বাধ্য হবে রসোত্তীর্ণ শিম্প গড়তে!
অন্তর্লীন ভাবনাটা যতক্ষণ না মূর্ত হচ্ছে ততক্ষণ হাতকে ছুটি
দেবে না। বুঝেছ?

—আপনি যা বললেন মেংর, তা হয়তো ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য। কিন্তু কবিতা কি ওভাবে কেউ লিখতে পারে?
অগুস্ত্ এগিয়ে এসে ওর কাঁধটা খামচে ধরল। বলল, আলবৎ
পারে! খাতা-কলম নিয়ে এক্ষণি বেরিয়ে পড়—যে-কোন
জায়গায় গিয়ে বসে পড়। প্রকৃতিকে দেখ! দেখ, দেখ আর
দেখ! প্রতিজ্ঞা কর: তোমার হাত যতক্ষণ না কবিতাটাকে
পয়দা করতে না পারছে ততক্ষণ তাকে ছুটি দেবে না। যাও!
বিদেয় হও!

—কোথায় গিয়ে বসে পড়বে?

—যেখানে খুশি। চিড়িয়াখানাতেই শ্রাও না। যে কোনও
জন্তুর খাঁচার সামনে বসে পড়বে। জন্তুটাকে দেখবে। সে
কী ভাবছে বুঝে নেবার চেষ্টা করবে! তবে ঐ—যতক্ষণ না
মনোমত কবিতাটা পয়দা হচ্ছে ততক্ষণ ছুটি নেই।

সৈনিক যে নিষ্ঠায় সেনাপতির আদেশ মানে, সেভাবেই রিল্কে
সারাদিন অভুক্ত বসে রইল পারী চিড়িয়াখানায় একটা খাঁচার
সামনে। সন্ধ্যা বেলা যে ফিরে এল যখন, তখন তার খাতায়
লেখা হয়েছে একটা কবিতা:

চিতাবাঘ

চিড়িয়াখানা, পারী—

সারি-সারি শিক শূধু—দৃষ্টি তার যখনই যোঁদিকে;

তাই ক্লান্ত, কিছু ধরা দেয় না সেখানে আর।

যেন সব অস্তিত্ব নিঃশেষ হলো অফুরন্ত শিকে,

আর ঐ বাধার ওপারে নেই জগৎসংসার।

শক্তির নর্তন এক, কেন্দ্রে যার অপ্রতিহত
বিশাল ইচ্ছার বেগ অবরুদ্ধ, জড়ত্বে বিলীন—
ঐ দৃষ্ট গতি আর পদক্ষেপ যেন সেইমতো,
যা ঘোরে, গুপ্তিত, নম্রা, ক্ষুদ্রতম বৃত্তের অধীন।

শূধু মাঝে-মাঝে তার চোখের খড়খড়ি খোলে
নিঃশব্দে যখন...কোনো চিত্র, অস্থিতে মজ্জায়
তখনই ছড়িয়ে পড়ে, কম্পমান স্তব্ধ অঙ্গে ঢেউ তোলে;
তারপর, হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হ'য়ে থেমে যায় ॥

(বুদ্ধদেব বসু-কৃত অনুবাদ)

সামান্য কারণে ভুল-বোঝাবুঝি। বিনা-মাইনের চাকরি
থেকে একদিন বরখাস্ত হল রিল্কে। দূরে সরে গেল
কবি—তিলমাত্র অভিমান না করে, যদিও দোষটা শতকরা
শতভাগ অগুস্ত্-এর।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম:

ক্রমাগত আন্-এ্যাপয়েন্টেড দর্শনার্থীর ভীড়ে অগুস্ত্ বিরক্ত হয়ে
রিল্কে-কে বলে রেখেছিল, সে যখন স্ট্রুডিও-তে মূর্তি গড়বে
তখন যেন কাউকে ঢুকতে না দেয়। দর্শনার্থীর নাম-ধাম যেন
লিখে রাখবে, প্রয়োজনটাও এবং তেমন-তেমন বুঝলে একটা
এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। রিল্কে কঠোরভাবে সেটা মেনে চলত।
একদিন অগুস্ত্ স্ট্রুডিও থেকে বের হয়ে এলে রিল্কে যে
নামগুলো শোনালো তার ভিতর একটি নাম ছিল—‘চোলে’।

—হাঁ, চোলে! কোথায় সে?

—তঁর কোনও এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না তো। তাই স্ট্রুডিওতে
তাকে ঢুকতে দিইনি।

—সে কি! চোলে এতদূর ম্যুর্দতে এল আর তুমি তাকে
তাড়িয়ে দিলে?

রিল্কে অবাক হয়ে যায়। বলে, তাঁকে আমি এ্যাপয়েন্টমেন্ট
দিতে চাইলাম পরের বুধবারে, তা তিনি রাজি হলেন না।

—তার ঠিকানা রেখে গেছে?

—না, ঠিকানাও চেয়েছিলাম, তিনি দেননি।

বিনা-মাইনের চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার এটাই হেতু।
‘চোলে’ একজন ফরাসী নাট্যকার, অগুস্ত্-এর বন্ধু; তখনও
স্বীকৃতি পায়নি। অগুস্ত্ বহু খুঁজে খুঁজে দিন-পনের পরে
চোলে-র পাত্তা পায়। ক্ষমা ভিক্ষা করে; বলে এজন্য সে

তার সেক্রেটারিকে বরখাস্ত করেছে। চোলে অত্যন্ত দুর্গন্ধত হয়। বলে, কিন্তু তোমার সেক্রেটারি তো আমার সঙ্গে কোনও অভদ্র ব্যবহার করেনি।

—কিন্তু তুমি ম্যুর্দকে এসেছিলে কেন?

—কিছু টাকা ধার করতে। অদ্যভক্ষ্যধনুগুণ অবস্থা হয়েছিল বলে।

—বুঝলাম। বল, কত দেব?

চোলে হেসে বলল, ধন্যবাদ বন্ধু! আজ আর কিছু চাই না। ইতিমধ্যে আমার একটি নাটক গৃহীত হয়েছে। আগাম পেয়ে গেছি।

এরপর বাধ্য হয়ে অগুস্তকে পারীতে চলে আসতে হ'ল। এত এত সম্মানীয় অর্থাথকে সে গাঁয়ের বাড়িতে রাখবে কোথায়? সপ্তম এডওয়ার্ডের পরে ওর হবু-খন্দের হতে চলেছেন মার্কিন-মূলকের তিন ধনকুবের। পারীই তাদের পক্ষে উপযুক্ত স্থান।



অগুস্ত এখন পারীর 'ওতেল ডাক দ বিব'র-গোটা একতলাটা ভাড়া নিয়ে স্টুডিও খুলেছে। তার উপরের তলার ভাড়াটিয়া ডি ম্যাক্স, অঁরি মাতিস্, ইসাডোরা ডানকান ইত্যাদি। সেখানেই একদিন দেখা হয়ে গেল আবার রিল্‌কের সঙ্গে।

অগুস্ত এমনভাবে তাকে বুকে টেনে নিল যেন প্রত্যাগত 'প্রডিগাল সান'। বললে, হ্যাঁরে! আমার উপর রাগ করে আছিস্ নাকি? তুই কী পাগল রে!

রিল্‌কে হেসে বলে, আপনিই কি কম পাগল?

—তুই আমার হোট্টেলে চলে আয়। অনেক-অনেক চিঠি আবার জমে গেছে। জবাব দেওয়া হয়নি।

রিল্‌কে রাগ করতে পারে না। কী শিশুর মতো সরল উনি! রিল্‌কে এতদিনে একজন প্রতিষ্ঠিত জার্মান কবি—অথচ উনি অনায়াস-ভঙ্গিমায় বলছেন বিনা-বেতনের সচিবের চাকরিটা আবার গ্রহণ করতে! বলে, এ আর বেশি কথা কি? চিঠির পাহাড় যখন রাজা অগীয়াস্ জমিয়ে রেখেছেন তখন এ হারকিউলিসকেই তা ক্লিয়ার করতে হবে। কাল থেকেই লেগে যাব।

পরদিন সেই না-খোলা চিঠির বাঁগল সাফা করতে বসে রিল্‌কে অনেক লেফাফা আবিষ্কার করেছিল—বিদেশী ডাক-টিকিট-সাঁটা খাম—যার উপর ঠিকানা লেখা: 'রোদ্যাঁ,

ভাস্কর, ফ্রান্স'।

সে চিঠিও ডাক-বিভাগ পৌঁছে দিয়েছে শিম্পীকে।

এলিসি প্যালেসে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি একটা ডিনার থেকা করেছেন। আমন্ত্রণপত্রের উপর লেখা হয়েছে 'ফরাসী দেশের শিম্পে মস্যুয়ে অগুস্ত-রোদ্যাঁর অবদানকে সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে...' পারীর যাবতীয় শিম্পী, শিম্পোৎসাহী, জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরা আমন্ত্রিত।

সেইরাতে অগুস্তের জীবনে একটা সুদূরপ্রসারী ঘটনা ঘটল। ও পরিচিত হল এক মধ্যবয়সী মহিলার সঙ্গে: ডাচেস্ অব্ শোয়াজোল।

আমেরিকান মহিলা, বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে এবং তার উপর পড়েছে উগ্র প্রসাধনের প্রলেপ। একজন ফরাসী ডিউকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ—কিন্তু বন্ধন শুধু নামে ও ব্যাঙ্কের পাশবইতে। ডিউক থাকেন পৃথক প্রাসাদে, তাঁর মিস্ট্রেস্-এর সঙ্গে। ডাচেস্ সে সন্ধ্যায় তার নানাবিধ গুণাবলীতে অগুস্তকে মত্তমুগ্ধ করে তুলল; তার সবচেয়ে বড় গুণ: রোদ্যাঁ ভাস্করের পুণ্ডানু-পুণ্ড তথ্য। শিম্পী কবে কোন মূর্তি গড়েছেন, কোন প্রতিকৃতি তাঁর বিষয়ে কী লিখেছে, কবে কোন্ পুরস্কার-তিরস্কার বর্ষিত হয়েছে তা তাঁর লিপিস্টিক-রঞ্জিত ঠোঁটস্থ। তা সেসব খবর হয়তো থেরেস্-পিসির বৈঠকখানার চার-দেওয়ালও বলতে পারে; কিন্তু ডাচেস্ আরও কিছু তথ্য সরবরাহে সক্ষম: কোন্ মূর্তির কতগুলি কপি করা হয়েছে, কোন্ সংগ্রহশালা কোন ভাস্কর্য কত দামে কিনেছে, এমন কি কোন শিম্পিবিক্রেতা কত কমিশন পেয়েছে!

ডাচেস্ অব শোয়াজোল আর্ট-কনোশার নয়, শিম্প-বাজারদরের কনোশার। সে নিজেই আর্ট-ডীলার।

অগুস্ত অবাক হয়ে বললে, এত তথ্য কেন মুখস্থ রেখেছেন? ধুরন্ধর আর্ট-ডীলার বলল না—'ব্যবসায়ের খাতিরে'; বরং নৌক-নৌক মুখ করে বলল, প্রাণের তাগিদে, 'মন-আমি'! আমি তোমার এক অন্ধ ফ্যান!

অগুস্ত সতর্ক হতে চাইল; পারল না। বোধকরি মাদ্রাতিরন্তু শ্যাম্পেনের প্রভাবে।

মধ্যরাতে পার্টি যখন শেষ হল তখন অগুস্ত একজন খিদ্মৎ-গারকে বলল, একটা গাড়ি ডেকে দিতে। শোয়াজোল

যথারীতি খুলিছিল অগুস্তের কনুই ধরে—সারা সন্ধ্যাই সে আঠার মতো স্টেটে আছে—হাঁ-হাঁ করে আপত্তি জানালো। বললে, নিচে আমার অটো আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবার দায় আমার।

অটো মানে মটোরগাড়ি—অগুস্ত্ দু-নাকে দেখতে পারে না। মিট্রি-কা-তেল-এর গন্ধটা সহ্য হয় না ওর। প্যালেস্ থেকে নেমে এসে দেখল—ডাচেস্-এর টু-সীটার মার্সেডিস্ খাড়া আছে প্রতীক্ষায়। জার্মান মডেল, 1901 সালের। ডাচেস্ নিজেই চালানো পুষ্পকরথ। টুপি সামলে অগুস্ত্ খোলা হাওয়া খেল প্রাণভরে। হোটেল বিরাটে যখন পৌঁছালো তখন মধ্যাহ্ন অনেকক্ষণ অতিক্রান্ত। এতরাতে ভদ্রমহিলাকে দ্বার থেকেই বিদায় দিতে চাইল অগুস্ত্; কিন্তু ডাচেস্-এর উৎসাহ অসীম—অগুস্ত্ কী বানাচ্ছে না দেখে গেলে রাতে নাকি তার ঘুম হবে না। অগত্যা গাড়ি পার্ক করে দুজনে তালা খুলে স্টুডিওতে ঢুকল।

অভিজ্ঞ পাঠক যা আশঙ্কা করছেন সেই দুর্ঘটনাই ঘটল। অর্থাৎ মার্সেডিস্-এর সর্দি লাগল।

রাতের বারিক ক-ঘণ্টা টু-সীটার মার্সেডিস্টা ঠাণ্ডায় জমে উঠেছিল বলে পরদিন সকালে স্টার্ট নিতে তাকে অনেকবার ঝকঝক করতে হল।

সেই শুরু। এর শেষ কোথায় অগুস্ত্ জানে না। হাল ছেড়ে ভেসে চলেছে সে। ডাচেস্ সব বিষয়েই পারদর্শী—এমন কি শয্যাসজ্জনী হিসাবেও।

সেটা 1904 সাল। অগুস্তের বয়স চৌষাট। তবু সেই পোড়-খাওয়া মানুষটাকে ঘিরে অদ্ভুত মোহজাল বিস্তার করল মহিলাটি। সকাল থেকে সন্ধ্যা মার্সেডিস্টাকে দেখা যেত হোটেল বিরাট সামনে; কখনও বা সন্ধ্যা থেকে সকাল।

বন্ধুবিচ্ছেদ হল একের পর এক। প্রথমেই গেল রিলকে। স্পর্শভাবে বললে, মেৎস! আপনি ঐ সাইরেনের মায়াজালে শিকার হচ্ছেন কিন্তু।

অগুস্ত্ বললে, কাল থেকে আর তোমাকে দরকার হবে না।

—বুঝেছি! ডাচেস্ এরপর আপনার চিঠিপত্রের জবাব লিখবেন, এই তো?

মাস দু-তিনের ভিতর অগুস্ত্ লক্ষ্য করল, ওর বন্ধু-বান্ধব আর ছাত্ররা ওকে এড়িয়ে চলেছে। অগুস্ত্ তখন ডাচেস্-এর একটি হেড-স্টাড বানাতে ব্যস্ত। বন্ধু-বান্ধবেরা যে ওকে

পরিহার করে চলেছে এটা খেয়াল হল না। হেডস্টাডটা ডাচেস্-এর পছন্দ হল না কিন্তু। বললে, তুমি আমাকে বুড়ি করে গড়েছ।

—তুমি কি ছুঁড়ি?

—না, তা নই। কিন্তু এতটা বুড়িও আমি নই।

অগুস্ত্ বলে, শোন, হক্-কথা বলি! রঙ মেখে আমার চোখকে ভুল বোঝাতে পার; কিন্তু আমার আঙুলকে ওভাবে ধাক্কা দেওয়া যায় না, মন্-চেরি!



চিত্র—১৪ : ডাচেস্ অব শোয়াজোল (190৪)

এ বছরই অগুস্ত্ আবার লওনে যায়। শিম্পী হুইস্‌লার ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব পেইন্টার্স', স্কাপটাস্ এ্যাণ্ড এন্‌গ্রেভাস্'-এর সভাপতি; সম্প্রতি তিনি প্রয়াত হবার পর সভ্যরা ফরাসী শিম্পী অগুস্ত্ রোদ্যাকে ঐ সম্মানীয় পদটি অলঙ্কৃত করতে আহ্বান জানানেন—সে উদ্দেশ্যেই ইংল্যান্ড সফর। গ্ল্যাস্‌গো এবং অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় অগুস্ত্কে অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রি দিল। অক্সফোর্ডে ওর পাশের সীটে বসেছিলেন একজন মার্কিন ভদ্রলোক—এক মাথা উন্মোখস্কে ধপ্পে সাদা চুল—তিনিও বই-টাই লিখে থাকেন। কী নাম যেন? হ্যাঁ, মার্ক টোয়েন। অক্সফোর্ডের ডক্টরেট হওয়ায় যে ডজন-ডজন অভিনন্দন পত্র পায় তার একটির তলায় সই ছিল—মারিয়া রিলকে!

বছর পাঁচেক পরে, 1909 সালে ভিক্টর য়াগোর এতকালের অনাদৃত মূর্তিটি পারীর প্যালে-রয়্যাল উদ্যানে প্রতিষ্ঠিত হল। আরও একটি আনন্দের কথা—'মানে'র এতকালের প্রত্যাখ্যাত

তৈলচিত্র ‘অলিম্পিয়া’ ঐ বছর ল্যুভরে ঠাঁই পেল। পরের বছর ফরাসী সরকার অগুস্ত্কে সর্বোচ্চ সম্মান-উপাধিতে ভূষিত করলেন—‘গ্র্যাণ্ড অফিসার অব দ্য লীজেন অব্ অনার।’ বলা যায়, যা ভারতের ‘ভারতরত্ন’ের সমতুল্য !

এর পরেই বিনা মেঘে বজ্রপাত ! দেনার দায়ে হোটেল বিরঁ গেল বিকিয়ে। ফরাসী সরকার দখল করলেন প্রাসাদটা ; নিলামে বিক্রয় করলেন। দর উঠল ষাট লক্ষ ফঁা ; কিন্তু ক্রেতা সর্ত করলেন—ফাঁকা বাড়ি তাঁকে হস্তান্তরিত করতে হবে। অগত্যা ভাড়াটিয়ারা নোটিশ পেলেন—অনতিবিলম্বে হোটেল ছেড়ে যেতে হবে।

চোখে অন্ধকার দেখল অগুস্ত্। সেটা 1910 সাল। ওর বয়স সত্তর। এ বয়সে সে আর ঠাঁইনাড়া হতে চায় না। চাইলেও পারবে না। শরীর-মনে সে জোর নেই। অগুস্ত্ সর্বান্তঃকরণে চাইছিল জীবনের বাকি কটা বছর ঐ হোটেল বিরঁ-র স্টুডিওতে কাটিয়ে দিতে। নোটিশ পেয়ে ইসাডোরা ডানকান, মাতিস্ প্রভৃতি সবাই বাড়ি ছেড়ে দিল ; দিল না একা অগুস্ত্। পরিবর্তে সে একটা অদ্ভুত আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিল সরকারকে। অগুস্ত্ রোদাঁ তার যাবতীয় ভাস্কর্য ফরাসী সরকারকে দান করতে প্রস্তুত—যার মূল্য ষাট লক্ষ ফ্রাঁর কাছাকাছি, বেশি না হলেও - প্রতিদানে সে তিনটি প্রতিশ্রুতি চায়। এক : জীবনের বাকি কটা বছর অগুস্ত্কে হোটেল বিরঁ-তে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে দিতে হবে। দুই : তার দেহাবসানের পরে হোটেল বিরঁ হবে ‘রোদাঁ মিউজিয়ম’, সেখানে সংরক্ষিত হবে তার যাবতীয় শিল্প এবং অন্যান্য ঘরে শিল্পশিক্ষার্থীদের ক্লাস, সেমিনার, লেকচার। তিন : অগুস্ত্ যদি আগে মারা যায় তাহলে মেরী-রোজ-বুয়েকে তার জীবিতকালে মাসিক পাঁচশ ফ্রাঁ মাসোহারা দিতে হবে।

তিন-নম্বর সর্তটা কিছুই নয়। প্রথমটাও এমন কিছু নয় সত্তর-বছরের বুড়োর পক্ষে। প্রশ্ন হল দু-নম্বর সর্তটা। অগুস্ত্-এর যাবতীয় শিল্পকর্মের আর্থিক মূল্য কত ? সরকার প্রথমেই পাঠালেন কিছু অফিসারকে—তদন্ত করে ‘ইনভেস্টিগেট’ তৈরী করতে - অর্থাৎ হিসাব নিকাশ।

গুণ্টি করে দেখা গেল - হোটেল বিরঁতে আছে : ছাপ্পান্নটি মার্বেল এবং ছাপ্পান্নটি ব্রোঞ্জ মূর্তি ; একশ তিরানব্বইটি প্রাস্টার-কাস্ট ; একশটি পোড়া মাটির ভাস্কর্য বা টেরাকোটা ; হাজার দুই স্কেচ ও ড্রইং ; শত শত দামী শিল্প সংগ্রহ—গ্রীক,

রোমক, ভারতীয়, কাথোডিয়ান মিশরীয় শিল্পের অরিজিনাল। কলাবিদগণেরা বহু যোগ-বিয়োগ করে বললেন সর্বসমেত মূল্যমান ঐ ষাট-লক্ষ ফ্রাঁ !

অগুস্তের শত্রু সংখ্যাই তখন উচ্চমহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যাত হল প্রাথমিক পর্যায়ে। অগুস্তের বন্ধু ও শুবানুধ্যায়ীরা তখন সংবাদপত্রে অভিযান শুরু করল। ফরাসী সরকার অন্যায্যভাবে নিগৃহীত করছে ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে। যাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ডক্টরেট দিয়েছে—‘অনারারি কজ’ ; যাকে ফরাসী সরকার সম্প্রতি দিয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান : ‘ফ্রান্সরত্ন’ ! খবরের কাগজকে সবাই ডরায়। মন্ত্রিপরিষদ পুনর্বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অগুস্তের ঝাঁরা প্রভাবশালী শুবানুধ্যায়ী ছিলেন সকলেই একে একে সরে গেছেন দুনিয়া থেকে—গ্যাম্বোতা, এমিল জোলা, কর্ভি ম্যালার্মে প্রভৃতি। তবু গোটা দুনিয়াই এখন তার পিছনে। এই সময়েই আর একটি ঘটনা ঘটল যাতে সংবাদপত্রের একটি বৃহৎ অংশ—বহুত সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকাগোষ্ঠী অগুস্তের বিপক্ষে চলে যায়। ঘটনা সামান্য এবং অসামান্য :

জাপান থেকে একটি ব্যালে গ্রুপ নিয়ে পারীতে নাচের প্রোগ্রাম করতে এল নিজিন্স্কি। প্রায়-কিশোর নৃত্যশিল্পী। রাজনৈতিক দলাদলি আর খাওয়া-খাওয়িয়ে অগুস্ত্ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হোটেল বিরঁ-র চিন্তা থেকে সাময়িক মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সে উদ্বোধনের দিন দুখানি থিয়েটারের টিকিট কাটল—সবচেয়ে দামী ‘বক্স’-এর। ডাচেস্ অব শোয়াজোলকে সঙ্গে নিয়ে গেল নাচের আসরে।

যদিও দর্শক হিসাবে এসেছে তবু প্রেক্ষাগৃহের লাউঞ্জে সাধারণ মানুষ চিনে ফেলল তাকে, ঘিরে ধরল তাদের প্রিয় শিল্পীকে—যাকে সম্প্রতি ‘ফ্রান্সরত্ন’ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এবং যাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে ফরাসী সরকার।

তরুণ শিল্পীর নৃত্যে অগুস্ত্ অভিভূত হয়ে গেল। নাচটি ছিল—‘L’Après-midi d’un Faune’—স্যাটির-এর আক্রমণে হতভাগ্য ‘ফন’-এর মৃত্যু। নিজিন্স্কির ছিল ‘ফন’-এর ভূমিকা। অভিনয়-শেষে অগুস্ত্ গ্রীনরুমে এসে কিশোর শিল্পীকে অভিনন্দন জানালো। নিজিন্স্কি এবড় সম্মানে স্তম্ভিত ; তার অভিভাবক এবং নৃত্য-দলের ম্যানেজার দিয়াঘিলেভ্ বারে বারে মাজা ভেঙে ‘বঁজু’ করল মহান-শিল্পীকে। অগুস্ত্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললে, তোমরা তো

মাংসখানেক আছ পারীতে। রোজ দুপুরে ঘণ্টা-খানেক করে যদি নিজনিষ্ক সিটিং দিতে পারে তাহলে আমি ওর একটা মূর্তি গড়তাম !

নিজনিষ্ক এমন দৃষ্টি মেলে তাকালো যেন, সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে !

পরদিন সকালে সংবাদ পত্র খুলে অগুস্ত্ অবাক হয়ে গেল। পারীর সবচেয়ে বিখ্যাত কাগজ ‘ফিগারো’-তে সম্পাদক মসুয়ে কাল্মেং কদর্য ভাষায় আক্রমণ করেছেন ঐ জাপানী ন্তাশিঙ্গীর অনুষ্ঠানকে। আক্রমণের মূল বক্তব্য : ন্তাটি অশ্লীল !

অগুস্ত্ ক্ষেপে গেল। সচরাচর সে কাগজে বাদানুবাদে অংশ নেয় না ; কিন্তু তার মতে নিজনিষ্কর ন্তা একটি অসামান্য রসোত্তীর্ণ শিঙ্গ। সে চুপ করে থাকতে পারল না। নিজনিষ্কর ন্তোর প্রশংসা-সূচক একটি সমালোচনা লিখে পাঠিয়ে দিল ‘ফিগারো’র প্রতিদ্বন্দ্বী সংবাদপত্র ‘মাতিন’-এ। মাতিন-সম্পাদক সেটা লুফে নিলেন ! ফলাও করে ছাপলেন—ফিগারোর সম্পাদকীয় বক্তব্য নস্যং করেছেন স্বয়ং অগুস্ত্ রেনে রোদ্যা ! তাই পরদিন সেটা মাতিন-এর হেড-লাইন নিউজ হল।

কিন্তু সংবাদপত্রের বিতণ্ডা তো শেষ হবার নয়। তার পরদিন ফিগারোর সম্পাদক মসুয়ে লম্বা প্রবন্ধ ঝাড়লেন—প্রমোদ-পৃষ্ঠায় নয়, সম্পাদকীয়তে। এবার আক্রমণের টাগেটি নিজনিষ্ক নয়, স্বয়ং রোদ্যা। শেষাংশে বলা হয়, “আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছি ফরাসী সরকার—বাস্তবে ফরাসী দেশের প্রতিটি ট্যাক্সপেয়ার ঐ বিভ্রাটীল বন্ধ পাণ্ডিত্যমন্ডর জন্য তাদের মাথার-ঘাম পায়ে-ফেলা টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হতে চলেছে ! আমাদের বাধ্য করা হচ্ছে—সরকারী আদেশে—ঐ বিভ্রাটীল ভাস্করকে ষাট লক্ষ ফ্রাঁ মূল্যের ‘ওতেল বীর’ প্রাসাদটি দান করতে, যাতে তিনি জীবনের বারিক কয় বছর ঐ প্রসাদে বসে বসে অশ্লীল মূর্তি বানাতে পারেন ! অশোভন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে পারেন এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তাঁর বিকৃতকামের প্রচার চালাতে পারেন।”

অগুস্ত্ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বোর্দেল নেই, কামীল নেই, ব্যুশ নেই, দুবয় নেই, রিল্কেও নেই ! কার সঙ্গে পরামর্শ করবে ?

কেউ না থাক, ডাচেস্ আছে !

ডাচেস্ বলে, অগুস্ত্ ! একটিই পথ খোলা আছে। তুমি ‘মাতিন’ পত্রিকায় ক্ষমাভিক্ষা করে আবার একটি পত্র লেখ। স্বীকার কর, আগে যা বলেছিল তা ভুল। নিজনিষ্কর শিঙ্গ সত্যিই অশ্লীল ! এখন তুমি বুঝতে পেরেছ।

—কিন্তু সেটা যে চরম মিথ্যা ! যদি বুঝতাম আমার ভুল হয়েছে তাহলে ক্ষমা চাইতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভুল তো আমার হয়নি !

—এটা রাজনীতি ! ফিগারো যদি তোমার পিছনে লাগে, তবে তোমার ‘রোদ্যা-মিউজিয়াম’-এর স্বপ্ন কোনদিনই সফল হবে না।

—কিন্তু ..

—কোনও কিন্তু নেই অগুস্ত্।

রোদ্যার লেটার-হেড-এ ডাচেস্ ঐ মর্মে একটি চিঠি লিখল। ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে। অগুস্ত্ সই করতে স্বীকৃত হল না। ডাচেস্ তখন তার সমুখেই সইটা জাল করে খামটা বন্ধ করল। বেল-বয়কে ডেকে চিঠিখানা যখন বিলি করতে পাঠালো তখনও অগুস্ত্ সম্মোহিত হয়ে বসে আছে।

কিন্তু সে চিঠি ‘মাতিন’ পত্রিকায় আদৌ ছাপা হল না। সম্পাদক ছাপলেন না !

নিজনিষ্ক পরদিনই এল সিটিং দিতে। অগুস্ত্ সব কিছু ভুলে ভুলে যেতে চাইল তার শিঙ্গকর্মে। ডাচেস্কে বারণ করল আসতে। সে যখন কাজে ডুবে থাকে তখন মডেল ছাড়া আর কেউ স্টুডিওতে থাকবার অনুমতি পায় না।

নিজনিষ্ককে পৌঁছে দিয়ে তার গার্জেন দিয়াঘিলেভ্ বিদায় নিল। এক ঘণ্টা পরে এসে সে নিজনিষ্ককে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

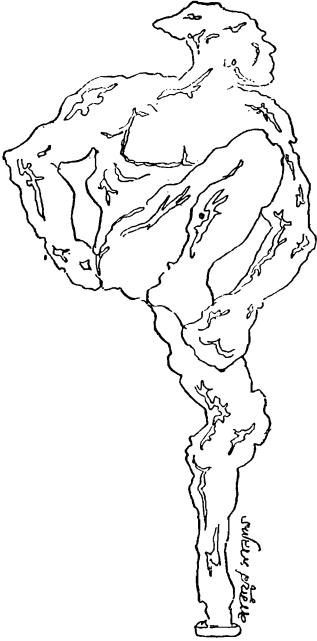
স্টুডিও বন্ধ করে অগুস্ত্ গ্যাস জ্বালল। কফি বানালো। নিজেকে পান করল, নিজনিষ্ককে দিল। ঘরটা কিছু উত্তপ্ত হলে বলল, এবার জামা কাপড় খুলে ফেল।

—জামা-কাপড় খুলে ফেলব !—নিজনিষ্ক স্তম্ভিত !

—হ্যাঁ। ন্যুড গড়ব আমি।

দুর্ভাগ্য একেই বলে। সাতদিনের মাথায় ঘটল ঘটনাটা। পূর্বরাতে নিজনিষ্কর দু-দুটো নাচ ছিল। রাতে ভালো ঘুম হয়নি। সে ক্লান্ত বোধ করছিল। অগুস্ত্ বললে, এক কাজ কর। আধঘণ্টা-খানেক ঘুমিয়ে নাও বরং।

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না। নিজিন্স্কি ডিভান-এ চিং হয়ে শুয়ে পড়ল আর পাঁচ-মিনিটের ভিতরেই ঘুমিয়ে পড়ল। অগুস্ত্ নিজের গরম ওভারকোটটাতে ওর নগ্নশরীর ঢেকে দিয়ে এসে বসল নিজের চেয়ারে। মিনিট দশেকের মধ্যে সে-ও চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল। সেও ক্লান্ত ছিল। দুজনের কেউই টের পায়নি... যথাসময়ে ফিরে এসেছে দিয়াঘিলেভ্। স্টুডিওর দ্বার বন্ধ দেখে সে পাশের কাচের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বজ্রাহত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ওভারকোটটা কখন খসে পড়েছে নিজিন্স্কির নগ্নশরীর থেকে। দিয়াঘিলেভ্ আদৌ জানত না যে, অগুস্ত্ নিজিন্স্কির ন্যূন গড়ছে। সঙ্কেচে কিশোর শিল্পী সে কথা স্বীকার করেনি। দিয়াঘিলেভ্ মারাত্মক ভুল বুঝল! সে সিদ্ধান্তে এল বন্ধ অগুস্ত্ আসলে : সমকামী, হোমো !



চিত্র—৫৯ : নৃত্যরত নিজিন্স্কি (.১১২)

পরদিনই বাকি প্রোগ্রাম নাকচ করে দিয়াঘিলেভ্ রাতারাতি তার কিশোর গচ্ছিতধনকে নিয়ে পালিয়ে গেল লণ্ডনে। অগুস্ত্ অবাক হয়ে গেল। কোন কার্যকারণ সূত্র সে খুঁজে পেল না। বুঝল দিন তিনেক বাদে। 'ফিগারো'-তে প্রকাশিত একটি কার্টুন দেখে !

‘স্যাটীর-কর্তৃক ধর্ষিত ফন’ !

ফন শুয়ে আছে ডিভানে। নগ্ন সে। তার দেহের আধখানা গ্রীক faun-এর মতো, মুখটুকু নিজিন্স্কির। আর তার সম্মুখে লালসায়-লাল বৃদ্ধ Satyr বসে আছে থাবা গেড়ে—তার মুখখানা অগুস্ত্ রোদ্যার !

বজ্রাহত হয়ে গেল অগুস্ত্ও। এমন নিল’জ্জ, নিষ্ঠুর আঘাত সে জীবনে পায়নি। ওর মনে পড়ল লেঅনার্দোর কথা। অনুরূপ মিথ্যা অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে লেঅনার্দো তাঁর সাধের ফ্লোরেন্স ত্যাগ করে স্বেচ্ছা-নির্বাসনে চলে গিয়েছিলেন মিলানে। অগুস্ত্ কোথায় যাবে পারী ছেড়ে ?

ওর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাঁদবে কার কাছে ? কে আছে ওর ? কামীল নেই, বোর্দেল নেই, দুবয় নেই, রিল্কে নেই !

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মেরী-রোজ-বুয়ের কথা। তাকে বহু-বহুদিন দেখেনি, তবু এ দুনিয়ায় ঐ একটা আনপড় বুড়িই আজও বেঁচে আছে যার কাছে সব বেদনা, সব লজ্জা, সব অপমানের বোঝা নিঃসঙ্কেচে নামিয়ে দেওয়া যায়। হোটেলের বেল-বয়কে ডেকে বলল, কাল সকালে আমি ম্যুর্দঁ যাব দিন দশেকের জন্য। গাড়ি চাই সকালে।

সে-রাট্রেই প্রবল জ্বর এল ওর। বেল-বয় বুদ্ধি করে ডেকে আনল ডাচেস্ অব শোয়াজোলকে। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করল ওকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ! বললে, বয়স হয়েছে তো, সাবধানে নার্সিং করতে হবে। দিনে-রাতে দুটি নার্স রাখতে হবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

শোয়াজোল পুরোপুরি রাজি হল না। শুধু বেতনভুক নার্সের জিম্মায় এতবড় সম্পদকে গচ্ছিত রাখা যায় না। নিজেই চলে এল হোটেল বির’-তে। সব দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিল নিজের কাঁধে। অগুস্তের বন্ধু-বান্ধব, ছাত্র ও অনুরাগীরা খবরের কাগজে সংবাদটা জেনে ছুটে এল। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পারল না। শুনল, ডাক্তারের আদেশে বাইরের কারও সঙ্গে অগুস্তের দেখা হবে না। ডাচেস্-এর কাছ থেকে রিপোর্টারেরা প্রতাহ জেনে যায় শিল্পী কেমন আছেন, রক্তচাপ কত, টেম্পারেচার কত। প্রতিদিন তা কাগজে ছাপা হয়।

মাসখানেক রোগে ভুগে অগুস্ত্ একটু সামলেছে। পথ্য করেছে, উঠে বসেছে। বলল, আমার সঙ্গে আজকাল কেউ দেখা করতে আসে না কেন বলত ? সবাই কি বিশ্বাস করেছে

ঐ কার্টুনটার কথা ?

—না। ডাক্তারবাবুর বারণ ছিল। তুমি বেশি কথা বল না।

—এখন তো ভালই হয়ে গেছি।

—না। তুমি এখনও দুর্বল। চুপ করে শুয়ে থাক।

—আমি অসুখের মধ্যে বলেছিলাম মেরী-রোজকে খবর পাঠাতে। তাকে কি খবর দেওয়া হয়েছিল ?

—হয়নি আবার ! তুমি কি ভাব এখনও সে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ? ম্যুর্দার সম্পত্তি গ্রাস করে সে দিবি্য আছে। সেখানেও তো তোমার অনেক মূর্তি আর স্কেচ ছিল—সেগুলো একে একে বেচে দিচ্ছে !

অগুস্ত্ উঠে বসে—বেচে দিচ্ছে ! তুমি কি করে জানলে বেচে দিচ্ছে ?

—তার উপর রাগ কর না মন্-আমি ! পেট বড় অবুঝ।

তা বটে ! অগুস্ত্ আবার ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ে। ওর মনে পড়ে যায় মাদাম লীজা ডেফার্জের কথা। সেও বলেছিল, পেট বড় অবুঝ। লীজা তার অত সাধের স্কেচগুলো একটা একটা করে বিক্রি করে দিয়েছিল। মেরীরই বা দোষ কোথায় ? তবু বলে, কিন্তু আমার এতবড় অসুখের খবর পেয়েও সে ছুটে এল না কেন ? তুমি ঠিক জান—সে খবর পেয়েছিল !

—মন্-চেরি ! তুমি রাম-শ্যাম-যদু নও ! তোমার অসুখের সময় প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে—কবে তুমি কেমন আছ। ম্যুর্দ তো পাশের বাড়ি। হাওয়াই দ্বীপে বসে রোদ্যা-ফ্যান খবর পেয়েছে কবে তোমার টেম্পারেচার কতটা উঠেছে। সারা পৃথিবী জানল, আর সে-মাগী জানল না !

তা বটে।

—আচ্ছা এই একমাসে হোটেল বিরাঁ-র কোনও খবর নেই ? আমার সেই আবেদনপত্রের ?

—চেষ্টার অব্ ডেপুটিস্ বিলটা পাশ করেছেন 391 : 5 ভোটে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এখনও স্বাক্ষর করেননি। এয়ার্টন জেনারেল বলছেন—তোমার ভাস্কর্যের মূল্যায়ন কোনও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দিয়ে পরখ করতে। তাঁর আশঙ্কা, ইতিপূর্বে যারা হিসাব করে বলেছেন যে, তোমার ভাস্কর্যের মোট মূল্য ষাট লক্ষ ফ্রাঁ তাঁরা সবাই ফরাসী—হয়তো তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতই...

—শ্রদ্ধা ! আমাকে কোন ফরাসী শ্রদ্ধা করে ? ঐ কার্টুন

প্রকাশিত হবার পরে ? মেরী-রোজই আমার খোঁজ নেয় না আজকাল—

শোয়াজোল ওকে বাহুবেষ্টনে বেঁধে বলে, আমি তো আছি মন্-চেরি !

অগুস্ত্ বলে, অসুখের পর আর ডানহাতে জোর পাচ্ছ না। এর পর যদি কাজ করতে না পারি, খাব কী ?

—বল্ছি তো ! আমি তো আছি। তোমার সব দায়-দায়িত্ব আমার !

—ভিক্ষা-অন্নে বেঁচে থাকার কথা বল্ছি না আমি !

ডাচেস্ বন্ধুকে পড়ে ওকে চুষন করল। বলল, অগুস্ত্ ! তুমি ইচ্ছা করলে দু-হাত পকেটের ভিতর রেখেও বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ রোজগার করতে পার, তা জান ?

—কেমন করে ? আমি তো নিঃস্ব ! আমার সব ভাস্কর্য তো ফরাসী সরকারকে দান করে বসে আছি।

—কিন্তু চুক্তিনামায় ‘ডুপ্লিকেশন্-রাইট’-এর তো কোনও উল্লেখ করনি তুমি !

—‘ডুপ্লিকেশন্-রাইট’ ! তার মানে ?

—তুমি এখনও শিশু, অগুস্ত্ ! অরিজিনাল মূর্তিগুলিই তুমি ফরাসী সরকারকে দান করেছ ; কিন্তু সারা বিশ্বে তোমার চাহিদার কথাটা ভেবে দেখেছ ? আমার হিসাবে তোমার স্বাক্ষরিত ডুপ্লিকেট-মূর্তিগুলির যা চাহিদা, তাতে অনায়াসে তুমি—

অগুস্ত্ উৎসাহে উঠে বসে : কী আশ্চর্য ! কী অপরিমীম আশ্চর্য ! একথা তো আমার একদম খেয়াল হয়নি ! কিন্তু তা হলেও আমাকে একটা অফিস খুলে বসতে হবে। তারও খরচপত্র আছে, ব্যবস্থাপনা আছে, আমার বর্তমান স্বাস্থ্য—

—সবই আমি ভেবে রেখেছি। তোমাকে কুটোটি নাড়তে হবে না। এই দেখ—

পোর্টম্যান্টো খুলে স্ট্যাম্প-কাগজ আর ডেমি-পেপারে টাইপ-করা একটা দলিল বার করে আনল ডাচেস্। বলে, পড়ে দেখ—

চুক্তিনামায় বলা হয়েছে আগুস্ত্ রেনে রোদ্যা তাঁর যাবতীয় ভাস্কর্যের ‘ডুপ্লিকেশন্-রাইট’ নিব্যাট-সত্ত্বে দান করছেন ‘ডাচেস্’ অব্ শোয়াজোল এ্যাণ্ড এ্যাসোসিয়েটস্’কে। বিক্রয়-লব্ধ অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ এজেন্টের, অর্থাৎ শোয়াজোল-এর এবং এক-তৃতীয়াংশ শিম্পীর। চুক্তিনামার সঙ্গে একটি সম্ভাব্য প্রাককলন

পিন দিয়ে সাঁটা,—তাতে জানা যায়, শিম্পীর বাৎসরিক আয় হবে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ।

আদ্যন্ত পড়ল অগুস্ত্। একবার, দুবার। চোখ তুলে দেখল—প্রত্যাশায় চিক্‌চিক্‌ চোখে প্রতীক্ষা করছে ডাচেস্। লিপ্‌স্টিক-রঞ্জিত ঠোঁটে লালস-লাল হাসি, আর তার হাতে কামনা-কালিমালিপ্ত পাখ-পালকের কলম।

বললে, নাও, লক্ষ্মী ছেলের মতো সহিঁটা করে দাও। আর দু-পকেটে দুহাত রেখে বছরে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ রোজগার করতে থাক।

—কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তুমি স্ট্যাম্প কাগজ কিনে—

—কারণ আমি জানতাম, তুমি রাজি হবেই।

—বাজার যাচাই না করেই?

—বাজার যাচাই? —ডাচেস্ মর্মাহত। অভিমানই বুঝি—ওর চোখ ছলছল করে ওঠে।

—নিশ্চয়। তুমি থার্টী-থ্রি-ওয়ান-থার্ড দিচ্ছ, অন্য কেউ পঁয়ত্রিশ বা চল্লিশ দিতে পারে।

মোহিনী হেসে শোয়াজোল বলে, পারে। এমন কি শতকরা পঞ্চাশও দিতে পারে। সেই অনুপাতে তাকে হিসাবে কারচুপি করতে হবে। আমি তোমাকে না জানিয়ে দলিলটা তৈরী করে রেখেছি ঐ ভরসাতেই—কারণ তুমি জানো যে, তোমার মন-চোরী অন্তত তোমাকে ফাঁকি দেবে না।

অগুস্ত্ অনেকক্ষণ চুপ করে কী ভাবল। তারপর বললে, দলিলটা আমার কাছে থাক। আমি একবার মুদ্রা ঘুরে আসি। সেখানে যা ভাস্কর্য আছে সব নিয়ে আসি। সেগুলো তো ফরাসী সরকারের হিসাবে নেই। সেগুলোও একটা থওকা-দামে তোমরা—

—তোমারা নয় অগুস্ত্, তুমি। আমাতে-তোমাতে চুক্তি হচ্ছে!

—না। আমি চুক্তি করছি 'ডাচেস্-এ্যাণ্ড-এ্যাসোসিয়েটস্'-এর সঙ্গে। তা সে যাই হোক। তুমি দিন-সাতেক বাদে আমার খোঁজ কর।

—সত্যি কথা বল তো অগুস্ত্! তুমি কি বাজার-যাচাই-এর জন্য সার্বাধীন সময় চাইছ?

—তা চাইলেও তোমার আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি বাজার-যাচাই করব না আদৌ! দিন-সাতেক সময় তবু আমার লাগবে মনস্তির করতে! আমি

এখনই বের হব। ওঠ তুমি।

—বের হবে! তুমি যে অসুস্থ!

—ছিলাম! আমাকে তুমি ভালো করে দিয়েছ মন-চোরী! তুমি নিজেই তা জান না!

জুতো-জামা পরতে থাকে অগুস্ত্।

বেল-বয়কে ডেকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করল। ডাচেস্কে বিদায় করে সে সোজা গিয়ে হাজির হল ক্রিমসোর বাড়িতে। পারীর উচ্চতম মহলে তখন তিনজন প্রভাবশালী রাজনীতিক। ক্রিমসো, পয়ঁক্যারে এবং রায়াস্ত্। তিনজনের মধ্যে কে যে আগামী প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন, তা জানেন একমাত্র জগদীশ্বর। ক্রিমসো ওকে আপ্যায়ন করে বসালো। বললো, অগুস্ত্, তোমার প্রস্তাব নিচের হাউস পাশ করেছে; কিন্তু এয়ার্টার্ন-জেনারেল একটা নতুন ফ্যাক্টরি তুলেছেন।

—শুনেছি! তার জবাবে একটি বিকম্প প্রস্তাব আমি এনেছি। সেটাই তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। আমি ঐ সঙ্গে আমার যাবতীয় ভাস্কর্যের 'ডুপ্লিকেশন রাইট' ফরাসী সরকারকে নিবুড় সত্ত্বে দান করতে সম্মত। তার মূল্যমান অন্তত বার্ষিক দেড় লক্ষ ফ্রাঁ। এই হিসাবটা দেখ।

কাগজপত্র সব দেখে ক্রিমসো বলে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে অগুস্ত্? সর্বস্ব ফরাসী সরকারকে দিয়ে দিলে শেষ বয়সে তুমি খাবে কী?

—আমি আর ক' বছরই বা বাঁচব? প্রয়োজন হলে মুদ্রার বাড়িটা বেচে দেব।

—কিন্তু সর্বকিছু খুইয়ে রোদ্যাঁ-মুজিয়াম্ বানানোর সার্থকতা কোথায়?

—শিম্পের মাধ্যমে আমি কিছু একটা কথা সারাজীবন ধরে বলতে চেয়েছি। সেই কথা-কটা হারিয়ে যাবে না হলে। সেই কথাগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়ে থাকেনো ভাবীকাল তা একদ্রে দেখতে পারে। ভাবীকাল ওখানে এসে ভাববে, কোথায় আমি ব্যর্থ হয়েছি, কেন ব্যর্থ হয়েছি, কোথায় আমার সীমারেখা—সেখান থেকেই তো ওরা আবার নতুন করে যাত্রা করবে।

ক্রিমসো অনেকক্ষণ জবাব দিল না। চিন্তা করল। তারপর বলল, আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব আমি চেষ্টা করব। তুমি বরং একবার পঁয়ক্যারের সঙ্গে কথা বল। সম্ভবত সেই হতে

চলেছে আগামী প্রধানমন্ত্রী।

—বলব! দেখ্ ক্লিমসো, আমি সারাজীবনে কারও কাছে মাথা নোয়াইনি, কখনও হার মানিনি। যুগের মূর্তি গৃহীত হয়েছে, বালজাক স্বীকৃত হয়েছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে রোদ'্যা-মিউজিয়াম আমাকে তৈরী করে যেতে হবে। এই আমার শেষ লড়াই। এ লড়াই আমাকে জিততে হবেই!

—আমি যথাসাধ্য করব।



সেদিনই অগদুস্ত ফিরে চল্ল ম্যুদ'তে। ও দেখতে চায় মেরী-রোজই বা এমন ভাবে বদলে গেল কেন? অগদুস্ত মরতে বসেছে শুনোও।

ম্যুদ' গায়ে যখন গাড়িটা পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা হবো-হবো। সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু গোপালীর আলো মিলিয়ে যায়নি। গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে

অগদুস্ত এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। বাগানে আগাছা জন্মেছে অনেক। বাঁ-দিকে খাড়া আছে 'নরকের দ্বার'। এখনও তা ডেলিভারী দেওয়া হয়নি। প্রকাণ্ড দ্বারের উপর তিন-তিনটে ছায়ামূর্তি—তার ঠিক নিচেই 'চিস্তামগ্ন' বসে ভাবছে। অগদুস্ত মূর্তিটাকে দেখে আপন মনেই বলে ওঠে, হ্যালো! আর কত ভাববে? ভেবে কিছু কুলকিনারা করতে পারলে?

হঠাৎ 'কেনেল' থেকে তীব্র সারমেয় শীৎকার শোনা গেল। ওর কুকুরটা দেখতে পেয়েছে। 'জ্যাক' মরেনি তাহলে? না মরেনি; ছুটতে ছুটতে জ্যাক এসে হাজির। ওর জুতোয়, প্যাণ্টে আঁচড়াতে থাকে। জ্যাকের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। বলে, হল তো—আর কত আদর চাই?

ওর ডান দিকে অর্ফিউস্ কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না ওকে! যেমন আকাশ পানে হাত তুলে গান গাইবার বার্থ চেষ্টা করছিল তাই করতে থাকে। এ-পাশে ঈভ কিন্তু গৃহস্বামীকে দেখে হঠাৎ লজ্জা পেয়েছে—দুহাতে দেহ ঢেকে, বাঁ-হাতটা তুলে বলছে, না, না! ছি! ও কথা বল না!

জ্যাকের ডাক শুনেই বোধহয়—গৃহস্বামিনী বোরিয়ে এসেছে দ্বার খুলে। কৃশকায়ী বৃদ্ধা; চুলগড়লো পাতলা হয়ে গেছে, তবু সোনালী, চোখ দুটো কোটরগত, তবু সুন্দর। গায়ে আধময়লা একটা হাউস-কোট, হাতে ঝাড়ন। বোধকারি নিত্যকর্মপদ্ধতিতে ব্যস্ত ছিল; জ্যাকের চিল্লানিতে দোর খুলে দেখতে এসেছে—

কে এল জ্বালাতে?

অগদুস্ত এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ওর মুখোমুখি।

বৃদ্ধার কোটরগত দুচোখ বেয়ে নামল অশ্রুর বন্যা। অগদুস্তের হাতদুটি তুলে নিয়ে বললে, এ কী চেহারা হয়েছে গো তোমার?

ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিল অগদুস্ত। বলা হল না। তার আগেই প্রশ্নটা করে বসেছে মেরী-রোজ। তাই বলল, তুমি জান না? আমি অসুখে যে মরতে বসেছিলাম?

একেবারে সাদা হয়ে গেল মেরী-রোজ। বললে, সে কি! তবু আমাকে একটা খবর দাওনি?

—তুমি জানতে না বলতে চাও? প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হল, আর তুমি খবর পেলে না?

মেরী বসে পড়ল। এ আঘাতটা সহ্যে পারল না। তারপর সামলে নিয়ে বলল, একান্ন বছর ঘর করেও তুমি জান না আমি আনপড়? খবরের কাগজ পড়তে পারি না?

—কিন্তু প্রতিবেশীরাও কেউ কিছু বলেনি?

—কেন বলবে? আমি কি তোমার বউ? মাদাম দ্রোলেকে তুমি কী বলেছিলে মনে নেই? আমি তো তাই! আখের ছিঁবড়ে।

অগদুস্ত ওকে বুকে টেনে নিল এতক্ষণে! বললে, আমারই ভুল। যতই রাগ করে থাক, আমি মরতে বসেছি খবর পেলে—

—রাগ! রাগ কেন করব? তুমি তো আমাকে তাড়িয়ে দাওনি!

—চল, ঘরে গিয়ে বসি। খাবার কিছু আছে, না কিনে আনব? বড় খিদে পেয়েছে।

সত্যি ওর খিদে পায়নি, কিন্তু একান্ন বছর ঘর করে অগদুস্ত এ মন্তব্য শিখে ফেলেছে। মেরী-রোজ বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়লে, বেশি কান্নাকাটি শুরু করলে এ মন্তব্য আওড়ে দেখেছে দারুণ কাজ হয়। সব কিছু ভুলে মেয়েটা রান্নাঘরে ছোটে।

রাউন বুটি ঘরেই ছিল। ডিম ফোটিয়ে ফ্রেণ্ড-টোস্ট বানালো, আর কফি। অগদুস্তকে সাজিয়ে দিয়ে বলে, এবার বল। পারীর গম্প।

—তার আগে তুমি বলতো, এখানে আমার কতগুলি ভাস্কর্য আছে?

—কেন? বাগানে 'নরক-দ্বার' সমেত এগারোটা, স্টুডিওতে

চারটে মার্বেল, পাঁচটা ব্রোঞ্জ, একশটা টেরাকোটা, একাত্তরটা স্কেচ। সোজা হিসেব।

—কিছু কি খোয়া গেছে ইতিমধ্যে?

—খোয়া যাবে কেন? ভিতরে আমি আছি, বাইরে জ্যাক আছে, খোয়া অর্নি গেলেই হল?

হঠাৎ মনস্থির করে অগ্নিস্তম্ভ। বলে, শোন মেরী, যে জন্য এসেছি। লগুনে আমার ‘বার্গাস’ অব ক্যালের’ একটি অনুকৃতি বসানো হবে। ওরা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে জায়গাটা সরেজমিনে চিহ্নিত করে দিয়ে আসতে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

মেরী-রোজ নতনেদ্রে অনেকক্ষণ কী-যেন ভাবতে থাকে। অগ্নিস্তম্ভ কোনদিন তাকে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে যায়নি। ব্রাসেল্‌স্-এ থাকতে আমস্টার্ডাম, ইতালী বেড়াবার বায়না এককালে করেছিল—কিন্তু তখন তার ছিল অসপত্ত অধিকার। তখন অর্থাভাবে যৌথভ্রমণটা সম্ভবপর হয়নি। তারপর থেকে কামিলীই হয়েছে ওর ভ্রমণ-সাথী—দক্ষিণ ফ্রান্সে, ব্রজ মনের বাড়িতে, বালজাকের জন্মস্থানে।

—কী? যাবে?

মেরী-রোজ লজ্জা জয় করে মুখ তুলে বলে, ডাচেস্ বৃষ্টি যেতে পারবেন না?

—ডাচেস্! কোন ডাচেস্?

—ডাচেস্ অব শোয়াজোল!

অগ্নিস্তম্ভ অবাক হয়ে যায়। বলে, তার নামটা পর্যন্ত জান, অথচ আমার অসুখের খবরটা জান না?

এবার অভিমান করল মেরী-রোজ। বললে, আমি তো কতবার বলেছিলাম, আমাকে লেখা-পড়া শেখাও। শিখিয়েছ? প্রতিবেশীরা দয়া করে যেটুকু বলবে, সেটুকুই তো জানব? ওদের যদি কোতুল হয় জানতে যে, ডাচেস্-এর কথা শুনলে এ শুকনো আখের-ছিঁবড়েটা ভিজে ভিজে লাগবে কি না—তাহলে সে দোষ কি আমার?

তা বটে! সাত দিনে একদিন, রবিবার সকালে বুড়ি ঠুকঠুক করে চার্চে যায় আজও। যীসাস্ আর মেরীমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনান্তে প্রতিবেশিনীরা যদি পরখ করে দেখতে চায় অগ্নিস্তম্ভের এই প্রাক্তন-রক্ষিতা কাঁদতে ভুলেছে কি না, তাহলে সে জন্য মেরী-রোজকে দায়ী করা চলে না।

অগ্নিস্তম্ভ বলে, পোতি অগ্নিস্তম্ভের খবর জান?

ঐ এক দোষ। অগ্নিস্তম্ভকে মিছে কথা বলতে পারে না মেরী। স্বীকার করতে হল—সে আজও মাঝে মাঝে আসে; যা পারে হাতিয়ে উধাও হয়।

আশ্চর্য! সে হতভাগাও তার গর্ভধারিণীকে বলেনি—বাপ মৃত্যুশয্যায়!

না! এখানেও ভুল হচ্ছে অগ্নিস্তম্ভের। বাপ তো নয়। মেংর! বললে, তুমি গদ্বিচ্ছে নাও। আমরা দুজনে লগুন যাচ্ছি!



রেজিস্ট্রি চিঠি দিল ফরাসী সরকারকে। জানালো, সে অসুস্থ। হোটেল বীর সম্মুখে এয়ার্টার্ন জেনারেল যে প্রস্তাব করেছেন তা কার্যকরী করতে অনেক সময় নেবে। হয়তো অর্থাৎ অগ্নিস্তম্ভ বাঁচবে না। সে তার যাবতীয় ভাস্কর্যের ডুপ্লিকেশন-রাইটও সরকারকে দান করতে ইচ্ছুক, যার মূল্যমান বার্ষিক অন্তত দেড়-লক্ষ ফ্রাঁ। এরপরও কি সরকার বৃদ্ধ শিল্পীকে শাস্তিতে মরবার সুযোগ দিতে পারেন না?

সে চিঠির অনুলিপি অগ্নিস্তম্ভ পাঠিয়ে দিল সংবাদপত্রে—‘ফিগারো’ এবং ‘মাতিন’-এ। এবং একটি কপি ‘ডাচেস্ অব শোয়াজোল এ্যাণ্ড এ্যাসোসিয়েটস্’ কে। হিসাবটি করে দেবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে।

পারী থেকে লগুনের পথে মেরী-রোজ ‘বিনু’ হয়ে গেছে। পৌঁছানো আর চলা তার কাছে সমার্থক।

“দেখো দেখো, একাগাড়াই কেমন চলে।

আর দেখেছ? বাছুরটি ওই, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ, মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ!”

মেরী-রোজ একাগাড়াই, অথবা সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি দেখেনি। কী দেখেছে, তা আমিও জানি না; কিন্তু একই আকৃতিভরে সে বার বার অগ্নিস্তম্ভের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অর্কিগুৎকর দৃশ্যের দিকে। পঞ্চাশ বছর পর মেরী-রোজও যে আজ প্রথম ভাবতে পারছে নিখিলে সোঁদন একলা অগ্নিস্তম্ভ শুধু তারই!

অম্প কিছু দিনের মধ্যেই অগ্নিস্তম্ভ ফিরে এল ফ্রান্সে। লগুনে হাউস অব পালার্মেন্ট-এর সামনে ‘ক্যালো নাগরিক’-দের জন্য স্থান-নির্দেশ সমাধা করে। এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসার দুটি

হেতু। এক নম্বর—রোদ্যা-মিউজিয়ামের ব্যাপারটা শেষ করতে ; দু-নম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ায়।

সময়টা 1914-র প্রথম দিক।

মেরী-রোজকে হোটেল বরিতে রেখে প্রথমেই গেল ক্রিমসোর কাছে। ক্রিমসো বললে, এয়ার্টার্ন-জেনারেলের ফ্যাক্‌ড়া এড়ানো গেছে। তোমার প্রস্তাবটা প্রধানমন্ত্রী প'য়ক্যারে গ্রহণ করেছেন।

চূড়ান্ত সই হতে গেছে স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কাছে।

—আমি কি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করব ?

—না। তার আগে তুমি বরং প্রধানমন্ত্রী প'য়ক্যারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। তুমি বারে বারে আমার কাছে আসছ ; কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একবারও দেখা করনি। অথচ আমি আজ মন্ত্রীসভার কেউ নই। এটা ভালো দেখায় না।

অগুস্ত্‌ সেদিনই সন্ধ্যায় দেখা করল প্রধানমন্ত্রী প'য়ক্যারের সঙ্গে।

প'য়ক্যারে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে বললে, আমি মর্মাহত মসুয়ে রোদ্যা। আপনার প্রস্তাবটা প্রেসিডেন্ট্‌ প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

দাঁতে-দাঁত চেপে অগুস্ত্‌ বললে, হেতুটা ?

—মন্ত্রিসভায় রোমান-ক্যাথলিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা দাবী তুলেছেন—আপনার তৃতীয় সর্বটো প্রত্যাহার করতে হবে।

অগুস্ত্‌-এর সতাই মনে পড়ল না। বললে, পারদ, আমার মনে নেই। তৃতীয় সর্বটো কী ছিল ?

—আপনার জীবনসঙ্গিনী মেরী-রোজ ব্যুরেকে যাবজ্জীবন পাঁচশ ফ্রাঁ করে খোরপোশ দিতে হবে।

অগুস্ত্‌ গর্জে উঠল, মসুয়ে প'য়ক্যারে ! আমরা কি মেছো-হাটায় এসে চিঙাড়া-মাছের দরাদরি করছি ? এক কথায় আমি সরকারকে 'ডুপ্লিকেশন-রাইট' লিখে দিলাম—যার বার্ষিক মূল্যমান অন্তত দেড় লক্ষ ফ্রাঁ, আর মাত্র মাসিক পাঁচশ ফ্রাঁর জন্য —

—আপনি ভুল বুঝছেন, মসুয়ে রোদ্যা। প্রশ্নটা নৈতিক। ধর্মীয়। মাদাম ব্যুরে আপনার স্ত্রী নন !

—আপনারা কী চাইছেন বলুন তো ? এই বুড়ো বয়সে আমি চার্চে গিয়ে ঐ হতভাগিনীকে বিয়ে করে লোক হাসাই ? তাহলে আপনারা তৃপ্ত হবেন ?

—প্লীজ ! মসুয়ে রোদ্যা ! এমন অবাস্তব প্রস্তাব আমার কেউই করছি না !

—তবে কী আপনাদের প্রস্তাব ? তৃতীয় সর্বটো আমি প্রত্যাহার করতে পারি না। বাবার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

—আপনি এক কাজ করুন। রোম-এ চলে যান। পোপ-এর একটি হেড-স্টাডি করে আনুন। পোপ যদি আপনাকে একটি আশীর্বাদবাণী লিখে দেন, তাহলে কোনও গৌড়া ক্যাথলিক আর আপত্তি জানাতে সাহস পাবে না।

—হাঃ। দারুণ বলেছেন এটা। অগুস্ত্‌ রেনে রোদ্যার এখনও সুপারিশপত্র চাই ! বাই দ্য ওয়ে, পোপ এখন কে ?

—পঞ্চদশতম বেনয়। সজ্জন ব্যক্তি।

—মসুয়ে প'য়ক্যারে ! আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে ভ্যাটিক্যানের খাতা ছাড়া ঐ নামটা কোথাও থাকবে না ! অথচ...

—জানি, জানি মসুয়ে রোদ্যা। কিন্তু একথা অন্য কারও সামনে বলবেন না যেন।

—ঠিক আছে ! এই আমার শেষ লড়াই। এ লড়াই আমাকে জিততেই হবে। রোমেই যাব। ব্যবস্থা করুন আপনি।

মেরী-রোজকে ম্যুর্দতে পৌঁছে দিয়ে পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ শিপ্পী ছুটল রোমে—ভ্যাটিকানে। সেটা 1915 সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তখন এক বছর বয়স। ইতালী-জার্মানি-তুরস্ক এক পক্ষে ; আর তার বিপক্ষে ব্রিটেন-ফ্রান্স। তবু গেল, বিপদের বোঝা মাথায় নিয়ে। ভ্যাটিকান-রাজ্য ইতালীর ভৌগোলিক চৌহদ্দির মধ্যে হওয়া সত্ত্বেও রণাঙ্গণের বাইরে—এটুকুই ভরসা।

কিন্তু পারল না !

দুনিয়া জয় করেছে যে অগুস্ত্‌ রোদ্যা, সে শেষ পর্যন্ত ঠেকে গেল ঐ খর্বকায় আত্মস্তর মানুষটার কাছে। পোপ সিটিং দিতে গররাজি। এতদিন স্টুডিওর ভিতর অগুস্তের নির্দেশই ছিল চূড়ান্ত, যা মাথাপেতে মেনেছে ইংলণ্ডের পর্যন্ত ! এ-ক্ষেত্রে পোপের নির্দেশ অলঙ্ঘনীয়। পোপকে স্পর্শ করা যাবে না, উপর থেকে তাঁর চাঁদটা দেখা যাবে না ; দৈনিক দশ মিনিটের বেশি তিনি সিটিং দেবেন না। অগুস্ত্‌ সর্বিনয়ে বলে, য়োর গ্রেস ! এমন করলে কী ভাবে আপনার মর্তি গড়ব ?

—সে কথা তো বার বার বলছি তোমাকে। তোমার মোটা-মাথায় ঢুকছে না। আমার অসংখ্য ফটোগ্রাফ আছে। তাই

দেখে বানাও ! অসুবিধাটা কোথায় ?

অসুবিধাটা যে কোথায়, তা অগুস্ত্ ওঁকে কেমন করে বোঝাবে ? অনেক-অনেক ভাস্কর এভাবে কাজ করে। মৃত ব্যক্তির পক্ষে তা-ছাড়া গতান্তর নেই। বালজাক, লোরেন, ক্যালের নাগরিকবৃন্দদের সে না দেখেই গড়েছে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সেটা মেনে নেওয়া মানে স্বীকার করে নেওয়া—শিম্প-আদর্শের চেয়ে মহামান্য পোপ বড় ! ফিডিয়াস-প্র্যাক্সেটেলীজ-এর উত্তরসূরী তা মেনে নিতে পারে না। মিকেলাঞ্জেলোও পোপের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। অগুস্ত্ তর্ক করল না। মাথা নিচু করে ফিরে এল পারীতে।

শিম্পের বৈশ্যবৃত্তি সে করতে পারবে না। কিশোর বয়স থেকে সে শিখেছে—উপাস করবে, তবু আপস করবে না।

মেরী-রোজ জানতে চায়, তাহলে ?

—হাল ছাড়িনি তাবলে। ভেবে দেখি।

চূপচাপ বসে থাকে ঘরের ভিতর। ভাবে আর ভাবে। যেন, 'থিংকার' !

অনেক-অনেক দিন পরে হঠাৎ ব্যুশে ওর সঙ্গে দেখা করতে এল ম্যুদ'তে। অগুস্ত্ খুশি হল। বললে, কী ব্যাপার ?

—কী স্থির করলে ? রোদ'্যা-মিউজিয়ামের ব্যাপারে ?

কিছুই স্থির করে উঠতে পারিনি। তবে হার মানিনি এখনও।

কথা প্রসঙ্গে ব্যুশে বলল, তুমি কামীল-এর খবর শুনছে ?

—না। কী ? কোথায় আছে সে ?

—কামীল সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছে। আছে একটা উন্মাদাগ্রামে।

অসুস্থ বৃদ্ধের মনে হল ব্যুশে ওর পাজরে একটা শেল বিদ্ধ করে দিয়েছে। মনে পড়ল কামীলের বিদায়কালীন শেষ সম্ভাষণ যদি কোনদিন শোন আমি পাগল হয়ে গেছি, তবে জেন, সে জন্য তুমিই দায়ী।

ব্যুশে বলে, যুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তোমার রোদ'্যা-মিউজিয়াম প্রসঙ্গটা —

বাধা দিয়ে অগুস্ত্ বলে, কিছু মনে কর না ব্যুশে। আমি একটু একা থাকতে চাই।

ব্যুশে কিছু মনে করল না। বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

ফিরে গেল পারীতে। অগুস্ত্ সমস্তটা দিন নিশ্চুপ বসে রইল বাগানে। তার বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে কামীলের কথা। সন্ধ্যায় মেরী-রোজ ওকে ডেকে নিয়ে গেল। বললে, এতটা ভেঙে পড়ছ কেন ? তার নিয়তি ছিল...

অগুস্ত্ জবাব দিল না।

—চল, খেয়ে নেবে চল।

—ইচ্ছে করছে না। তুমি খেয়ে শুষে পড়। আমি স্টুডিওতে যাচ্ছি। রাত জেগে কিছু কাজ করব।

মেরী-রোজ জানে, এ-কথায় প্রতিবাদ করা বৃথা। সে শুধু অস্ফুটে বলে, বিশ্বাস কর অগুস্ত্—আমার অভিশাপে এমনটা হয়নি। কামীল আমার মেয়ের বয়সী !

—কী আবোল-তাবোল বকছ ! তোমার অভিশাপে কেন হবে ?

অগুস্ত্ সারারাত মোমবাতির আলোয় স্টুডিও ঘরে ঠুক ঠুক করল। সকাল-বেলা তাকে ডাকতে এসে মেরী-রোজ দেখে ছেনি-হাডুড়ি আর টুকরো মার্বেলের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে অগুস্ত্ কার্পেটের উপর অঘোর ঘুমাচ্ছে। ওয়ার্ক-টুলে বসানো আছে বহুদিন পূর্বে গড়া একটা মার্বেলমূর্তি : দানেদ !

আশ্চর্য ! অপরিচীত আশ্চর্য ! দানেদ-এর নিম্নীলিত আঁখি-পল্লব দুটি রাতারাতি খুলে গেছে।

সে চোখে পাগলের দৃষ্টি !



দিন-সাতেক পরে একদিন সকালে উঠেই

অগুস্ত্ বললে, হয়েছে !

—কী হয়েছে ?

—সমাধান ! তুমি তৈরী হয়ে নাও !

—আমি তৈরী হব ? কী ব্যাপার ?

আজ সন্ধ্যায় জনা বিশেক লোককে নিমন্ত্রণ

করব। খাবার আর মদ আনিয়ে রেখ।

এক বাগুন্ড নোটের গোছা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ঝড়ের বেগে বার হয়ে গেল অগুস্ত্। ফিরে এল সন্ধ্যায়। সঙ্গে বেশ কিছু স্থানীয় ভদ্রলোক। প্যারিস-প্রীস্ট, মেয়র, স্কুল-মাস্টার, ডাক্তারবাবু।

মেরী-রোজ হুকুমের চাকর। নির্দেশ মতো সারাটা দিন ঘর দোর সাজিয়েছে। স্থানীয় হোটেল থেকে খাবারও আনিয়েছে। আর পানীয়। অতিথিদের আপ্যায়ন করে বসালো।

মেয়ের মেরী-রোজকে আপদমস্তক দেখে নিয়ে বলেন, এ কী !
যেন মেরী-রোজ—ন্যূড !
অগ্নুস্ত্ বলে, তাড়াহুড়ায় ওকে বলা হয়নি। আপনিই খবরটা
ওকে জানান।

মেয়র বলেন, মাপ করবেন ! তা আমি পারব না।
বৃদ্ধ প্যারিস প্রীস্ট বললেন, তোমাদের কাউকেই কিছু করতে
হবে না। কর্তব্যটা আমার। আমিই বলব। তারপর মেরী-
রোজ-এর দিকে ফিরে বলেন, মাদাম, একটা বিশেষ বার্তা
আছে। মনকে শক্ত করুন ! আপনি শক্দ্ হবেনই।
অগ্নুস্তের দিকে একনজর দেখে নিয়ে মেরী-রোজ ভয়ে ভয়ে
বলে, খারাপ খবর ?
পাদরী ! স্মত হেসে বলেন, না, না মা, — খুবই আনন্দের খবর।
তবু মনকে প্রস্তুত করুন আপনি।

—আমি প্রস্তুত। বলুন ?
—অগ্নুস্ত্ রেনে রোদ্যাঁ চার্চে গিয়ে আজ জানিয়েছেন যে,
তিনি মেরী রোজ-বুয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। আপনাদের
দুজনের বয়স ও সম্মানের কথা বিবেচনা করে চার্চের পরিবর্তে
এখানেই সেই শুভকর্ম অনুষ্ঠানে...
মেরী-রোজ বাকিটা শুনতে পায়নি। অজ্ঞান হয়ে সে পড়ে
যায়।

মেয়র বলেন, এই ভয়টাই আমি করছিলাম।
ডক্টর দুবয় বলেন, ভয় নেই, আমি তৈরী হয়েই এসেছি।
অম্প কিছু শূশ্রুষার পরে মেরী-রোজ চোখ মেলে তাকালো।
প্রতিবেশিনীরা, সেই যাদের খরজিহ্বার আক্রমণে মেরী এতদিন
বিদ্ধ হত, তারা সব ভুলে আজ এসে জুটেছে। অগ্নুস্ত্ বুদ্ধি
করে একটা সাদা ওয়েডিং-গাউনও কিনে এনেছে স্থানীয়
দোকান থেকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সত্তর বছর বয়সের নববধূ সলজ্জ ভঙ্গিতে
এসে দাঁড়ালো স্টুডিও-তে। আইডিয়াটা ব্যুশের।
ঘণ্টানাচক্রে সেও এসে জুটেছে। বিয়েটা হবে স্টুডিওর ভিতর।
ছড়ানো মার্টির মাঝখানে। স্থানীয় প্রেস-ফটোগ্রাফার এসে
জুটেছে ক্যামেরা-বগলে। বিশ্ববিশ্রুত শিম্পীর বিবাহ-বাসরে
তবু জনা-বিশ-পাঁচশ মাত্র নিমন্ত্রিত।

বিবাহ-অনুষ্ঠান অতি সংক্ষিপ্ত। মেয়র আনুষ্ঠানিক ভাবে
অগ্নুস্ত্কে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি মাদমোয়াজেল মেরী-রোজ
বুয়েকে ধর্মমতে বিবাহ করার ইচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁকে

আপনি ভালবাসবেন ? স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন ? ভরণপোষণ
করবেন ? প্রতিজ্ঞা করছেন ?
অগ্নুস্ত্ হেসে বলল, তিপ্পান বছর ধরে তাই করে এসেছি,
যোর অনার ! বাকি জীবনও তাই করব !

মেরী-রোজ প্রশ্ন করার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না।
চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলল, ইয়েস, ইয়েস্ যোর
অনার ! বাকি যে-কটা দিন মাদাম রোদ্যাঁ হয়ে বাঁচব।
প্যারিস্-প্রীস্ট্ ওদের হাতে-হাত মিলিয়ে দিয়ে বললেন, আজ
থেকে তোমরা ধর্মমতে স্বামী-স্ত্রী হলে। যতদিন না মৃত্যু
এসে বিচ্ছেদ ঘটায় !

মেয়র সহাস্যে বললেন, শুভকাজ সুসম্পন্ন ! এবার ইতরজনকে
কিছু মিষ্টান্ন পরিবেশনের আজ্ঞা হোক, মাদাম রোদ্যাঁ !
মাদাম রোদ্যাঁ ! মাদাম রোদ্যাঁ !! মাদাম রোদ্যাঁ !!!

কী মিষ্টি !
আহারাদি মিটেতে রাত হল। মেয়র, প্রীস্ট ইত্যাদি সম্মানীয়
অতিথিরা একে একে বিদায় হলেন। কিন্তু অম্পবয়সীদের
কোতুহল তখনও মেটেনি। তারা তখনও দেখতে চায়—
এরপর বুড়ো-বুড়ি কী করে !

একটি মুখফোড় যুবতী বলে, চলুন মেয়র ! আপনাদের
হনিমুন-চেয়ারে পৌঁছে দিই।

মেরী-রোজ-এর হার্টাট ধরে আকর্ষণ করে। বলে, আসুন
আমার সঙ্গে, মাদাম রোদ্যাঁ।

বৃদ্ধ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। বলে, এ কী অশাস্ত্রীয় কথা
বলছ হে ! হাউস-ওয়ার্মিং করতে হলে বউকে কীভাবে
চেয়ারে নিয়ে যেতে হয় তাও জান না ? - বলেই পাখির
পালকের মতো হালকা বৃদ্ধাকে তুলে নিল দু-হাতে।
অনায়াসে সর্বসমক্ষে পাজাকোলা করে সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে এল
দ্বিতলে। উল্লাসে ফেটে পড়ে সমবেত ছেলে-মেয়ের দল।
সিঁড়ির মাথায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধ হাঁকাড়
পাড়ে : সন্ধ্যা থেকে অনেক মদ গিলেছ ! আর নয় ;
বাপের সুপুত্তর হলে এবার মানে মানে যে-যার বাড়ি যাও।
আমাদের ফুলশয্যায় বাধা দিও না।

: ভিভা মসুয়ে রোদ্যাঁ ! ভিভা মাদাম রোদ্যাঁ !!

ধ্বনি দিতে দিতে বিদায় হল যুবক-যুবতীর দল।

অগ্নুস্ত্ সাদা গাউনপরা শীর্ণা নববধূকে আলতো করে শুইয়ে
দিল ডিভানে। তার মুখের কাছে মুখ এনে বললে, এবার

বল, আর কী কর্তব্য বাকি আছে ? চার্চের অনুমতি নিয়ে
বিয়ে করছি, রেজিস্টারে নাম সহ করছি, ছেলে-ছোকরাদের
মদ গিলিয়েছি, প্রেসিডেন্টকে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছি ; মায়
তোমাকে পাঁজা-কোলা করে দোতলায় বয়ে এনেছি ! বল,
নব-বিবাহিত স্বামী হিসাবে কোন্ কাজটা বাকি ?

বুড়ির দু-গাল বিনা-বুজেই লাল। বলে, আমার যা কিছু
ছিল তা তো সারা জীবনভোরই তোমাকে দিয়ে এসেছি
মন-চেরী ! কিন্তু একটা কাজ এখনও বাকি আছে !

হাত-বটুয়া হাংড়ে বৃদ্ধা বার করে আনল একটা আংটি। তাতে
একটা খুটো-মুস্তো আটকানো।

বলে, এটা চিন্তে পার ?

অগুস্ত্ সেটা হাত বাড়িয়ে নিল। নেড়ে-চেড়ে দেখল।
তারপর বললে, না। কোথায় পেয়েছ এটাকে ?

—তোমার মা যখন মারা যান তখন তুমি ব্রাসেলস্-এ। আমি
ছিলাম তাঁর শেষ শয্যার পাশে। এই আংটিটা তিনি আমার
হাতে দিয়ে বলেছিলেন, এটা তোমার কাছে রাখ। অগুস্ত্
যদি কোনদিন বিয়ে করে, তবে এটা তার বউকে দিও।
অগুস্তের বউকে ব'ল—মুস্তোটাই খুটো, ভালবাসাটা নয় !

অগুস্ত্ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আংটিটার দিকে। বহু বহু
দিনের যবনিকা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছিল তার দৃষ্টির
সামনে থেকে।

—আজ পঞ্চাশ বছর এটি আমার হাতবটুয়ায় বয়ে বেড়াচ্ছি।
বিদায় বেলায় ওটা এবার আঙুলে পরার সময় হল যে !

রোদ্যা নববধূর বিশীর্ণ অনামিকায় যখন আংটিটা পরিয়ে দিলেন
তখন বৃদ্ধার তালুতে ছিল আর একটি সঁজা-মুস্তো ! ছোট
সোনা-ভাইয়ের মারফতে পাঠানো কবি-দিদির আশীর্বাদ !

বারই নভেম্বর, উনিশ শ' সতের।

অর্থাৎ সাতাত্তরতম জন্মদিন, যার অর্থ মৃত্যুর মাত্র পাঁচদিন
আগের সন্ধ্যাটি।

প্রিয় শিষ্য বোর্দেলকে ডেকে বললেন, আমাকে শুইয়ে দিও
মেরীর পাশে।

মাত্র উনিশ দিন বিবাহিত জীবন যাপনান্তে মেরী-রোজ রোদ্যা
অমরধামে প্রয়াত হয়েছিলেন চোদ্দই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ'
সতেরয়। তিনি শূয়ে আছেন ঐ মুদ' প্রাসাদ-সংলগ্ন
সিমেন্টারিতে। বলা বাহুল্য, 'ওতেল বিন্ন'-র বর্তমান অভিধা :
'রোদ্যা'-মিউজিয়াম'। চির-অপরায়ে রোদ্যা শেষ যুদ্ধেও
বিজয়ী হয়েছেন !

বোর্দেল ইতস্তত করলেন না। স্পষ্টভাবে প্রশ্ন করলেন, কী
লেখা হবে মেংর ? এপিটাফে ?

—আমার নাম : অগুস্ত্ রেনে রোদ্যা। জন্মতারিখ : বারই
নভেম্বর আঠার শ' চল্লিশ। আর,—না, সে তারিখটা আজ
আমি জানি না, তুমি জানবে।

—বাস্ ? আর কিছু নয় ?

—আবার কী ? শিষ্যীর পরিচয় তো 'বিশেষণে' হয় না,
তার পরিচয় 'বিশেষ্যে'—তার 'কাজে'। আর ও, হ্যাঁ !
আমার সমাধির উপরে বসিয়ে দিও আমার ঐ মানসপুত্রকে :
দ্য থিংকার। আমি যে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পাইনি ও তাই
ওখানে বসে ভাববে। ভাববে, ভাববে আর ভাববে !

বোর্দেল চুপ করে বসে থাকেন।

মৃত্যুপথযাত্রী হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আচ্ছা সেই লোকটা কি আজও
সাইবেরিয়াতে মাটি কোপায় ?

—কোন্ লোকটা মেংর ?

—নাম আমার কোনদিনই মনে থাকে না। রিল্কে-কে
একবার ডেকে দাও তো ! সে জানে।

—রিল্কে ! রাইনের মারিয়া রিলকে ? তিনি তো
জার্মানিতে ! শত্রুপক্ষের দেশে।

—ও হ্যাঁ ! তাই তো ! জার্মানির সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হচ্ছে,
নয় ? রিলকে তো আমার শত্রু ! আজকাল আর কিছুই
মনে থাকে না !



পরিশিষ্ট—১

অগুস্ত রোদ্যার জীবন-পঞ্জী

[সমীকরণ-চিহ্নের পরে সমকালীন শিল্প-জগৎ ও ইতিহাসের ঘটনা ; (বন্ধনীতে ভারতীয়)]

- 1840 বারই নভেম্বর পারীতে জন্ম=রুদ মনে/আনাতোল ফ্রাঁস/এমিল জোলা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) জন্ম
- 1844 জুন, মেরী-রোজ ব্যুরের জন্ম=মোর্স-এর ইলেক্ট্রিক-টেলিগ্রাফ আবিষ্কার
- 1848 রোদ্যার কাকার স্কুলে ভর্তি=ফ্রান্স রিপাবলিক ; লুই নেপলিয়ন প্রেসিডেন্ট
- 1849 কাকার স্কুল ত্যাগ=বাস্তুশিল্পে রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের প্রথম ব্যবহার
- 1850 ছবি আঁকা শুরু করেন=মোপাসার জন্ম ; বালজাক/ওয়ার্ডওয়ার্থের প্রয়াণ
- 1854 পেতি একোলে ভর্তি=ক্রিমিয়া যুদ্ধের শুরু
- 1855 প্রথম ন্যুড-স্কেচ=প্যামারস্টোন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী
- 1857 পেতি একোল ত্যাগ এবং ব্যু-আৎ-স্-এ ভর্তি হবার ব্যর্থ চেষ্টা=পূর্ব বৎসর বার্গার্ড শ/(তিলকের) জন্ম, (প্রথম ভারতীয় সেনাবিদ্রোহ)
- 1858 পিতার ভাস্কর্য নির্মাণ=পূর্ব বৎসর 'অরিজিন অব স্পেসিজ'/'টেল অব টু সিটিজ' প্রকাশিত
- 1862 ভগ্নী মারী রোদ্যার মৃত্যু, চার্চে যোগ দেন=(পূর্ববৎসর রবীন্দ্রনাথ/পি, সি. রায়ের জন্ম)
- 1863 ফাদার এইমার্ডের পরামর্শে চার্চ ত্যাগ=রেড-ক্রস প্রতিষ্ঠান, (বিবেকানন্দ/দ্বিজেন্দ্রলালের) জন্ম
- 1864 'ম্যাজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি'-তে ভাস্কর বারীর কাছে শিক্ষানবিশী ; কারিয়া ব্ল্যুজ-এর কাছে চাকরি। রোজ ব্যুরের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম স্টুডিও। 'ম্যান উইথ দ্য ব্রোকন নোজ'=সালোঁ দে রেফুজি
- 1865 হোটেল পাইভাতে শিল্পী দালুর সঙ্গে অলঙ্করণরত=আমেরিকায় এ্যাব্রাহাম লিংকলন্ নিহত
- 1866 আঠারই জানুয়ারী : অগুস্ত ও ব্যুরের একমাত্র সন্তানের জন্ম=নোবল্-এর ডিনামাইট আবিষ্কার
- 1869 রোজ-ব্যুরে রোদ্যার-পরিবারে স্বীকৃত=সুয়েজ খাল খনন শুরু (গান্ধিজীর জন্ম)
- 1870 কর্পোরাল হিসাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান=প্রাশিয়ার কাছে ফ্রান্স পরাজিত
- 1871 সৈনিক জীবনের অবসান। বেলজিয়াম যাত্রা। মায়ের মৃত্যু=জার্মানীতে কাইজার অধিষ্ঠিত (অবনীন্দ্রনাথের জন্ম)
- 1872 রোজ ব্যুরে ব্রাসেল্‌স্-এ। ব্ল্যুজ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, রাশবুর্গের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ=জুল ভের্ন-এর 'আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ' (শ্রীঅরবিন্দের জন্ম)
- 1873 আমস্টারডাম ভ্রমণ=টেলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' ; (মধুসূদনের মৃত্যু)
- 1874 ব্রাসেল্‌স্ ও আন্তওয়ার্পে সৌধ-অলঙ্করণ=পারীতে প্রথম 'ইম্প্রেশানিস্ট' প্রদর্শনী
- 1875 ইতালী ভ্রমণ। তুরিন, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স্। 'ব্রোঞ্জযুগ' শুরু
- 1876 'ব্রোঞ্জযুগ' সমাপ্ত=টেলিফোন আবিষ্কার
- 1877 জানুয়ারী : ব্রাসেল্‌স্ সালোঁতে 'ব্রোঞ্জযুগ' 'পরাজিত' নামে প্রদর্শিত ও প্রত্যাখ্যাত
আগস্ট : রাশবুর্গের সঙ্গে চুক্তি শেষ=ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী
- 1879 মারীসহ পারী প্রত্যাবর্তন=আইনস্টাইনের জন্ম
- 1880 'জন' ও 'ব্রোঞ্জযুগ' পারীর সালোঁ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রদর্শিত। 'নরকের-দ্বার'-এর অর্ডার পান=জোলা 'নানা' প্রকাশিত, গায়েতা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী

পরিশিষ্ট—১

অগুস্ত্‌রোদ্যার জীবন-পঞ্জী

[সমীকরণ-চিহ্নের পরে সমকালীন শিল্প-জগৎ ও ইতিহাসের ঘটনা ; (বন্ধনীতে ভারতীয়)]

- 1840 বারই নভেম্বর পারীতে জন্ম=ক্লদ মনে/আনাতোল ফ্রাঁস/এমিল জোলা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) জন্ম
- 1844 জুন, মেরী-রোজ ব্যুরের জন্ম=মোর্স-এর ইলেক্ট্রিক-টেলিগ্রাফ আবিষ্কার
- 1848 রোদ্যাঁ কাকার স্কুলে ভর্তি=ফ্রান্স রিপাব্লিক ; লুই নেপলিয়ন প্রেসিডেন্ট
- 1849 কাকার স্কুল ত্যাগ=বাস্তুশিল্পে রি-ইন্‌ফোর্সড কংক্রিটের প্রথম ব্যবহার
- 1850 ছবি আঁকা শুরু করেন=মোপাসাঁর জন্ম ; বালজাক/ওয়াউওয়ার্থের প্রয়াণ
- 1854 পোঁত একোলে ভর্তি=ক্রিমিয়া যুদ্ধের শুরু
- 1855 প্রথম ন্যুড-স্কেচ=পামারস্টোন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী
- 1857 পোঁত একোল ত্যাগ এবং ব্যু-আৎ-স্-এ ভর্তি হবার ব্যর্থ চেষ্টা=পূর্ব বংসর বার্গার্ড শ/(তিলকের) জন্ম, (প্রথম ভারতীয় সেনাবিদ্রোহ)
- 1850 পিতার ভাস্কর্য নির্মাণ=পূর্ব বংসর 'অরিজিন অব স্পেসিজ'/'টেল অব টু সিটিজ' প্রকাশিত
- 1862 ভগ্নী মারী রোদ্যাঁর মৃত্যু, চার্চে যোগ দেন=(পূর্ববংসর রবীন্দ্রনাথ/পি, সি. রায়ের জন্ম)
- 1863 ফাদার এইমার্দের পরামর্শে চার্চ ত্যাগ=রেড-ক্রস প্রতিষ্ঠান, (বিবেকানন্দ/দ্বিজেন্দ্রলালের) জন্ম
- 1864 'ম্যুজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রী'-তে ভাস্কর বারীর কাছে শিক্ষানবিশী ; কারিয়া বলুজ-এর কাছে চাকরি। রোজ ব্যুরের সঙ্গে পরিচয়। প্রথম স্টুডিও। 'ম্যান উইথ দ্য ব্রোকন নোজ'=সালোঁ দে রেফুজি
- 1865 হোটেল পাইভাতে শিল্পী দালুর সঙ্গে অন্তর্ভুক্তকরণ=আমেরিকায় এ্যাব্রাহাম লিংকল্‌ন নিহত
- 1866 আঠারই জানুয়ারী : অগুস্ত্‌ ও ব্যুরের একমাত্র সন্তানের জন্ম=নোবল্-এর ডিনামাইট আবিষ্কার
- 1869 রোজ-ব্যুরে রোদ্যাঁ-পরিবারে স্বীকৃত=সুয়েজ খাল খনন শুরু (গান্ধিজীর জন্ম)
- 1870 কর্পোরাল হিসাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান=প্রাশিয়ার কাছে ফ্রান্স পরাজিত
- 1871 সৈনিক জীবনের অবসান। বেলজিয়াম যাত্রা। মায়ের মৃত্যু=জার্মানীতে কাইজার অধিষ্ঠিত (অবনীন্দ্রনাথের জন্ম)
- 1872 রোজ ব্যুরে ব্রাসেল্‌স্-এ। বলুজ-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ, রাশবুর্গের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ=জুল ভের্ন-এর 'আশী দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ' (শ্রীঅরবিন্দের জন্ম)
- 1873 আমস্টারডাম ভ্রমণ=টেলস্টয়ের 'আনা কারেনিনা' ; (মধুসূদনের মৃত্যু)
- 1874 ব্রাসেল্‌স্ ও আন্তওয়ার্পে সৌধ-অন্তর্ভুক্তকরণ=পারীতে প্রথম 'ইম্প্রেশানিস্ট' প্রদর্শনী
- 1875 ইতালী ভ্রমণ। তুরিন, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্‌স্। 'ব্রোঞ্জযুগ' শুরু
- 1876 'ব্রোঞ্জযুগ' সমাপ্ত=টেলিফোন আবিষ্কার
- 1877 জানুয়ারী : ব্রাসেল্‌স্ সালোঁতে 'ব্রোঞ্জযুগ' 'পরাজিত' নামে প্রদর্শিত ও প্রত্যাখ্যাত
আগস্ট : রাশবুর্গের সঙ্গে চুক্তি শেষ=ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী
- 1879 মারীসহ পারী প্রত্যাবর্তন=আইনস্টাইনের জন্ম
- 1880 'জন' ও 'ব্রোঞ্জযুগ' পারীর সালোঁ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রদর্শিত। 'নরকের-দ্বার'-এর অর্ডার পান=জোলা'র 'নানা' প্রকাশিত, গায়েতা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী

- 1881 লেব্র-র নিমন্ত্রণে ইংল্যাণ্ড গমন। হেন্লে ও স্টেভেন্সনের সঙ্গে পরিচয়
- 1882 ব'লুজ, দালু, বেক, লরেন্স, প্রভৃতির মূর্তি নির্মাণ=অস্কার ওয়াইল্ড-এর Lectures on the Decorative Arts প্রকাশিত
- 1883 পিতার মৃত্যু। কামিল ছাত্রী হতে আসে=স্টেভেন্সনের 'ট্রেজার আইল্যান্ড'
- 1884 'বার্গার্স অব ক্যাল' মূর্তি নির্মাণের চুক্তি=(পূর্ববৎসর নন্দলালের জন্ম)
- 1885 ঐ মূর্তি নির্মাণরত=সুয়োগোর প্রয়াণ
- 1887 'ক্যার্ডেলিয়ার অব দ্য লীজেন অব অনার' উপাধি লাভ=গ্রেহাম বেল কর্তৃক গ্রামাফোন আবিষ্কার (যামিনী রায়/ সুকুমার রায়-এর জন্ম)
- 1888 ফরাসী সরকার কর্তৃক 20,000 ফ্রাঁতে 'চুয়ন' ভাস্কর্য ক্রয়=ম্যাথু আর্নল্ডের মৃত্যু।
- 1889 'রোদ'্যা-মনে' যৌথ-প্রদর্শনী। 'সুয়োগো' মূর্তি-নির্মাণের কমিশনলাভ=চ্যাপ্লিনের জন্ম। পারীতে ইফেল-টাওয়ার
- 1890 কামিলসহ বিদেশ-ভ্রমণ
- 1891 'বালজাক' মূর্তি নির্মাণের চুক্তি=গোগ্যা তাহিতিতে চলে যান (বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ)
- 1892 জুন : নাশিতে 'ক্লড লোরেন' মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।
জুলাই : 'অফিসার অব দ্য লীজেন অব অনার' উপাধিতে ভূষিত=লর্ড টেনিসনের প্রয়াণ
- 1893 দালুর প্রয়াণে বু-আর্ৎস্-এর ভাস্কর্যশাখার সভাপতি=ডিজেল-এঞ্জিন আবিষ্কার। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা
- 1894 কামিলসহ দক্ষিণ-ফ্রান্স ভ্রমণ। 'মনে'-র বাড়িতে অতিথি। সেজান-এর সঙ্গে পরিচয়=বার্নার্ড শ : আর্মস্ এ্যাণ্ড দ্য ম্যান'। চীন-জাপান যুদ্ধ। (বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়াত)
- 1895 জুন : ক্যালিতে 'বার্গার্স্ ষড়-শহীদ' প্রতিষ্ঠিত=ওয়েল্‌স্-এর 'দ্য টাইম মেশিন' ; ইয়েটস্-এর কবিতাগুচ্ছ ; মার্কিনের বেতার আবিষ্কার। ফ্রয়েড-এর মনঃসমীক্ষণ
- 1897 মুদ'-তে সম্পত্তি ক্রয়। রোজ-বুরে সেখানে স্থানান্তরিত=পূর্ববৎসর থেকে নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। (সুভাষচন্দ্র, দিলীপ রায়-এর জন্ম)
- 1898 'বালজাক' ও 'দ্য কিস্' প্রদর্শিত। সোসাইটি কর্তৃক 'বালজাক' প্রত্যাখ্যাত। রোদ'্যা-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত কামিল-এর অভিমান=কুরি-দম্পতির রেডিয়াম আবিষ্কার। গ্যাডস্টেনের মৃত্যু। ফ্ল্যাস্-ফটোগ্রাফির প্রথম ব্যবহার (দেবীপ্রসাদ-এর জন্ম)
- 1899 বেলজিয়াম ও হল্যান্ডে প্রদর্শনী। কামিলের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ। পারী প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি=বুয়োর-যুদ্ধ শুরু।
- 1900 মে : পারী এক্সপোর একান্তে রোদ'্যা প্রদর্শনীর সাফল্য=ফ্রয়েড-এর স্বপ্নব্যাখ্যা (পারী এক্সপোতে বিবেকানন্দ ও জগদীশচন্দ্রের উপস্থিতি)
- 1901 মুদ'-তে রোজ-মেরীর সান্নিধ্যে একান্তে শিল্পচর্চা=পিকাসোর প্রথম পারী প্রদর্শনী ; তুলস্-লুট্রেক্-এর মৃত্যু ; ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু (শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত)
- 1902 প্রাগে রোদ'্যা প্রদর্শনী উদ্বোধনে যাত্রা। লওনে আসেন 'সেন্ট জন', মূর্তি ডেলভারি দিতে ! রিল্‌কের সঙ্গে পরিচয়=এমিল জোলা (এবং বিবেকানন্দের) মৃত্যু
- 1903 মে : 'কমাগুর অব দ্য লীজেন অব অনার' উপাধিতে ভূষিত। ইসাডোরা ডানকান কর্তৃক একান্তে নৃত্যপ্রদর্শন=গোগ্যা/পিসারো/হুইলসার প্রয়াত। রাইট ভাতৃদ্বয়ের আকাশজয়
- 1904 আন্তর্জাতিক শিল্পীপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত। লওন ভ্রমণ। ডাচেস্ অব শোয়াজোলের সঙ্গে আলাপ=মারিতস্-এর প্রথম পারী-প্রদর্শনী ; সুয়েজ-খাল শুরু
- 1905 সেপ্টেম্বর : রিল্‌কে মুদ'-তে, সচিবরূপে=(বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, দেবেন্দ্রনাথ প্রয়াত)

- 1906 এপ্রিল : বার্নার্ড শ সত্ৰীক ম্যুদ'তে। 'দ্য থিঙ্কার'-মূর্তির উদ্বোধন। স্পেন ভ্রমণ। রোজ-ব্যুরে সহ বিদেশ ভ্রমণ=সেজান প্রয়াত
- 1907 জুন : অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট লাভ। রিল্‌কের সঙ্গে পুনর্মিলন=অস্ট্রিয়া, ইতালী ও জার্মানী অক্ষশক্তি চুক্তিবদ্ধ
- 1908 মে : ইংলণ্ডের প্রতিকৃতি বানাতে ম্যুদ'তে রোদ'্যার অতিথি। রোদ'্যার পারীর 'ওতেল বির'—তে চলে আসেন=আমেরিকায় ফোর্ড-এর মটোর-কারখানা ; 'লুসিটানিয়া' অতলান্তিক-অতিক্রমণে রেকর্ড করে (স্ফুদিরাম শহীদ)
- 1909 নভেম্বর : ম্যুগো মূর্তি প্রতিষ্ঠিত=রেনঁ ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রম করেন
- 1910 জুন : 'গ্র্যাণ্ড অফিসার অব দ্য লীজেন অব অনার' সম্মানে ভূষিত=রজার ফ্রাই কর্তৃক লণ্ডনে 'পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্ট' প্রদর্শনী, সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু। দক্ষিণ-আফ্রিকা ডোমিনিয়ন।
- 1911 রোজ-ব্যুরে সহ ইংলণ্ড ভ্রমণ। প্যারিসে সম্মুখে 'ক্যালো' মূর্তির স্থান-নির্বাচন। ফরাসী সরকার কর্তৃক 'ওতেল বির' ক্রয় ও রোদ'্যাকে হোটেল ত্যাগের নোটিশ=প্যারীতে 'কিউবিজম'-এর প্রথম প্রদর্শনী হল। পঞ্চম জর্জের করোনেশন (ক'লকাতায় মোহনবাগানের আই এফ. এ. শীল্ড জয়)
- 1912 জানুয়ারী : ইতালী-ভ্রমণ। জুন : বাম-অঙ্গে পক্ষাঘাতের লক্ষণ। আগস্ট : শোয়াজোলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ। সমস্ত কীর্তি ফরাসী সরকারকে দানের প্রস্তাব=শ : 'পিগম্যালিয়ান' ; 'টাইটানিক'-এর সমুদ্রসমাধি। ভারত-রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত।
- 1914 রোজ-ব্যুরে সহ ইংল্যান্ড, পরে ইতালী ভ্রমণ=আগস্ট : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ; পানামা খাল সম্পন্ন (পূর্ববংসর রবীন্দ্রনাথ নোবল-লরিয়েট)
- 1915 ফেব্রুয়ারী : পোপ-মূর্তি নির্মাণ উদ্দেশ্যে রোম যাত্রা। এপ্রিল : মূর্তি অসমাপ্ত রেখে প্যারীতে প্রত্যাবর্তন=সমরসেট মম : 'অব হিউম্যান বণ্ডেজ'। আইনস্টাইন কর্তৃক 'আপেক্ষিকতাবাদ' তত্ত্বপ্রকাশ (রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধিতে ভূষিত)
- 1916 মার্চ : পুনরায় অসুস্থ ! জুলাই : সেরিরাল আক্রমণ। সেপ্টেম্বর : সব 'কাজ' ফ্রান্সকে দান করেন=ভাদু' যুদ্ধ। (গার্সজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন)
- 1917 উনিশে জানুয়ারী : ম্যুদ'তে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রোজ-ব্যুরেকে বিবাহ
চৌদ্দই ফেব্রুয়ারী : ম্যুদ'তে রোজ-ব্যুরের মৃত্যু
সতেরই নভেম্বর : ভোররাত্রে রোদ'্যার প্রয়াণ
চব্বিশে নভেম্বর : ম্যুদ'তে অনাড়ম্বর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া=ম্যুঙ-এর 'অবচেতন' ; দেগার প্রয়াণ। লেনিন-এর নেতৃত্বে রাশিয়ায় বিপ্লব।

[কয়েকটি শেষ মুহূর্তের সংযোজন, যা গ্রন্থে উল্লেখ করার অবকাশ পাইনি :

রোদ'্যাকে শিম্পজগতে ফিরিয়ে আনার জন্য ঋষিপ্রতিম ফাদার এইমার্ডকে পরে 'সেন্ট' করা হয়। বিশ্বযুদ্ধ-হেতু রোদ'্যার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনাড়ম্বর ছিল। তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর উদ্‌যাপনও ছিল অনাড়ম্বর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য। কিন্তু একটি তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে : রোদ'্যার মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হবার পর জার্মানীর কাইজার নিরপেক্ষ-রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে ফ্রান্সকে অনুরোধ করেন ঐ পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত করতে—কোথায় রোদ'্যার নখর দেহ ও অবিদ্যমান কীর্তি রাখা আছে, যাতে জার্মান-বাহিনীর গোলাবর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পৃষ্ঠা 32-তে প্রশ্ন তুলেছিলেন : "তবু একটা কথা ব্যাখ্যা এখনও পাইনি। রোদ'্যার কেন নিজের হাতের ছাঁচ নিয়েছিলেন? ছাঁচ তুলে ভাস্কর্য বানানো তো তাঁর ধাতে নেই।" 1984-কলকাতা বুক-ফেয়ারে ক্রীত পার্কলেন, নিউনিয়র্ক প্রকাশিত বৃহদায়তন 'অগুস্ত' রোদ'্যার গ্রন্থপাঠে সম্প্রতি জেনেছি—রোদ'্যার যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর শিষ্য তাঁর হাতের ছাঁচ তোলেন—তিনি নাকি বলেন, 'মিকেলান্জেলোর হাতের ছাঁচ আমরা পাইনি ; মিকেলান্জেলোর মানসপুত্রের হাতের ছাঁচ থেকে অনাগতকালকে বর্ণিত করা ঠিক হবে না।' রোদ'্যার শেষ মুহূর্তে প্রিয় শিষ্যকে বর্ণিত করেননি।]

পরিশিষ্ট—২

কালানুক্রমিক রোদ্যাঁ ভাস্কর্য

[সম্পূর্ণ তালিকা নয় ; যতদূর সংগ্রহ করতে পেরেছি বিভিন্ন গ্রন্থ খোঁটে । দীর্ঘকাল ধরে নির্মিত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গুরু হবার আনুমানিক সময় সূচিত । বন্ধনীর ভিতর বর্তমান গ্রন্থের প্লেট/চিত্রসংখ্যা । মাপ সেটিমিটারে । তালিকাটি গবেষকদের জগ্ন সঙ্কলিত—এ জগ্ন ভাষান্তরের ভ্রান্তি এড়াতে বঙ্গভাষীর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী । নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক শব্দগুলি ব্যবহৃত : B—ব্রোঞ্জ ; G—গ্লাস, কাচ ; M—মার্বেল ; P—প্লাস্টার ; S—অছাত্ত প্রস্তর ; T—টেরাকোটা, পোড়ামাটি ; W—ওয়াক্স, মোম । নির্মাণ-সময় বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থের তথ্য বিভিন্ন রূপ ; ফলে সঠিক করে সব সময় বলা যায়নি ।]

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1860 Jean-Baptiste Rodin, 41×28×22, B(8) | 1878 Some Grotesque Masks, |
| —63 Father Pierre-Julien Eymard | 142×76×53, S |
| 58×28×28, B (9) | —78 St. John the Baptist, Preaching, |
| —64 The Man with the Broken Nose, | 52×22×23, B (21) |
| 22×20×26, Bronze-mask (B) | —79 Bellona, 103×52×43, B |
| —65 Marie Rose-Beuret, T (A, 10) | „ The Call to Arms, 112×58×50, B |
| „ Madame Cruchet, 24×10×13, T | 1879 } THE GATE OF HELL |
| „ Bacchante, P (second copy) | 1917 } 630×399×86, B |
| —67 Mignon, 40×30×26, B | —80 Adam, 194×74×?, B |
| „ Spring, 46×33×35, T | „ Rose-Beuret, B |
| —68 Girl with Flowers, 50×35×25, P | „ Two Shadows, 195×90×60, B |
| —69 Young Woman & Child, 58×35×35 | „ D'alembert, 23×07×06, W |
| „ Monsieur & Mme. Garnier, | „ Caryatid with Stone, |
| 46×46×28, T | 34×32×30, B (12, E) |
| —72 Suzon, 44×22×22, B (O, 16, correct | —81 Bust of Eve, 22×22×17, B |
| the caption please) | „ Eve, Standing, B, (20) |
| „ Doctor Thirier, 58×48×28, T | „ The Painter, Alphonse Lepas, |
| „ Basin of the Titans (Signed by Carrier | 30×18×23, B |
| Belleuse) | „ The Painter, Jean-Paul Laurens, |
| „ Medallion of Beethoven (signed by | 60×33×30, B |
| Antoine Van Rasbourg) | —82 The Falling Man, |
| „ Dozia | 59×37×29, B (K & L) |
| —75 The Age of Bronze, | „ Study of a Damned, 22×37×26, B |
| 188×80×60, B (17) | „ Youth in Despair, 44×15×14, B |
| —76 The Idyll of Ixelles, | „ Torso of Ugolino's Son, 23×19×10, B |
| 56×40×40, B (15) | „ I am Beautiful, 27×18×16, B (N) |
| —77 The Walking Man, B | „ Mask of Rose-Beuret, 27×18×16, B |

- 1882 The Three Fauns, 15×28×18, P
 „ The Crouching Woman,
 84×58×48, B
 „ Ugolino, 41×43×36, B
 „ Torso of Adele, 15×45×23, P
 „ Bust of Carrier Belleuse,
 58×40×25, B
 „ The Sculptor, Dalou, 51×38×23, B
 —84 The Earth, 26×48×14, B
 „ *Fugit Amor* 30×51×19, B (26)
 1884 Kneeling Faun, 51×22×23, P
 „ Erect Faun, 61×30×35, P
 „ Mme. Vichuna, 56×48×36, M
 „ Eternal Spring, 40×55×30, B (25)
 „ The Fallen Sinner, 27×45×25, B
 „ General Marguerite, 73×40×66, P
 „ Mme. Alfred Roll, 56×48×33, M
 „ Henri Rochefort, 58×25×10, P
 „ Camille Claudel, bust, 28×20×20, B
 1884 BURGHERS OF CALAIS GROUP :
 60×38×31, B
 208×238×190, P (52-54)
 „ Eustache de St. Pierre, 69×31×26, B
 „ Jean d' Aire, 69×19×25, B
 „ Jacques de Wissant, 68×22×34, B
 „ Right-hand of a Burgher,
 31×18×19, B
 „ Jean d' Aire, bust, 49×54×28, B
 „ Headless Nude, Pierre de Wissant,
 191×105×85, B
 „ Pierre de Wissant, nude,
 196×98×64, B
 „ Head of Eustache de St. Pierre,
 33×24×24, B
 —85 Danaide, 21×39×25, B
 „ Do, 36×71×56, M (G, 1)
 „ Woman Damned, 21×28×11, B
 „ Meditation, 60×30×32, B
 „ She, Who Once was the Helmet-
 maker's Beautiful Wife,
 51×25×30, B (31, R)
 „ Thought, 73×53×50, M (44)
 „ Andromeda, 26×31×19, B (40)
- 1885 The Mourner, 30×18×13, B
 „ Aurora, 56×56×35, M (42)
 „ The Martyr, 68×40×12, P
 „ The Young Mother, B
 „ Love that Passes, 38×33×25, B
 „ Young Mother in Grotto,
 38×25×20, P
 „ The Toilet of Venus, 45×20×20, B
 „ Avarice & Lust, 25×60×50, P
 „ Psyche-Spring, 25×38×30, P
 „ Daphnis & Lycinion, 30×30×30, B
 „ Idyll (Anthony Rouse), 48×28×28, B
 1885 The Aged Suppliant, 32×07×20, B
 „ Invocation, 56×25×22, P (M)
 „ The Minotaur, 33×23×28, B
 „ Ovid's Metamorphoses,
 33×38×27, B (H, 57)
 „ Omer Dewavrin, Mayor of Calais,
 25×20×15, P
 „ Equestrian Statue of Gel. Lynch,
 45×35×20, P
 1887 Sybil, 164×72×93, B
 „ Dawn, 25×27×15, B (41)
 „ Bastien-Lepage, P
 „ Mercury, 36×38×20, B
 „ Possession, 22×12×11, B
 „ Death of Adonis, 35×58×36, B
 —88 The Ascendancy, 61×30×40, M
 „ The Death of the Poet, 27×45×25, P
 „ The Sirens, 45×40×30, B
 „ Paolo & Francesca, 30×58×38, P
 „ The Kiss, 184×112×110, B
 „ Do, 189×121×84, M (22)
 —89 The Prodigal Son, 140×95×65, B (56)
 „ Mrs. Russell, 47×20×27, B
 „ The Centauress, 40×45×18, B
 „ The Eternal Idol, 17×14×07, B (30, F)
 „ Octave Mirbeau, 28×17×15, T
 „ The Death of Alcestis, P & B
 „ Claude Lorrain, 36×12×13, P
 1890 Despair, 35×25×28, B
 „ Iris, 49×43×19, B
 „ Flying Figure, 52×76×31, B

- 1890 Rose-Beuret, 45 × 38 × 50, M
 „ Brother & Sister, 38 × 18 × 50, B
 „ Large Clenched Hand and Suppliant Lady, 45 × 30 × 27, B (6, 7)
- 1890 } BALZAC
 —97
 „ Balzac, a nude study, 40 × 28 × 19, B
 „ Do, Smiling mask, 20 × 14 × 13, B
 „ Do, in frock-coat, 60 × 21 × 27, B (I, 55)
 „ Do, a nude study, 77 × 30 × 39, B
 „ Do, head of, 28 × 30 × 37, B (Q)
 „ Do, last study of, 112 × 38 × 38, B
- 1890 Death of a Muse, 31 × 19 × 22, B
- 92 Orpheus, 150 × 83 × 50, B (14)
 „ The Farewell, (Camille's Last Study) 45 × 50 × 40, B
- 93 Orpheus & Eurydice, 127 × 76 × ?, M
- 94 Night, 25 × 13 × 17, B
 „ The Benedictions, 90 × 68 × 47, B
 „ Day, 27 × 07 × 07, B
 „ Meditation, 146 × 59 × 45, B
 „ Christ & Mary Magdalene, 90 × 73 × 45, P
- 95 President Sarmiento, 63 × 33 × 33, P
 „ Apollo Crushing the Python, P
- 96 Henri Rochefort, 75 × 56 × 31, B
 „ Victor Hugo, 68 × 48 × 48, B (39)
 „ Do, 223 × 45 × 45, P (J)
 „ The Fall of an Angel, M
 „ The Fall of Icarus, 45 × 68 × 35, P
- 97 The Hand of God, 62 × 78 × 50, M
 „ The Sculptor Falguiere, 41 × 22 × 25, B
- 98 Mme. F, 62 × 61 × 50, M
 „ Pan & Nymph, 134 × 76 × 68, M
 „ Baudelaire, 18 × 18 × 22, P
 „ Faun with Bow, 36 × 18 × 18, B
 „ The Ecclesiast, 30 × 40 × 35, P
 „ The Storm, 46 × 48 × 25, M
- 98 Spirit of Eternal Rest, 193 × 100 × 91, B
- 1901 Barbey D'aurevilly, 28 × 32 × 20, W
- 02 Mrs. Simpson, 53 × 53 × 32, P
- 03 The Sculptor, Eugene Guillaume, 33 × 30 × 28, B
 „ Male Torso, 22 × 14 × 09, B
 „ A Muse for Whistler's Monument, 223 × 86 × 120, P
 „ Roger Marx, 40 × 20 × 20, P
 „ George Nyndham, 50 × 45 × 28, B
 „ Mrs. P. Palmer, 66 × 48 × 46, P
 „ Mme. de Nostitz, 23 × 22 × 10, G
- 1904 France, 48 × 48 × 40, B
 „ Athlete, 40 × 48 × 25, B
 „ Autumn, 83 × 223 × ?, S
- 1905 A Slav Girl, 63 × 71 × 48, M
- 06 Mrs. Hunter, 45 × 45 × 23, B
 „ Lord H. de Walden, 63 × 50 × 30, P
 „ Beside the Sea, 56 × 87 × 58, P
 „ Poetess, Comptessena Anne de Noailles, 40 × 45 × 25, T
- 06 M. Berthelot, 43 × 23 × 23, B
 „ G. Bernard Shaw, 64 × 56 × 38, M
 „ Do, 28 × 17 × 10, B (P)
 „ Mme. de Goloubeff, 48 × 40 × 23, B
 „ Crouching Bather, 14 × 16 × 15, B
- 07 Joseph Pulitzer, 50 × 52 × 28, P
 „ Mme. Eliseyev, M
- 08 Mother & Dying Child, 104 × 100 × 69, M
 „ The Jap Girl-dancer, Hanako, 15 × 10 × 07, B
 „ Head of Hanako, 30 × 20 × 24, B
 „ The Cathedral, 63 × 33 × 30, S (32, 37)
 „ The Dutchess of Choiseul, 28 × 23 × 15, B (58)
- 09 Thomas F. Ryan, 59 × 48 × 48, B
 „ Edward H. Harriman, 48 × 20 × 48, P
 „ Napoleon Bonaparte, 68 × 91 × 50, P
 „ Gustav Mahler, 34 × 24 × 23, B
- 10 The Painter Puvis de Chavannes, 74 × 124 × 60, M

- 1910 Female Torso, 74 × 33 × 60, B
- „ God Protecting His Ceatures,
20 × 28 × 12, T
- „ Mozart, 30 × 78 × 60, M
- 1911 The Broken Lily, M
- „ Dance Movement, 71 × 20 × 26, B
- „ Do, 27 × 11 × 12, B

- 1911 G. Clemenceau, 45 × 28 × 23, B
- „ Pas de Deux, 13 × 14 × 17, B
- 12 Head of Nijinsky, B
- „ Nijinsky, dancing, 20 × 10 × 10, P (59)
- 14 Pope Benedict (unfinished)
25 × 18 × 20, B
- 16 Etienne Clementel, 53 × 38 × 28, B.

পরিশিষ্ট—৩

বিদেশী নামের বর্ণানুক্রমিকসূচী

অয়জেন —Eugene
 আর্ক দ্য ত্রিফ্—Arc de Triumph
 আবসাঁৎ--absinthe
 এইমার্ড —Eymard
 একোল দে ব্যু-আৎস্—Ecole des Beau Arts
 এ্যাস্তিতু দ্য ফ্রাঁস—Institut de France
 ওরেস্ লেকক্—Horace Lecoq
 করবে —Courbot
 কাফে গুয়ের্বয়ে—Cafe Guerbois
 কামীল —Camille Claudel
 কার্নো —Carnot
 কালমেৎ—Calmette
 কোরো —Corot
 ক্যারিয়া-ব্ল্যুজ—Carrier-Belleuse
 ক্যালো —Calais
 ক্লদ —Claude
 ক্লদেল —Claudel
 ক্লিমসো —Clemenceau
 গাম্বো —Gambetta
 গুইলোম —Guillaume
 জাঁ বাপ্তিস্ত্ রোদ্যা —Jean Baptiste Rodin
 জুলিয়েৎ —Juliette
 ডোজিয়া —Dozia
 তাকুঁয়ে —Tarquet
 থেরেস —Therese
 দান্তে —Dante
 দালু —Dalou
 দিয়াঘিলেভ্—Diaghilev
 দেলাক্রয়ে —Delacroix
 দেবয় —Desbois

দ্রোলে—Drolet
 নহ্দাম—Notre Dame
 নিজিন্স্কি—Nijinsky
 নেপলিয়ন্—Napoleon
 প'য়ক্যারে—Poincare
 পাওলো —Paolo
 পার্পিনো —Pappino
 পিসেরো —Pissaro
 পেতি —Petit
 পোঁন্যফ্—Pont Neuf
 পোঁ দেসার্ত্—Pont des Arts
 প্যালে বুর্ব—Palais Bourbon
 প্রাউস্ত্—Proust
 ফাঁতি-লাতুর—Fantin-Latur
 ফিগারো —Figaro
 ফ্রাঁসেস্কা —Francesca
 ফ্রাঁসোয়া —Francois
 ফ্লবার্ট —Flaubert
 বঁজু—Bonjour
 বারী —Barye
 বানু'ভ্যা —Barnouvin
 বিব্লিওথেক্ নাসিওনাল —Bibliotheque Nationale
 বোদুনের —Baudelaire
 বোর্দেল —Bourdelle
 ব্যাক্কান্তি —Bacchante
 বাল্জাক —Balzac
 বুয়ফে —Boufet
 বুয়ে —Beuret
 বুশে —Boucher
 ভিক্তর —Victor

ভোলভেয়ার—Voltaire

ভাঁ রাশবুর্গ—Van Rasburg

‘মনে’—Monet

মাদেলিন—Madeleine

‘মানে’—Manet

মারী—Marie

মেত্র—Metre

ম্যালার্মে—Mallarme

ম্যুদ—Meudon

ম্যুগো—Hugo

রিল্কে—Rilke R M

রু জ্যাকব—Rue Jacob

রেনোয়াঁ—Renoir

রোদ্যাঁ—Rodin

রোজ-বুয়ে—Rose-Beuret

লরেন্স—Lourens

লীজা—Lisa

লেঘ—Legros

লোরেন—Lorraine

ল্যুভর—Louvre

বার্গাস অব ক্যালো—Burghers of Calais

বেক—Becque

বেলভ্যু—Bellevue

বোয়াবোদ্রান—Boisbaudran

শ—Shaw, G, B.

শোয়াজোল—Choiseul, Duchess

শালট শ—Charlott Shaw

সালোঁ—Salon

সুজ—Suzon

সেজান—Cezanne

সেঁন—Seine

সেন্ট পীয়ের জুলিয়েন এইমার্ড—Saint Pierre Julien

Eymard

হেনলে—Henley. W E

